সেবা
কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
এসপিওনাজ

এসপিওনাজ-১

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৫

এক

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার বিশাল এক সাততলা ভবনের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার জীপ। পাশের সীট থেকে চামড়ার কালো ব্রিফকেসটা বাম হাতে থামচে ধরে প্রকাণ্ড ধড় নিয়ে লাফিয়ে নামল সে নিচে, তারপর লম্বা পা ফেলে একেকবারে তিন ধাপ করে ডিঙিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল লাউঞ্জে। সামনেই সবার ব্যবহারের জন্যে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং তার পাশে পাশাপাশি দুটো এলিভেটর। সেদিকে না গিয়ে লাউঞ্জের ডান পাশে 'প্রাইভেট' লেখা একটা এলিভেটরের দিকে এগোল ক্যাপ্টেন। লিফটের পাশে দাঁড়ানো সিভিল ড্রেস পরা আপাতদৃষ্টিতে নিরস্ত্র সেন্ট্রির শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল, নিজের অজান্তেই ঠুক করে জুতোর গোড়ালি দুটোয় মৃদু শব্দ করল। সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। বাক্য বিনিময় হলো না। লিফটে চড়ে একটা বোতাম টিপতেই সোজা উঠে এল সেটা সাততলায়। লিফট থেকে বেরোলেই সিকিউরিটি চেকপোস্ট। বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াল আতিকুল্লাহ। একজন বসে রইল গম্ভীর মুখে, দ্বিতীয়জন থরো সার্চ করল ওকে, রিভলভারটা জমা নিয়ে রিসিট লিখে দিল, তারপর হাসল। মৃদু হেসে মাথাটা সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল আতিকুল্লাহ করিডর ধরে। ডান ধারের সাতটা দরজা ছেড়ে ঢুকে পড়ল অষ্টম দরজা দিয়ে।

'কি খবর?' টাইপ করছিল পারভিন, চোখ তুলেই হাসল। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পার্সোনাল সেক্রেটারি সে। মিস্। বয়স তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। নতুন সেকশন 'ই', অর্থাৎ একজিকিউশনের হেড এই ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাকে ভারি পছন্দ তার। যেমন তাগড়া চেহারা, তেমনি স্মার্ট, তেমনি নিখুঁত কাজ। সবচেয়ে বড় কথা, সৎ। অন্যান্য এজেন্টদের মত বিদেশে যেতে হয় না একে, লোকজন দেয়া হয়েছে, প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, ঢাকায় বসে অপারেট করে সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এই ধরনের স্থিতিশীল লোকই পছন্দ করে পারভিন, মিষ্টি হাসিতে তাই তার আমন্ত্রণের আভাস।

'বস আছে ঘরে?' ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল আতিকুল্লাহ।

'থাকবে না আবার! গত তিনটে বছরে একটা দিনও তো ছুটি নিতে দেখলাম না। আমিও সমান তালে কম্পিটিশন দিয়ে চলেছি—দেখি কে জেতে কে হারে। ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি?'

'ছুটি? ছুটি কাকে বলে?' হাসল আতিকুল্লাহ। ঝকঝকে দাঁত। 'কাজের যা নমুনা দেখছি তাতে মনে হয় নামাযের জন্যে পনেরো মিনিটের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে দরখাস্ত দিয়ে।' ব্রিফকেসে টোকা দিল। 'মনে হচ্ছে আরও কাজ চাপতে যাচ্ছে ঘাড়ের উপর।'

ইন্টারকমের একটা সুইচ টিপে ধরে পারভিন বলল, 'ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ এসেছেন, স্যার!'

'কাম ইন, আতিক,' খনখনে যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল ইন্টারকমের মাধ্যমে। পরমুহূর্তে নিঃশব্দে দেয়ালের একটা অংশ দু'ভাগ হয়ে গেল দু'ধারে, তৈরি হলো চতুষ্কোণ একটা চার বাই আট ফুট গহ্বর। তার ওপাশে গাঢ় নীল রঙের পুরু পর্দা।

এগিয়ে গেল আতিকুল্লাহ। পর্দা সরাতেই দেখা গেল, চোখা চেহারার একজন লোক বসে আছে মস্ত এক টেবিলের ওপাশে। একমাথা এলোমেলো চুল। ফাইলটা বন্ধ করে একটা সোনালী সিগারেট কেস থেকে এক শলা ফিল্টার টিপ গোল্ড ফ্লেক বের করে ঠোঁটে ঝুলাল, ম্যাচ থেকে কাঠি বের করে জ্বেলে নিল সিগারেটটা, একহাতে। বাম হাত নেই সোহেল আহমেদের।

'বসো, আতিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করল সোহেল। 'নতুন কিছু?'

'জি, স্যার।' ব্রিফকেসটা কোলে নিয়ে বসে পড়ল আতিকুল্লাহ একটা চেয়ারে। 'অ্যাটনীস্ট আমার তাই মনে হচ্ছে। আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম।'

'বেশ করেছ। এবার ঝটপট বলে ফেলো দেখি, বাছা? অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

'আই, বি-র একটা রুটিন হ্যান্ডআউট এসেছে গতকাল সন্ধ্যায়।' বলেই জিপ খুলল আতিকুল্লাহ ব্রিফকেসের। ওর মধ্যে থেকে একটা ফাইল বের করে রাখল হাঁটুর উপর। 'ব্যাপারটা আপনার জানা দরকার।'

ডানহাতটা মাথার উপর তুলে একহাতে আড়মোড়া ভাঙল সোহেল, হাই তুলে হেলান দিয়ে বসল রিভলভিং চেয়ারে, মাথাটা কাত করে ঢুলুঢুলু চোখে চাইল আতিকুল্লার দিকে। ঠোঁটের কোণে ধিকি ধিকি জ্বলছে গোল্ড ফ্লেক, নীলচে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে এয়ার কন্ডিশনের এগজস্ট আউটলেটের দিকে। অর্থাৎ, যেকোন বক্তব্য নেবার জন্যে প্রস্তুত এখন চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

'বলে যাও।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল আতিকুল্লাহ। 'গত পরশু রাতে একটা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে, স্যার। রমনা পার্কে। অজ্ঞান। বাচ্চা না, বড় মেয়ে—মহিলা। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে মেডিকেলে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে, সেই রাতেই কি কারণে জানি না ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় পি. জি. হাসপাতালে।' হাঁটুর উপর রাখা ফাইলের দিকে চোখ নামাল আতিকুল্লাহ।

বিরতির সুযোগে পরিষ্কার জানিয়ে দিল সোহেল, 'তেমন কোন মজা পাচ্ছি না কিন্তু এখনও।' খুব সামান্য হলেও অসহিষ্ণুতার আভাস রয়েছে ওর কণ্ঠে।

'অতি মাত্রায় বারবিচুরেট সেবনের ফলে জ্ঞান হারিয়েছিল মেয়েটি,' একই কণ্ঠে বলে চলল আতিকুল্লাহ। বসের অসহিষ্ণুতা টের পেয়েছে বলে মনে হলো না ওর চেহারা দেখে। চিকিৎসার পর চারতলার একটা কেবিনে রাখা হয় তাকে। পরদিন অর্থাৎ গতকাল সকাল দশটায় জ্ঞান ফিরে আসে মেয়েটির, কিন্তু দেখা যায় অতীতের কিচ্ছু মনে নেই ওর, একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ।' তিন সেকেন্ড চুপ থেকে সোহেলের মুখটা পরীক্ষা করল আতিকুল্লাহ। কোন ভাব পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে আবার শুরু করল, 'নষ্ট হয়ে গেছে স্মৃতি। ও জানে না ও কে, কোথায় বাড়ি, কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছিল···কিচ্ছু না। একেবারে কমপ্লিট মেমোরি ব্ল্যাঙ্ক যাকে বলে। পরিষ্কার বাংলা বলে, পশ্চিম বাংলার ছাঁট রয়েছে তাতে কিছুটা। বারবিচুরেটের প্রভাবে এইরকম স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া অবশ্য খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাই হোক, পি. জি.-তে ইদানীং রোগীর ভিড় বেশি, ওর জন্যে একটা কেবিন আটকে রাখা মুশকিল, তাই ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর আশেক রিজভি। মেয়েটির বর্ণনা দিয়ে পুলিসকে অনুরোধ করেছিলেন যেন এর পরিচয় ও ঠিকানা খুঁজে বের করে আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়া হয়।'

'কাগজপত্র কিছুই পাওয়া যায়নি ওর কাছে?'

'কিচ্ছু না, স্যার। কিছুই ছিল না ওর সাথে। একটা হ্যান্ডব্যাগও না।'

একটু নড়েচড়ে বসল সোহেল। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'বেশ। তারপর?'

'গতকাল সন্ধ্যায় আমার হাতে এসে পৌঁছে হ্যান্ডআউটটা।' আবার ফাইলের উপর চোখ নামাল আতিকুল্লাহ। 'এই যে চেহারার বর্ণনা। লম্বা পাঁচ-ফুট চার, ওজন একশো দশ পাউন্ড, ফর্সা, কুচকুচে কালো উজ্জ্বল চোখ, কাঁধ পর্যন্ত বব-ছাঁটা ঘন কালো চুল, অত্যন্ত সুন্দরী। আইডেন্টিফিকেশন মার্ক হচ্ছে: ডান হাতের কব্জির কাছে ছোট্ট একটা লাল আঁচিল, এবং বাম পাছ···, মানে, বামদিকের নিতম্বের উপর টাট্টু-মার্কের মত একটা হিন্দি সিগনেচার।'

কয়েক সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার চোখের দিকে চেয়ে

রইল সোহেল. তারপর সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে মুখ বাঁকিয়ে কানের পিছনটা চুলকাল কড়ে আঙুল দিয়ে।

'হিন্দি?'

'জি, স্যার। প্রথম অক্ষর দন্ত্যস, দ্বিতীয় অক্ষর ক. কিন্তু তারপর আর কিছুই বুঝবার উপায় নেই—ইল্লেজিবল্।' এতক্ষণে বসের মধ্যে কিছুটা আগ্রহের আভাস টের পেয়ে ফাইলটা ডেস্কের উপর তুলে রাখল আতিকুল্লাহ। 'এইবার আমার বক্তব্যটা বলি, স্যার। আমার সেকশনে নেই, এটুকু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আপনার ডিভিশনের কোথাও না কোথাও কোন একটা ফাইল আছে, যেটা ঘুরতে ঘুরতে মাস ছয়েক আগে একবার আমার হাতে এসেছিল। কোন বিশেষ কাজে নয়, রুটিন ইনফরমেশন হিসেবে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য ছিল সে ফাইলে। লোকটার নাম সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ী। অনেক আজেবাজে তথ্যের মধ্যে লোকটার একটা পাগলামির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। যা কিছুই তার হস্তগত হয়েছে তার উপর নিজের নাম সই করবার এক অদ্ভুত বাতিক ছিল ভদ্রলোকের। তার বাড়ি, গাড়ি, হাঁড়ি, চুলো, বাসন, পেয়ালা, কুকুর, বিড়াল, জুতো, জামা—সব কিছুতেই নিজের নাম সই করা আছে, এমন কি যেসব মেয়েমানুষ তার সংস্পর্শে এসেছে তাদের শরীরেও। হঠাৎ খেয়াল হলো যে সেই লোকটার নামের আদ্যাক্ষর স এবং ক। এই মেয়েটির পা···, মানে, নিতম্বে যে সই পাওয়া যাচ্ছে সেটা সেই লোকের সই হওয়াও বিচিত্র নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বছর কয়েক হলো এক বাঙালী মেয়ের সাথে খুবই মাখামাখি চলেছে সেই ভদ্রলোকের।' মৃদু হাসল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। 'ভাবলাম সন্দেহের কথাটা আপনাকে জানানো দরকার।'

স্থির হয়ে বসে রইল সোহেল কয়েক সেকেন্ড।

'এই হ্যান্ডআউট আর কোথায় কোথায় পাঠানো হয়েছে?'

'তা ঠিক বলতে পারব না, স্যার। যদি বলেন তো খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। আমার মনে হয় মিনিস্ট্রি অফ হোম, মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন···'

'জানতে চাইছি প্রেসে গেছে কিনা।'

'যাচ্ছিল, স্যার। ঠিক সময় মত হাজির হয়ে সেটা বন্ধ করেছি। কিন্তু কিভাবে জানি না, সাপ্তাহিক স্যাটারডে খবরটা সংগ্রহ করে ছেপে দিয়েছে।' ব্রিফকেস থেকে একটা ইংরেজী পত্রিকা বের করল ক্যাপ্টেন।

'ছেপেই দিয়েছে!' হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল সোহেল।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে একটা ছবি, উপরে ক্যাপশান: এই মহিলাকে চেনেন? যে ছবির ছাপা হয়েছে তাতে ছবি দেখে অবশ্য সহজে চিনবার উপায় নেই। বিশ থেকে তিরিশ—যে কোন বছর বয়স হতে পারে। পঁয়ষট্টি

স্ক্রীনের হাফটোন ব্লকে ছাপা। বাজে কোন পুলিস ফটোগ্রাফারের তোলা। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রয়েছে একজোড়া নিষ্প্রাণ চোখ ময়লা নিউজপ্রিন্টের ভিতর থেকে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সৌন্দর্যের ধারটা চোখ এড়ায় না কারও। নিচে মেয়েটির শরীরে হিন্দী অক্ষরে অস্পষ্ট স্বাক্ষরের কথাও লেখা আছে দেখে ঘোঁৎ শব্দে নাক টানল সোহেল।

'ওরা কি করে পেল এই খবর, ছবি?'

'শকুন কি করে পায় বিশ মাইল দূরে মরা গরুর খবর, স্যার?' কাঁধ ঝাঁকাল আতিকুল্লাহ।

খাড়া হয়ে গিয়েছিল, আবার হেলান দিয়ে বসল সোহেল, ঢুলুঢুলু চোখে ভাবল কয়েক সেকেন্ড। অনেকটা আপন মনে বলল, 'ব্যাপারটা তেমন কিছু নাও হতে পারে। হয়তো কিছুই না…অনেক মেয়ের পাছাতেই…' থেমে গেল সোহেল, মাথা নাড়ল, তারপর আবার বসল খাড়া হয়ে। 'হিন্দি সিগনেচার! নাহ্। সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ী…এতটা মিলে যাওয়া রীতিমত অস্বাভাবিক ব্যাপার। উঁহুঁ।' সরাসরি চাইল সে আতিকুল্লার চোখের দিকে। 'মনে হচ্ছে ঠিকই সন্দেহ করেছ তুমি, আতিক। শোনো, এটাকে টপ-লেভেল ইম্পর্ট্যান্স দেব আমরা এই মুহূর্তে। ভুল হলে ভুল, কুছ পরোয়া নেই; কিন্তু যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, যদি সত্যিই এই মেয়েলোকটা বাজপেয়ীর রক্ষিতা সেই মেয়েটি হয়ে থাকে…' তাহলে যে কতবড় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব সেটা উহ্য রাখল সে, টেবিলের উপর টপাটপ বার কয়েক তবলা বাজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ পর্যন্ত তুমি কি কি স্টেপ নিয়েছ?'

নড়েচড়ে বসে লজ্জিত হাসি হাসল আতিকুল্লাহ।

'তেমন কিছু না, স্যার। এই সামান্য একটু সিকিউরিটি মেযার নিয়েছি। চেকাপের জন্যে জেনারেল সফদর এখন পিজিতে আছেন, আরও থাকছেন হপ্তাখানেক। ওই একই ফ্লোরে। সুযোগ বুঝে আমি তাঁকে গার্ড দেয়ার ছলে করিডরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি একজন আর্মড সেন্ট্রি। ডক্টর আশেক রিজভিকে জানিয়েছি যে এই মেয়েটা বিরাট কেউকেটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার জীবন নাশেরও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমরা, কাজেই যেন একান্ত পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য নার্স ছাড়া আর কাউকে ওর ঘরে ঢুকতে দেয়া না হয়। গার্ডকে বলে দিয়েছি, ওই নার্স ছাড়া আর একটা মশা বা মাছিও যেন ওই কেবিনে ঢুকতে না পারে। রিসেপশন ডেস্কে জানিয়ে দিয়েছি যেন কোন ভিজিটারকে মেয়েটির সাথে দেখা করতে দেয়া না হয়।'

যোগ্য সহকারীর নির্ভুল তৎপরতায় খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'ফার্স্ট ক্লাস! খুব ভাল করেছ। এখন থেকে আমি নিজে টেকাপ করছি ব্যাপারটা। প্রথমে জানতে হবে আমাদের, সত্যি সত্যিই স্বাক্ষরটা কার। যদি

দৈবক্রমে দেখা যায় যে সত্যিই ও ছিল সঞ্জীবের কেস্ট, তাহলে বুঝতেই পারছ, ভি. আই. পি.-র চেয়েও দামী হয়ে উঠেছে ও আমাদের কাছে। তুমি দেখো, সিকিউরিটির ব্যাপারটায় আরও ভাল নজর দেয়া যায় কিনা, আমি এদিকে গুছিয়ে ফেলি আমাদের প্ল্যান অফ অ্যাকশন। বড় সাহেবের সাথেও একটু কথা বলে নেয়ার দরকার আছে।'

উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ।

'বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে বলে মনে করি না, স্যার।'

'রাইট। তুমি রওনা হয়ে যাও। গুড ওয়ার্ক, মাই বয়।'

লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই আবার ধীরে ধীরে খুলে গেল স্লাইডিং ডোর, বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে চিন্তা করল সোহেল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের চিন্তার সাথে সায় দিয়ে কানে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

ঢাকার উয়ারী এলাকার একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁ। অমলেশ কর্নার। ছোট্ট সাইনবোর্ড। কোন হাঁকডাক নেই, হৈ-হল্লা নেই—কিন্তু সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত গিজগিজে ঠাসা থাকে খরিদ্দারে। পাঁঠার মাংসের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু খ্যাতি শুধু যারা একবার খেয়েছে তাদের কাছে। বিজ্ঞাপন বা সেলস্ম্যানশিপের কোন প্রয়োজন পড়ে না এদের, বাঁধা খরিদ্দার। বিশেষ এক ধরনের লোকের এখানে আনাগোনা। অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকে পড়লে দুঃখিত হাসি হেসে বিনয়ের সাথে জানানো হয় যে সব সীট রিজার্ভ হয়ে গেছে, আর সীট নেই।

ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ যখন তার বস্ সোহেল আহমেদের সাথে কথা বলছে ঠিক সেই সময়ে, অর্থাৎ দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, ক্যাশ কাউন্টারের ওপাশে বসা অমলেশ রায়ের হাতের পাশে ছোট্ট তেপায়ার উপর বেজে উঠল টেলিফোন। চারজনের বসবার উপযোগী পারটেক্সের পার্টিশন দেয়া রঙচঙে ভারী পর্দা ঝুলানো গোটা পনেরো কেবিন থেকে কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন, আর বাসন-পেয়ালা-ডিশ—চামচের টুংটাং আওয়াজ আড়াল করল অমলেশ বাম হাতে কান চেপে ধরে, ডান হাতে তুলে নিল রিসিভার। কানে একটু কম শোনে সে।

আধ মিনিট চুপচাপ শুনল সে অপর প্রান্তের কথা, ভাবলেশহীন মুখের অভিব্যক্তি, তারপর সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ডেকে দিচ্ছি।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে চার নম্বর কেবিনের দিকে। খুক করে সামান্য কাশি দিয়ে পর্দা সরাল। কাশির প্রয়োজন হত না যদি না আলমগীরের সাথে বসা মেয়েটি তার আপন বোন হত।

অস্পষ্টভাবে টের পেল সে কাশির শব্দে খুব ঘনিষ্ঠ দুটো ছায়া সরে গেল হাতখানেক তফাতে। পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল সে কেবিনের ভিতর, সে-মুখে একগাল সমর্থন ও প্রশ্রয়ের হাসি।

'আপনার ফোন।'

'কার, আমার?' একটু অবাক হলো সাংবাদিক আলমগীর। 'এই ফোন নাম্বার তো আমার পরিচিত কারও জানা থাকবার কথা নয়।'

'যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী।'

নামটা শুনেই কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল আলমগীরের চেহারাটা। টেবিলে সাজানো খাবারের দিকে চাইল একবার, এইমাত্র শুরু করতে যাচ্ছিল, খিধেটাও বেশ চেগিয়ে উঠেছে। বলল, 'বলে দিন, খাচ্ছে। আধঘণ্টা পরে যেন ফোন করে।'

'উনি বললেন খুবই জরুরী দরকার। এক্ষুণি।'

জিভ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করল আলমগীর, তিন সেকেন্ড দ্বিধার পর উঠে দাঁড়াল।

মোহাম্মদ আলমগীর ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। চিকণ, লম্বা, কালো ফ্রেমের চশমা, ব্যাকব্রাশ করা একমাথা ঢেউ-খেলানো কালো চুল, ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী-পাজামা, পায়ে কারুকাজ করা কোলাপুরি স্যান্ডেল। রুচিশীল সংস্কৃতিবানের লেবাস। নিজেকে সংস্কৃতিবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আলমগীরকে। প্রথমেই প্রমাণ করতে হয়েছে যে সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। পাকিস্তানী আমলে এটা ছিল একটা বিদ্রোহের মত। ওর কাছে কালচারের প্রধান মানদণ্ড ছিল কে কতটা বুঁদ হতে পারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। সেই সাথে যদি গায়ে হালকা সেন্টের মত মস্কোপন্থীর গন্ধ থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, রীতিমত প্রোগ্রেসিভ। উর্দুকে ঘৃণা করতে হবে মনেপ্রাণে। উর্দু গান যত ভালই হোক, ভাল লাগলে চলবে না। আধুনিক গান···ছোঃ! এইভাবে বাড়তে বাড়তে কপালে সিঁদুরের টিপ আর মেঝেতে চন্দনের আলপনা দেখলেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসা অভ্যাস করেছে সে। ইতিমধ্যে জিভ আড়ষ্ট রেখে কথা বলা আরম্ভ করে ফেলেছে। ক্রমে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তার, এইসবই হচ্ছে সত্যিকার সংস্কৃতি ও বাঙালিত্বের লক্ষণ। পয়লা বৈশাখে সাত সকালে উঠে একদল ছেলেমেয়ে একসাথে জুটে জুতসই কোন বটমূলে সদলবলে 'এসো হে-এ-এ-এ বৈশাখ' বলে হাঁক ছাড়া যেন খুবই দরকার। নববর্ষকে ডাকা হচ্ছে—যেন না ডাকলে আসতে পারছিল না বেচারী। এমন কোন 'সত্যিকার' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল না যেটাতে অনুপস্থিত বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে আলমগীর। কোন না কোন ভূমিকা তার নেয়া চাই-ই। ঘষে মেজে নিজেকে

সে এতই সংস্কৃতিবান করে ফেলেছিল যে শেষে ঈদ, বকরিদ, শবে-বরাত বা মিলাদ শরীফ তার কাছে রীতিমত রুচিহীন, মুসলমানী, কমিউনাল ব্যাপার-স্যাপার বলে মনে হয়েছে। আগরবাতির গন্ধ এলেই কুঁচকে উঠেছে নাক। কেন যে নিজের নামটা তার কাছে সহ্য হয়েছে, ঘেন্নার ব্যাপার বলে মনে হয়নি, বলা মুশকিল!

বাপ-মা নেই, একাত্তরের গোলমালে ভেগেছিল আলমগীর কলকাতায়। কোন আদর্শের জন্য নয়—প্রাণভয়ে। 'সত্যিকার' বাঙালী পেয়ে খুশি হয়ে দাদারা অনেক সুবিধে দিয়েছেন ওকে, খাওয়া-খাবার কোনই অসুবিধে ছিল না, একটু-আধটু পানাভ্যাস ছিল (দোষ হিসেবে নয়, ইসলাম ধর্মে বারণ আছে বলে বিদ্রোহ হিসেবে), সেদিক থেকেও অনুকূল হাওয়া দিয়েছেন তাঁরা, জুটিয়ে দিয়েছেন কবিতা রায়ের মত সুন্দরী বান্ধবী। অর্থাৎ, শুধু টোপই নয়, বড়শী, সুতো, ফাৎনা, নায় ছিপ পর্যন্ত গিলে বসে আছে সে। আটকা পড়েছে কবিতার মায়া জালে।

তেষট্টির রায়টে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল কবিতারা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসেছে বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা দেখতে। বড়ভাই অমলেশ, আর সে। নিজের দেশে ফিরে এসেছে ওরা, কারও কিছু বলার নেই। ইদানীং কি যেন অল্প অল্প টের পাচ্ছে আলমগীর। কিন্তু এখনও এতই ঘোরের মধ্যে রয়েছে যে বললে বিশ্বাসই করবে না যে এরা দু'জনেই আসলে ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্পেশাল এজেন্ট। প্রথম দিকে খুবই সহজভাবে নিয়েছিল সে এদের আগমন। যতই দিন যাচ্ছে, আধুনিক কবিতার মত দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে কবিতা রায়, নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে ওর প্রেমালাপে, মৃদু চাপ একটু একটু করে বাড়ছে। কিসের যেন অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছে আলমগীর।

স্বাধীনতার পর পরই কলকাতা থেকে ঝাড়কে ঝাড় আসতে শুরু করলেন রথী-মহারথীরা এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও দিকনির্দেশের গার্জেন সুলভ মনোভাব নিয়ে—আসল উদ্দেশ্য যদিও যার যার মার্কেট তৈরি করা; নিজের অন্তরের তাগিদেই গদগদ চিত্তে তাঁদের পদলেহন করেছে আলমগীর। আজ ইন্টারকন, কাল পূর্বাণীতে পার্টি হয়েছে, প্রচুর মদ্যপান চলেছে। তাঁদের উপদেশাবলী সততার সাথে রিপোর্ট করেছে সে নিজের পত্রিকায়। অল্পদিনেই তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন এদেশের কালচারের স্ব-নিযুক্ত শিক্ষক। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা যখন ওদের বেহায়া হ্যাংলামী দেখে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে শেষে গোটা কয়েক শক্ত তাড়া লাগালেন, আহত অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিলেন দাদারা। কিন্তু তাই বলে আলমগীরের প্রয়োজন ফুরাল না। বিশেষ কার্ড দিয়ে ভারতীয় ছায়াছবি

দেখবার অনুরোধ, কবিতার মাধ্যমে দু'একজন কূটনীতিকের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়, মদ্যপান—চলতে থাকল এসব। সেইসাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কবিতা। নিজের অজান্তেই দুটো একটা করে তথ্য দিতে শুরু করল আলমগীর। পত্রিকার পলিসি, কোন মিনিস্টারের কি মনোভাব, কোন ফ্যাকশন কি ভাবছে, নতুন কোন পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে কিনা—সবই অগ্রিম জেনে নিচ্ছে তারা। প্রথম দিকে এসব জানানোকে ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেছিল সে, কিন্তু শেষের দিকে ও যেন একটু সন্দেহ করে উঠতে শুরু করেছে ওকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে দেশদ্রোহিতার দিকে। ঠিক তখনই এসেছে এই টেলিফোন। ওকে যে পুরোদস্তুর এজেন্টে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে বানের জলে, ঠেলে দেয়া হচ্ছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে আর ফিরবার পথ নেই—ঘুণাক্ষরেও টের পেল না বেচারা। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে কানে তুলল রিসিভার।

'আলমগীর বলছি,' টেলিফোন ধরতে বাধ্য হওয়ায় নিজের উপরই বিরক্ত হয়েছে সে।

'বলদা গার্ডেনের সামনে অপেক্ষা করছি। এক্ষুণি চলে এসো।'

আদেশের ধরন শুনে রাগ হয়ে গেল আলমগীরের, কিন্তু সাথে সাথেই টের পেল এই লোকের সাথে কোন রকম উষ্মা প্রকাশ করা চলবে না—বিপদ ঘটবে। কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রেখে বলল, 'এক্ষুণি আসব কি করে? এখন আমি খেতে...'

'এক্ষুণি!' কথাটা বলার সাথে সাথেই কেটে গেল কানেকশন। আলমগীরের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন বোধ করেনি লোকটা, নামিয়ে রেখেছে রিসিভার।

কয়েক সেকেন্ড চোখের সামনে আঁধার দেখল আলমগীর, তারপর অনুভব করল থরথর করে কাঁপছে ওর সারা শরীর, কুরুচিপূর্ণ গালিগালাজ উঁকিঝুঁকি মারছে ওর সংস্কৃত, পরিচ্ছন্ন মনের মধ্যে। কেবিনে ফিরে আসতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল কবিতা ওর মুখের দিকে।

'দেখা করতে বলছে। খাওয়া ফেলেই যেতে বলছে ওর সাথে...'

'তাহলে আবার বসে পড়ছ কেন?' অবাক হয়ে গেল কবিতা। 'এক্ষুণি যাওয়া দরকার তোমার!'

'আমি ওর চাকর, যে তুড়ি দিলেই ছুটতে হবে?' মুখে কথাটা বলল বটে, কিন্তু বসতে গিয়েও কেমন একটু দ্বিধায় পড়ল আলমগীর।

চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল কবিতা। 'জেদ কোরো না, লক্ষ্মীটি। ডাক পড়লে যেতেই হবে তোমার। কোথায়? খুব দূরে কোথাও?'

'না, বলদা গার্ডেনের সামনে। কিন্তু...'

'আর কোন কিন্তু নয়। প্লীজ। না গেলে ভয়ানক রেগে যাবেন গাঙ্গুলী দা। ওঁকে চটালে অমঙ্গল হবে তোমার।'

অস্পষ্টভাবে হলেও ঠিক এই ব্যাপারটাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল সে একটু আগে, কাজেই কথাটা মনে ধরল ওর। একটু ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি দশ মিনিট অপেক্ষা করো, আমি আসছি এখুনি ঘুরে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সাদা রঙের ছোট্ট ফিয়াট সিক্স হানড্রেডে স্টার্ট দিল আলমগীর। বলদা গার্ডেনের গেটের মুখে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা বেঁটে এক লোক, মাথায় টাক। গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই চট করে উঠে পড়ল লোকটা আলমগীরের পাশের সীটে। নিচু গলায় বলল, 'চলতে থাকো। যা বলার বলে আমি নেমে যাব রাস্তার কোথাও।'

চোখের সামনে খাবারের ডিশগুলো ভেসে উঠল আলমগীরের। বিনা বাক্য ব্যয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোজা রাস্তার দিকে চেয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। রেললাইন টপকেই মুখ খুলল যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী।

'অত্যন্ত জরুরী এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার দেয়া হচ্ছে তোমার ওপর। দায়িত্বটা বিশেষ ভাবে তোমাকেই দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে অনেক উঁচু মহল থেকে। এটা তোমার জন্যে বিরাট সম্মান ও গর্বের ব্যাপার।' কথা ক'টা বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গাঙ্গুলী।

মধুমিতা সিনেমা হলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলল, 'ওই যে বাঁ দিকের পার্কিং লট থেকে লাল গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওইখানটায় পার্ক করো।' নির্দেশমত গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই পকেট থেকে সাপ্তাহিক স্যাটারডের একটা কাটিং বের করল গাঙ্গুলী, ভাঁজ খুলে বিছাল ওটা বামহাতের মাংসল তালুর উপর। বব্-ছাঁটা এক মেয়ের অস্পষ্ট ছবি। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টোকা দিল সে মেয়েটির কপালে, তারপর সরাসরি চাইল বিস্মিত আলমগীরের চোখের দিকে।

'শেষ করে দিতে হবে একে। আজ রাতের মধ্যেই। যেমন ভাবে পারো। তোমার ওপর আমাদের পুরো আস্থা আছে। সাহায্যের জন্যে অবশ্য লোক দেয়া হবে তোমাকে, কিন্তু প্ল্যান-প্রোগ্রাম পুরোটা করতে হবে তোমার নিজের। খুঁটিনাটি সমস্ত ডিটেইল ছ'কে নিতে হবে। ঠিক ছ'টার সময় তোমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হবে একজন। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে ওকে, দিল বলতে কিছু নেই ওর, তুমি যেমন ভাবে চালাবে তেমনি ভাবে চলবার নির্দেশ থাকবে ওর ওপর। এবার শোনো মন দিয়ে...'

স্থির হয়ে বসে রইল মোহাম্মদ আলমগীর। যেন বরফ হয়ে জমে গেছে। শীর্ণ দুই হাতে খামচে ধরে রইল সে স্টিয়ারিং হুইল। নিচুগলায় একনাগাড়ে

তিনমিনিট কথা বলে থামল গাঙ্গুলী। কোন রকম সম্ভাষণ না জানিয়েই নেমে গেল গাড়ি থেকে। আরও আধমিনিট সেই একই ভঙ্গিতে বসে রইল আলমগীর। একটা কথা বুঝতে পেরেছে সে পরিষ্কার: আদেশ পালন না করে নিস্তার নেই ওর।

চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ-ওপাশ চাইল ঝাড়া ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা এক লোক। যেমন লম্বা, তেমনি পেটা শরীর। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, ঘোড়ার মত লম্বাটে মুখ, মুখের ভাঁজে ভাঁজে নিষ্ঠুরতার ছাপ। নাম সিকান্দার বিল্লাহ্।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ভয়ঙ্করতম এজেন্টদের একজন সিকান্দার বিল্লাহ্। মানুষ শিকারে সারা পাকিস্তানে এর জুড়ি নেই। যেমন নির্মম, বেপরোয়া, তেমনি ধূর্ত। মোহন বাগানের ফুটবল খেলা দেখে ফিরছে সে বিরক্ত মনে। এইসব খেলা দেখে মজা লাগে না ওর কোনদিনই, ওর মজা জীবন-মৃত্যুর খেলায়।

গত একটা সপ্তাহ ধরে অবিরাম ঘুরছে সে সারা কলকাতা জুড়ে। হেড অফিসের আদেশ: পশ্চিম বাংলার নাড়ীর গতি বুঝে নিতে হবে ওর। পরিচিত হতে হবে কলকাতার রাস্তাঘাট, লোকজনের আচার-ব্যবহার আর কথাবার্তার ধাঁচের সাথে। লাহোরে ছ'মাসের বাংলাশিক্ষা ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করেছিল সে বছরখানেক আগেই, এবার পাঠানো হয়েছে তাকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কাজের ভার পড়বে ওর উপর বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপারটা যে কেবল সে-ই বুঝছে তা নয়, ও জানে ওর আগমন এবং গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছে ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগ। কেউ না কেউ লেগে রয়েছে ওর পিছনে সর্বক্ষণ। তারও পিছনে যে পাকিস্তানী একজন ওয়াচার রয়েছে, হয়তো সেকথাও ভারতীয়দের জানা। এসবে কিছুই এসে যায় না সিকান্দার বিল্লার। এসবই খেলার স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েছে সে। প্রয়োজন হলেই যে সে সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে, তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার। রাস্তা পেরিয়ে ভিড়ের সাথে মিশে ডানদিকে রওনা হলো সে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

পার্ক সার্কাসের মাঝারি এক হোটেলে উঠেছে সে ইরানী ব্যবসায়ীর পরিচয়ে। ট্রাম ও বাসের ভিড় দেখে স্থির করল হেঁটে ফিরবে আজ। বিশ কদম এগোতেই থির থির করে কেঁপে উঠল হাতঘড়ির পিছনে ফিট করা ইলেকট্রনিক পালসার। ডাকা হচ্ছে ওকে; বলা হচ্ছে যোগাযোগ করতে। মুহূর্তে সজাগ, সচেতন হয়ে গেল ওর চোখ-কান। চট করে একটা বোতাম টিপে পালসার থামিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক চাইল। কয়েক কদম এগিয়ে উঠে

পড়ল এলিট হোটেলের লাউঞ্জে। লাউঞ্জের দু'পাশে দুটো টেলিফোন বুদ। একটার দরজা খোলা দেখে এগিয়ে গেল সে সেইদিকে। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে স্লটের মধ্যে কয়েন ঢুকাতেই ডায়াল টোন এল। একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল বিল্লাহ্। তিন বার রিঙ হতেই খটাং করে রিসিভার তুলল কেউ অপর প্রান্তে।

'হেলো?' বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল।

'তিন আর দুয়ে পাঁচ, আর তিন দুগুণে ছয়—সব মিলে এগারো।' নিজের পরিচয়ের বিশেষ কোড আউড়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ্ গড়গড় করে।

'এক্ষুণি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হতে হবে আপনাকে,' চোস্ত পাঞ্জাবী ভাষায় বলল বিরস কণ্ঠে। 'আজ সাতটার ফ্লাইটে সীট বুক করা হয়েছে আপনার। মাল-সামান এতক্ষণে পৌঁছে গেছে দমদম এয়ারপোর্টে। সেলিমকে পাবেন সেখানে আপনার টিকেটসহ। ব্যাপারটা খুবই আর্জেন্ট।' ডেড হয়ে গেল টেলিফোন।

হোটেল থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ্। দমদমে পৌঁছে দেখা পেল সেলিমের। হাতে সময় নেই, সেলিমের কাছ থেকে টিকেট এবং কিছু বাংলাদেশী টাকা নিয়ে দ্রুত পায়ে আধ-খোলা গেটের দিকে এগোতে গিয়েও থামল সে চিশতির কথা মনে পড়ে যাওয়ায়। ঢাকা এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই চিশতি হারুন আসবে ওকে রিসিভ করতে। ব্যাটা হুইস্কির যম। ওর জন্যে এক বোতল ডিউটি ফ্রী ওল্ড স্মাগলার নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। সেই সুযোগে দেখে নেয়া যাবে কলকাতা ত্যাগ করছে টের পেয়ে গিয়ে ঠিক কি প্রতিক্রিয়া হয় ভারতীয় ওয়াচারের, বাধা দেয়ার কোন মতলব আছে কিনা।

একটা টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এসে জুৎসই এক জায়গা বেছে নিয়ে লোকটাকে আনমনে সান্ধ্য পত্রিকা সামনে মেলে ধরতে দেখে বুঝল বিল্লাহ্, আপাতত ওকে তাড়া করে ধরবার ইচ্ছে নেই ওদের, ওয়াচারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সত্যিই সে প্লেনে উঠে কলকাতা ত্যাগ করে কিনা সেটা দেখে রিপোর্ট করতে।

বিনা বাধাতেই উঠল বিল্লাহ্ প্লেনে, নামলও নিরাপদেই। পাসপোর্টে কোন ত্রুটি নেই, সুটকেসেও ইন্ডিয়ান শাড়ি নেই, বিনা ঝামেলায় লাউঞ্জে বেরিয়ে এল আস্ত সিকান্দার বিল্লাহ্। সামনেই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে চিশতি হারুন। এগিয়ে এল ডান হাত সামনে বাড়িয়ে। হাঁটার ভঙ্গিটা স্ট্রীটফাইটারের মত, হালকা। লম্বা বা চওড়া খুব বেশি না, কিন্তু শরীরের পেশীগুলো ঠিক যেন কড়া পাক দেয়া নারকেলের রশি। এক নজরেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে লোকটার দেহে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের সময়ে

বিদ্যুতের বেগ আনতে পারে লোকটা তার চলায়, কাজে।

চিশতিকে দেখে খুশি হলো সিকান্দার বিল্লাহ্। কাজ্জ বোঝে ছোঁড়া। সবচেয়ে বড় গুণ: বিনা ওজর-আপত্তিতে যেকোন অসুবিধে মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত। ওর মোটো হচ্ছে: সম্ভব যদি হয় করব, অসম্ভব হলে চেষ্টা করব—না নেই।

'ইন্ডিয়ানটা কই?' ভুরু নাচাল বিল্লাহ্। প্রথমেই চিনে নিতে চায় সে কলকাতার নির্দেশ পেয়ে ঢাকায় যে লোকটা ওর পিছু নেবে তার চেহারাটা।

'হাসপাতাল।' চোখ টিপে উত্তর দিল চিশতি। 'চলুন, গাড়িতে উঠে বলছি সব।'

জানা গেল, মিনিট দশেক আগে হঠাৎ জনা তিনেক 'মুকুত্' চেহারার ছোকরা লাউঞ্জে ঢুকে কথা নেই বার্তা নেই একজন গোবেচারা চেহারার পত্রিকা পাঠরত ভদ্রলোককে দমাদম পিটিয়ে বেহুঁশ করে দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়িতে উঠে পগার পার হয়ে গেছে। আশপাশের লোকজন কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঘটে গেছে পুরোটা ব্যাপার, সুতরাং কাজটা কে বা কাহারা করল ঠাহর করে উঠতে পারেনি কেউ। ঝড় থেমে যেতে দেখা গেল লোহার রড জাতীয় কিছুর আঘাতে রক্ত ঝরছে অজ্ঞান লোকটার মাথার একপাশ থেকে। সাথে সাথেই তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন না করেই বুঝে নিল বিল্লাহ্, ঢাকায় এমন কিছু কাজের জন্যে ডাকা হয়েছে ওকে যেটা অনুসরণকারী পিছনে লেগে থাকলে করা যায় না—তাই ভারতীয় ওয়াচারের ওয়াচ করবার ক্ষমতা লোপ পাইয়ে দিয়েছে চিশতি হারুন। এখন ওর জনসমুদ্রে মিশে যেতে কোনই অসুবিধে নেই আর।

ফার্মগেটের কাছে এসে ডানদিকে মোড় নিল চিশতি, চলতে চলতে সংক্ষেপে বর্ণনা করল অ্যাসাইনমেন্টটা। 'ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। করাচির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন বদরুদ্দিন সাহেব। ওরা জানিয়েছে...'

'বদরুদ্দিন!' ভুরু কুঁচকে চাইল বিল্লাহ্ চিশতির মুখের দিকে। কিছুতেই পড়তা পড়ে না ওর এই লোকটার সঙ্গে। 'বদরুদ্দিন ঢাকায়! ওর আন্ডারেই কাজ করতে হবে আমার?'

'হ্যাঁ। ফাইলপত্র ঘেঁটে ইসলামাবাদ জানাচ্ছে যে হাস্না কাওসার বলে একটা বাঙালী মেয়েকে আমরাই লাগিয়েছিলাম সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ীর পিছনে। বেশ কয়েক বছর আগে। তারপর দেশ ভাগ হয়ে গেল, স্বাধীন হয়ে গেল বাংলাদেশ। আমরা আর ওর সাথে যোগাযোগ রাখিনি। হঠাৎ সেদিন পাওয়া গেছে মেয়েটাকে রমনা পার্কের লেকের ধারে, অজ্ঞান অবস্থায়। দু'জন পথচারীর চোখে পড়ায় ওরা আরও লোক ডেকে ওকে হাসপাতালে পাঠাবার

ব্যবস্থা করে। হঠাৎ স্যাটারডে বলে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় খবরটা না বেরোলে এসব ব্যাপারের কিছুই জানা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে। কিভাবে সে বাংলাদেশে এসেছে, কেন অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে ওকে রমনা পার্কে, কিছুই জানি না আমরা; কিন্তু ওর কাছে যে তাজা খবর রয়েছে সেটা হস্তগত করতে হবে আমাদের যেমন করেই হোক। শাহবাগের পি. জি. হাসপাতালে চারতলার এক কেবিনে রয়েছে মেয়েটা। আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, যেমন করে পারি বের করে আনতে হবে ওকে ওই হাসপাতাল থেকে। নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে মিরপুরের একটা বাড়িতে। এই কাজের জন্যেই ডেকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টের পেয়ে গেছে মেয়েটার পরিচয়। একজন আর্মড গার্ড খাড়া করিয়ে দিয়েছে চারতলার করিডরে। বলা যায় না, হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোথাও সরিয়ে নেবে, যেখান থেকে ওকে বের করে আনা আরও কঠিন হবে।'

'এর কাছে সত্যিই কিছু তথ্য আছে বলে মনে করছে ইসলামাবাদ?'

'থাকতে পারে বলে মনে করছে। যদি সত্যিই থাকে, শুধু ইন্ডিয়ান ডিফেন্সই নয়, ওদের ভবিষ্যৎ অফেন্স পরিকল্পনাও জেনে যাব আমরা। সেইজন্যেই ব্যাপারটা এতখানি ভাইটাল।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ চিন্তা করল সিকান্দার বিল্লাহ। ভিতর ভিতর খুশি হয়ে উঠেছে সে। এই ধরনের কাজই ওর পছন্দ। কাজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিপদ আর অ্যাকশন না থাকলে সে-কাজে সুখ আছে? গার্ডেড হাসপাতাল থেকে একটা মেয়েকে বের করে নিয়ে আসা মুখের কথা নয়। এবং নয় বলে কাজটা পুরোপুরি মনে ধরেছে ওর।

'তুমি কিছু ভেবেছ এই ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু ভেবেছি, কিছু করেওছি। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা খুবই আর্জেন্ট। প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর কি ঘটছে জানাবার জন্যে, একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছি পি. জি.-তে। হাসপাতালের আশেপাশেই কোথাও থাকবে সে, প্রতিটা ডেভেলপমেন্ট জানাবে আমাদের। আমি সোজা মানুষ, আমার সোজা কথা, বের করে নিয়ে আসতে হবে যখন, সিধে হাসপাতালে ঢুকে ছিনিয়ে নিয়ে আসাই সবচেয়ে ভাল পন্থা। কপাল ভাল, একজন বাংলাদেশী জেনারেল রয়েছে থার্ড ফ্লোরে। এদেশী আর্মি ইউনিফরম সংগ্রহ করে রেখেছি, একটা জীপ, আর একখানা অ্যাম্বুলেন্সও তৈরি আছে। আপনার যদি পছন্দ হয়, যদি এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে চান, ভাল কথা, সব রেডি আছে। যদি মনে করেন, না, অন্য পন্থা অবলম্বন করা দরকার; ওয়েল, আই অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস। আফটার অল, এটা আপনার অ্যাসাইনমেন্ট, আমার

নয়।'

প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে চিশতির মুখের দিকে চাইল সিকান্দার বিল্লাহ। 'আশ্চর্য! অদ্ভুত মিল রয়েছে আমাদের দু'জনের চিন্তায়। আজ তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কিন্তু আমাকে ধরে ফেলতে খুব দেরি নেই তোমার, ছোকরা। যাই হোক, তোমার সাথে কাজ করে মজা পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। গুড প্ল্যান। তোমার পুরস্কার রয়েছে আমার সুটকেসে, মনে করে চেয়ে নিয়ো।'

'কি ব্র্যান্ড, ওস্তাদ?' চট করে বাম হাতে সিকান্দার বিল্লার পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল চিশতি।

'ওল্ড স্মাগলার।' চিশতিকে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাতে দেখে হাসল বিল্লাহ। 'মিরপুরের সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে না হয় ওঠালাম ওকে, কিন্তু মেয়েটার দেখাশোনা করবে কে? যা মনে হচ্ছে, নার্সিং দরকার ওর। সেবা-শুশ্রূষা তো আর আমাদের দ্বারা হবে না।'

'আমার দ্বারা হবে, ওস্তাদ,' চকচকে চোখে বিল্লার মুখের দিকে চেয়ে চোখ টিপল চিশতি। 'দারুণ মাল! এক নম্বোর! কিন্তু দুঃখের বিষয়, নার্সিংয়ের ভার দিয়েছে বদরুদ্দিন সাহেব শাকিলা মির্জার ওপর।'

'শাকিলা মির্জা! সেই হারামজাদি? টরচার উওম্যান? সে-ও এখন ঢাকায় নাকি?'

'মাসখানেক হয় এসেছে। বিকট চেহারা আর নেই। চমৎকার এক মুখোশ তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে জাপান থেকে। শোনা যায় বদরুদ্দিন সাহেবের সাথে নাকি...'

'ছি!' নাক সিটকাল বিল্লাহ। 'একটা ছাগলী নিয়েও বিছানায় যেতে রাজি আছি, কিন্তু ওকে নিয়ে নয়।'

'দুটোর তফাৎ বদরুদ্দিন বুঝলে তো?'

হাসিতে ফেটে পড়ল দু'জন। গাড়িটা ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার সাত নম্বর সড়ক দিয়ে ঢুকে ডাইনে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

বিকেল ঠিক সোয়া পাঁচটায় একজন ক্যামেরাম্যান এবং একজন হ্যান্ডরাইটিং স্পেশালিস্টকে নিয়ে পি.জি. হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলো সোহেল আহমেদ। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে বলে মনে মনে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে রয়েছে সে। কিন্তু দেরি না করে আর কোন উপায়ও ছিল না।

সাতদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল হ্যান্ডরাইটিং স্পেশালিস্ট বশির হোসেন, ফিরতে আরও তিনদিন দেরি হবে। হেলিকপ্টার পাঠিয়ে তাকে টাঙ্গাইল থেকে আনানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বাড়িতে পাওয়া গেলে তাও এক কথা ছিল, খুঁজেপেতে চারমাইল দূরের এক দীঘিতে পাওয়া গেছে তাকে মৎস্য শিকাররত অবস্থায়। লুঙ্গি পরে কিছুতেই সে ঢাকায় ফেরত আসতে রাজি না হওয়ায় কালতু ব্যয় হয়ে গেছে আরও একটা ঘণ্টা। যাই হোক, এসে পড়েছে সে, এখন আর মেয়েটার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। বশিরের কাজে ভুল হয় না।

সঙ্গী দু'জনকে বাইরে রেখে সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর আশেক রিজভির অফিস কামরায় ঢুকল সোহেল প্রথমে। টেলিফোনে কথা বলছিলেন ভদ্রলোক, মাথা ঝাঁকিয়ে বসবার ইঙ্গিত করলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, গোল মুখ, কাঁচা-পাকা জুলফি, একটা-দুটো গোঁফে পাক ধরেছে, কপালে দায়িত্বের রেখা, খয়েরী ফ্রেমের চশমা। টেলিফোন নামিয়ে রেখে সোহেলের দিকে চেয়ে এমন মিষ্টি করে হাসলেন যে এক হাসিতেই ভদ্রলোকের অন্তর-বাহির সব পরিষ্কার বুঝে নিল সোহেল। পরিচয় দিতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আতিকুল্লাহ তাঁকে।

'এখনও অবশ্য নিশ্চিত হতে পারিনি,' বলল সোহেল, 'তবে খুব সম্ভব ব্যাপারটা টপ সিক্রেট পর্যায়ে পড়তে চলেছে। মেয়েটার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখতে হবে আমাদের পুরো মাত্রায়। যে কোন মুহূর্তে তার প্রাণের উপর হামলা আসতে পারে। একান্ত বিশ্বস্ত লোক ছাড়া ওর খাওয়া দাওয়ার ভার আর কারও ওপর দেবেন না, এবং লক্ষ রাখবেন বিশ্বস্ত নার্স ছাড়া আর কেউ যেন ওর কেবিনে না ঢোকে।'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ জানিয়েছেন এসব আমাকে। সাধ্যমত সবই করা হচ্ছে। আর কিছু চাই আপনাদের?'

'হ্যাঁ। একজন এক্সপার্টকে নিয়ে এসেছি সিগনেচারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। একজন ফটোগ্রাফারও আছে, ছবি তুলে নেবে ট্যাটু মার্কের।'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল ডক্টর আশেক রিজভির। 'ছবি তুলে নেবে!' রসিকতা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ভালমত পরীক্ষা করলেন তিনি সোহেলের মুখটা। 'হিন্দী সিনেচারটা কোথায় রয়েছে জানেন আপনি? যাকে-তাকে ঢুকিয়ে দেবেন ওর ঘরে, আর ও খুশিমনে কাপড় তুলে পিঠ দেখাবে, এতটা আশা করতে পারেন না আপনি। আমিও অ্যালাও করতে দেব না।'

'সজ্ঞান আছে তাহলে?'

নিশ্চয়ই। কাল সকালেই জ্ঞান ফিরেছে ওর। প্রচণ্ড নার্ভাস টেনশনের

মধ্যে রয়েছে ও এখন।'

'যে অবস্থাতেই থাকুক, ছবি আমার চাই। এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। বলা যায় না, হয়তো প্রেসিডেন্টের কাছেও পাঠানোর দরকার হতে পারে ছবিটা। এক কাজ করুন, পেন্টাথল দিয়ে বরং ঘুম পাড়িয়ে দিন ওকে। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। টেরও পাবে না যে ঘুমন্ত অবস্থায় কাপড় তুলে ছবি তোলা হয়েছে ওর।'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার।

'বেশ, ছবি তোলা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয় আপনাদের কাছে...' ডেস্কের উপর রাখা তিনটি টেলিফোনের সবচেয়ে কাছেরটা আরেকটু কাছে টেনে নিলেন ডাক্তার, রিসিভার কানে তুলে নিচুগলায় নির্দেশ দিলেন কাউকে, তারপর ওটা নামিয়ে রেখে ফিরলেন সোহেলের দিকে। 'দশ মিনিটের মধ্যেই লোক পাঠাতে পারবেন ওর কেবিনে। কেবিন নাম্বার...'

'জানা আছে,' বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে চলে গেল সোহেল, বশির হোসেন ও ফটোগ্রাফারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে বসল আবার। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ চিন্তা করে বলল, 'মেয়েটির সম্পর্কে বলুন দেখি?'

'ঠিক কি জানতে চাইছেন? গত পরশু ন'টার দিকে ওকে নিয়ে আসা...'

'ওসব আমার জানা আছে। আমি জানতে চাইছি, আপনার কি মনে হয়, সত্যিই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে মেয়েটার? ভান করছে না তো?'

'আমার তো মনে হয় না।' মাথা নাড়লেন ডক্টর রিজভি। 'হিপনটিজমেও রেসপন্ড করছে না। আমাদের হিপনেটিস্ট দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি। ওকে পরীক্ষা করতে গিয়ে মাথার পিছনে সামান্য জখমের দাগ পাওয়া গেছে। খুবই সামান্য। হয়তো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল। কখনও কখনও এরকম আঘাত পেলে মানুষ সাময়িকভাবে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। নাহ, আমার মনে হয় না যে ভান করছে। সত্যি-সত্যিই স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে মেয়েটার।'

'সারতে কতদিন লাগবে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'এর তো বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। অনুমান করা শক্ত।'

'তবু?'

'এই ধরুন মাস খানেক; এক সপ্তাহও লাগতে পারে, আবার আজ রাতেই ঠিক হয়ে যেতে পারে, আবার ছ'মাস-এক বছর লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে আমার অনুমান: এ ক্ষেত্রে একমাসের বেশি লাগবে না।'

'স্কোপোলামিন যদি প্রয়োগ করা যায়।'

মুচকে হাসলেন ডাক্তার।

'যোগোলামিনের কথাও ভেবে দেখেছি আমি, কিন্তু ওটা বিপজ্জনক হতে পারে। ও যদি স্মৃতিভ্রষ্টের ভান করে থাকে তাহলে যাদুমন্ত্রের কাজ হবে ট্রুথ সিরামে, কিন্তু তা যদি না হয়, যদি সত্যিই ওর স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই ওষুধ প্রয়োগের ফলে আরও সময় নিতে পারে ভাল হতে। আপনারা যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, আমার আপত্তি নেই—কিন্তু পরে আবার আমার দোষ দিতে পারবেন না।'

'দাঁড়ান,' বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল সোহেল। 'আগে আমার হ্যান্ড-রাইটিং স্পেশালিস্ট কি বলে শুনে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছি আমি। আপনার কাজে যথেষ্ট অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে, বুঝতে পারছি। চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে।'

সুপারের কামরা থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল সোহেল, বশির হোসেন ও ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে দ্রুতপায়ে এইদিকেই আসছে ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। কাছাকাছি পৌঁছতেই ভুরু নাচাল সোহেল।

'মেয়েটা হাম্মা কাওসার, কোন সন্দেহ নেই, স্যার!' নিচুগলায় বলল আতিকুল্লাহ। 'বশির বলছে এ সই বাজপেয়ীর।'

'শিওর হচ্ছ কিভাবে?' বশির হোসেনের চোখের দিকে চাইল সোহেল। 'নকল হতে পারে না?'

'পারে না এমন কথা হলপ করে ঠিক বলা যায় না, স্যার। তবে এই সই এবং এই বিশেষ কালি আগেও কয়েকবার দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার। ট্যাটু মার্কের মত দেখালেও সইটা আসলে ট্যাটু করা হয়নি, কালি দিয়ে লেখা—বিশেষ ধরনের কোন পার্মানেন্ট কালি। সইটাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, জাল যে নয় সে ব্যাপারে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এক্ষুণি গ্যারান্টি না দিয়ে অফিসে ফিরে আমি ছবিগুলো আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই স্যার।'

'বেশ রওনা হয়ে যাও তোমরা, আমি আসছি একটু পরেই।' বশির হোসেন আর ক্যামেরাম্যান রওনা হয়ে যেতেই আতিকুল্লার দিকে ফিরল সোহেল। 'খুব সাবধান, আতিক! মনে হচ্ছে এবার বিরাট রুই পড়েছে জালে। বড় সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবার, তাঁর মাধ্যমে জানাতে হবে প্রেসিডেন্টকে। আমি ওদিকটা দেখছি, তুমি দেখো এদিকটা। পাহারায় যেন বিন্দুমাত্র ঢিল না পড়ে।'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার। আমি দায়িত্ব নিয়েছি যখন, নিরাপদ থাকবে হাম্মা কাওসার। এদিক থেকে কোন চিন্তা নেই।'

আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হলো ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার কণ্ঠে। যদি ওর

ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষতম এজেন্ট সিকান্দার বিল্লাকে, কিংবা যদি জানা থাকত মেয়েটাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুদূত যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী—তাহলে প্রহরার ব্যবস্থা আরও একশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়ার জো ছিল না ওর। কিন্তু এসবের কিছুই জানে না সে। কাজেই ধরে নিয়েছে চায়নিজ স্টেন হাতে একজন গার্ডই হান্না কাউসারের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট।

জানল না, কতবড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে মেয়েটির মাথার উপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূত।

•

সন্ধে ঠিক ছয়টার সময় কড়া নাড়ার শব্দ হলো মোহাম্মদ আলমগীরের দুই-কামরা ফ্ল্যাটের দরজায়। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আলমগীরের. চট করে চাইল সামনের সোফায় বসা কবিতা রায়ের চোখের দিকে। কাঁপা গলায় বলল. 'এসে গেছে!'

হাসল কবিতা। হাসিতে আশ্বাস। আলমগীরের উরুতে বাম হাতে মৃদু চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি খুলে দিচ্ছি।'

দরজা খুলেই বুকের ভিতর কেমন যেন হিম হয়ে গেল কবিতার। ওরই সমান লম্বা, শুকনো-পাতলা এক লোক ছোট্ট একটা সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল—দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, এর ডোসিয়েরে পড়া না থাকলে কল্পনাও করতে পারত না কবিতা যে এর বয়স আসলে আঠারো। নিজাম এর নাম। নিগ্রোদের মত ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ানো কালো চুল, খোসা ছড়ানো ঝুনো নারকেলের মত ছোট্ট মাথা, কোঁকড়ানো ছোট্ট কান, কামুক, ঘোলাটে চোখ, খাড়া নাক। কাঠি-কাঠি হাত পা, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় হাড়ের উপর যেটুকু চামড়া, মাংস আর পেশী জড়ানো রয়েছে সেগুলো ধুনারির ছিলার মত টান হয়ে রয়েছে সবসময়—সদা প্রস্তুত। গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু জায়গায় জায়গায় ময়লার ছোপ লেগে থাকায় আঁশ ছাড়ানো কৈ-মাছের মত লাগছে। বোতাম-খোলা ধবধবে পরিষ্কার শার্টের নিচে নোংরা, ময়লা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। গায়ে কেমন বোঁটকা মত গন্ধ।

নিজামের দৃষ্টিটা কয়েক সেকেন্ড কবিতার চোখের উপর স্থির থেকে ধীরে ধীরে গলা বেয়ে নেমে এল বুকের উপর। শিরশির করে উঠল ওর বুক, মনে হলো লেহন করছে যেন *কেউ*। পেট বেয়ে নেমে এল দৃষ্টিটা কোমর পর্যন্ত।

নিজেকে বিবস্ত্র মনে হচ্ছে কবিতার, মনে হচ্ছে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটা। জিভটা শুকিয়ে এসেছিল, কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

বলেই পিছন ফিরে ড্রইংরুমের দিকে এগোল কবিতা। স্পষ্ট অনুভব করল অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোভনীয় ভঙ্গিতে ঢেউ তুলছে সে নিজের নিতম্বে, কোমর দুলছে হাঁটার ছন্দে। পাতলা একচিলতে মারফতি হাসির আভাস ফুটল নিজামের ঠোঁটে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা বাড়াল সে সামনে। সতর্ক, সাবধানী পদক্ষেপ। প্রতিমুহূর্তে বিপদের জন্যে তৈরি যেন সে।

ক্লাস ফাইভের বেশি এগোতে পারেনি নিজাম। বছর তিনেক একই ক্লাসে গোত্তা খাওয়ার পর বিধবা মা ছাড়িয়ে নিয়েছিল ওকে ইস্কুল থেকে। সবাই বুঝে নিয়েছিল লেখাপড়া জিনিসটা আদতেই ওর ক্ষমতার বাইরের ব্যাপার। ইতিমধ্যেই 'হারামী' খেতাব পেয়ে গিয়েছিল সে মহল্লায়। স্কুল ছাড়ার পর পুরোপুরি মন দিল সে তার প্রফেশনে। বছর দুই বিভিন্ন অপরাধের জন্যে ধরা পড়ে মহল্লার সর্দারের জুতো আর থানা-পুলিসের অমানুষিক পিট্টি খেয়ে খেয়ে পুরোপুরি মানুষ হয়ে গেল সে পনেরো বছর বয়সেই। সর্দারের চোদ্দ বছরের মেয়েটাকে রেপ করে, মাকে ছুরি মেরে একদিন পা বাড়াল সে মহল্লা ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায়। লুফে নিল ওকে একদল লোকে। ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি, জীবন-মৃত্যু—কোনকিছু সম্পর্কে যে লোকের কোন রকম বাছবিচার নেই, এক ধরনের লোকের কাছে সে হয়ে দাঁড়ায় অমূল্য সম্পদের মত। যা খুশি তাই করানো যায় একে দিয়ে, ব্যবহার করা যায় যেমন খুশি তেমনি ভাবে। নির্বিকার চিত্তে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইল—সব করেছে নিজাম। টাকা আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু চাহিদা নেই ওর দুনিয়ার কাছে। এই দুটো জিনিস যার কাছে পাবে সে তারই চাকর। বিনিময়ে যেকোন বিপজ্জনক কাজ করতে সে রাজি। যদি সে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটে, ঘটবে—মানুষ মরণশীল।

বছরখানেক আগে ঢাকার এক নিষিদ্ধ পল্লী থেকে উদ্ধার করেছে ওকে যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী। অঢেল টাকা আর প্রচুর মেয়েমানুষ পেয়ে এমনই কেনা গোলাম হয়ে গেছে সে যজ্ঞেশ্বরের, যে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেনি সে অস্ত্রশস্ত্র এবং হত্যার কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনমাসের কঠোর ট্রেনিং নিতেও। বিশেষ ট্রেনিং দেয়ার পর ওর নামে একটা আলাদা ফাইল খোলা হয়েছে। সেই ফাইলে ওর নামের নিচে লাল কালিতে লেখা: মেন্টালি রিটার্ডেড, কমপ্লিটলি অ্যামোরাল, হাইলি ডেঞ্জারাস ম্যান।

ড্রইংরুমে ঢুকে আলমগীরকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নির্লজ্জ দৃষ্টি বুলাল সে কয়েক সেকেন্ড কবিতার দেহের উপর যত্রতত্র। তীব্র, বিরক্ত

দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে আলমগীর। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'বসো। সিট ডাউন।'

আরও কয়েক সেকেন্ড কবিতার দিকে চেয়ে থেকে প্রথমে সুটকেসটা রাখল নিজাম সোফার উপর, তারপর বসে পড়ল তার পাশে। এমন ভঙ্গিতে বসল, যেন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, কোথাও কোন খুট শব্দ হলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াবে।

এই লোকটার ভাব-ভঙ্গি দেখে আরও বেশি ভড়কে গেল আলমগীর। দুপুরে ফিরে গিয়ে অমলেশ কর্নারেই পেয়েছিল কবিতাকে। চুপচাপ খাওয়া সেরে কেটে পড়ার তালে ছিল সে, কিন্তু ছাড়েনি কবিতা, চলে এসেছে ওর সাথে। কি হয়েছে, কি ভাবছ, কি বলল গাঙ্গুলীদা, এমন গম্ভীর মুখে কি চিন্তা করছ—বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সব প্রশ্ন করায় আর চেপে রাখতে পারেনি আলমগীর, গড়গড় করে বলে ফেলেছে সব। সব শেষে বলেছে, 'কিন্তু এ যে মানুষ খুন, কবিতা! হত্যা! কি করব কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। তোমার কি মনে হয়?'

'তোমাকে তো আর নিজ হাতে খুন করতে বলা হয়নি,' প্রলেপ মাখাবার চেষ্টা করল কবিতা। 'শুধু দেখাশোনাটা তোমার।' ঘন হয়ে এল সে বুকের কাছে। 'তাছাড়া ফিরবার কোন পথ নেই তোমার, আলম, গাঙ্গুলীদার আদেশ তোমাকে মানতেই হবে। নইলে তোমার কাছ থেকে আমাকে তো ছিনিয়ে নেয়া হবেই, তোমাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না ওঁর। এত শিগগির তোমাকে উনি এত বড় গুরু দায়িত্ব দেবেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার জন্যে এটা কিন্তু বিরাট গর্বের ব্যাপার। মন খারাপ করে না, লক্ষ্মী। আমাকে যদি এই আদেশ দিতেন, চোখ বুজে বিনা দ্বিধায় করতাম আমি। তোমাকে যে বাছাই করা হয়েছে, এটা তোমার জন্যে মস্ত সম্মানের ব্যাপার!'

এইসব সান্ত্বনার বাণীতে তেমন কোন কাজ হচ্ছে না, ব্যাপারটা আলমগীর মন থেকে স্বীকার করে নিতে পারছে না টের পেয়ে বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে কবিতা। আশা করেছে হয়তো এতে কিছুটা প্রশমিত হবে ওর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর ভয়। কিন্তু কিসের কি! এমনিতেই পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে আলমগীরের সংস্কৃতিবান চেহারাটা, এসবের ফলে মাঝখান থেকে চোখদুটো বসে গেল আরও গর্তে।

তিনটে ঘণ্টাকে মনে হয়েছে ওর তিন বছর। আকাশ-পাতাল ভেবেছে সে। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে খাকী পোশাক, একজোড়া হাতকড়া, ফাঁসীকাঠ। ইচ্ছে করলেই যে সে পুলিসের কাছে গিয়ে সব ভেঙে বলতে পারে না, বলতে গেলে ছোটখাট নানান ধরনের দেশদ্রোহিতার কথা

ফাঁস হয়ে গিয়ে নিজেই জড়িয়ে পড়বে মহা বিপদে—এটা ধীরে ধীরে যতই পরিষ্কার হয়ে এল ওর কাছে, ততই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল আলমগীর: মাকড়সার জালে আটকে গেছে সে নিরুপায় মাছির মত। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর হুকুম তামিল না করে উপায় নেই ওর। যত বিপদই থাকুক, যত ভয়ই লাগুক, মেয়েটাকে হত্যা করবার ব্যবস্থা ওর করতেই হবে।

নিজামের গায়ের বোঁটকা দুর্গন্ধ নাকে যেতেই নাকটা কুঁচকে উঠল আলমগীরের। সামলে নিয়ে প্রফেসারী ভঙ্গিতে বলল, 'একটা মেয়েকে খুন করতে হবে তোমায়। পি.জি. হাসপাতালে। কাজটা তোমার, তদারক করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে কাজটা সম্পন্ন করা যায়। প্রথমেই তোমার জানতে হবে হাসপাতালের কোথায় রয়েছে মেয়েটা—কোন্ ওয়ার্ড বা কত নম্বর কেবিনে, কত তলায়। সেটা জানতে পারলেই সহজ হয়ে যাচ্ছে তোমার বাকি কাজটুকু। হয়তো পাইপ-টাইপ বেয়ে ওপারে উঠতে হতে পারে তোমার। পাইপ বেয়ে উঠতে পারো তো? পড়ে-টড়ে গেলে...'

নিজামের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখে থেমে গেল আলমগীর। হাসিটা আর একটু বিস্তৃত হতেই তরমুজের বীচির মত দুই সারি নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মুখ খুলল নিজাম।

'ফেরেন্ মাল দেহা যায়...এই কামে নতুন বুঝি? বুজছি! আজিরা প্যাচাল ফালায়া থোন মিঞা, যা করনের আমিই করুম। আপনে গাড়িটা ডেরাইব করবেন, আর বেহুদা দিগদারি না কইরা খামোস্ খাইয়া থাকবেন—দেখবেন সব ফায়সালা হোইয়া যাইব লাইন মথন। বেশি চুদুর-বুদুর করবেন তো অর মায়েরে—, ফাইসা যাইবেন গা। আমার ট্যাকা লোইয়া কথা, বাহাদুরী লন না আপনে। বাহাদুরীর লেইগা আমার—টারও কিছু আইব-যাইব না।'

লোকটা অবলীলা ক্রমে যা-তা গালি-গালাচ করে চলেছে দেখে রেগে উঠল আলমগীর।

'অ্যাই! মুখ সামলে কথা বলো।·ভদ্রমহিলার সামনে গালাগালি করবে না। তোমাকে ডাকা হয়েছে আমি যা বলব তাই করার জন্যে। ঠিক যেমন যেমন বলব তেমনি ভাবে কাজ করতে তুমি বাধ্য। আমার...'

'আলম,' নরম গলায় ডাকল কবিতা। 'প্লীজ, তর্ক করে সময় নষ্ট কোরো না। ও যা বলছে, ঠিকই বলছে। তোমার চেয়ে ওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। ও যেমন ভাবে যা করতে চায় করতে দাও, যদি মারাত্মক কোন ভুল করতে যায়, ওধরে দিয়ো।'

এইসব কথায় কান দিল না নিজাম। ঝটাং করে সুটকেস খুলে তার মধ্যে থেকে বের করে আনল একটা পয়েন্ট টু-কাইভ বেরেটা পিস্তল। লম্বা একটা ছিদ্রবিশিষ্ট সাইলেন্সার পাইপ ফিট করল সে পিস্তলের মুখে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

পিস্তল দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল আলমগীরের। বিশেষ করে নিজামের পিস্তল ধরার সহজ, অভ্যস্ত ভঙ্গি দেখে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে এল ওর। রাগ উবে গেল বেমালুম, সেই জায়গায় আতঙ্ক এসে ভর করতে চাইছে। উঠে দাঁড়াল নিজাম। আর একবার কামাতুর দৃষ্টি দিয়ে লেহন করল কবিতার শরীরের লোভনীয় অংশগুলো, ওর গায়ে কাঁটা উঠতে দেখে হাসল মারফতি হাসি, তারপর ফিরল আলমগীরের দিকে।

'অইছে। অহন আগে বাড়েন। ডরে তো দেহি এক্কেরে পুক-পুক করতাছেন। এমতে কাম অইবো কেম্‌তে? আন্ধার অইতে দেরি আছে অহন তরি। চলেন খাতিরজামা জাগাটা রেকি কইরা লোই আগে।' সুটকেসটা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে বাইরে বেরোবার দরজার দিকে।

মৃদু ঠেলা দিল কবিতা আলমগীরের পিঠে। 'যাও। প্রফেশনাল ও। কোন চিন্তা নেই, আলম। ওর কথামত চললে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

তবু কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল আলমগীর। কে কার কথামত চলবে তাই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে আসল কাজে দেরি করতে চেয়েছিল সে, ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চেয়েছিল তর্কের আড়ালে, কিন্তু সেসবের মধ্যে কেউ গেল না দেখে আরও দমে গেছে সে। সত্যিই তাহলে খুন করতে চলেছে ওরা একটা মেয়েকে? কথাটা চট করে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে আতঙ্ক কিছুটা সামলে নিল সে, গাড়ির চাবিটা নিয়ে পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জিভ।

অফিসে ফিরে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে পেল না সোহেল। কয়েক মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন তিনি, বর্ডারের গোলযোগ সংক্রান্ত একটা মীটিং সেরে অফিসে আর ফিরবেন না, সোজা চলে যাবেন বাড়িতে। ভেবেচিন্তে মীটিং-এর মাঝখানেই মেজর জেনারেলকে ডিসটার্ব করবার সিদ্ধান্ত নিল সোহেল। দুই মিনিটের মধ্যে সবটা ব্যাপার কি করে বোঝানো যায় গুছিয়ে নিল মনে মনে, তারপর আদেশ দিল পারভিনকে সেক্রেটারিয়েটে যোগাযোগ করতে।

দুই মিনিট চুপচাপ শুনলেন মেজর জেনারেল, সোহেলের বক্তব্য শেষ হতেই মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত। কমপিউটারের বেগে চলে বৃদ্ধের চিন্তা।

'ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টকে জানানোর উপযোগী হয়নি এখনও, সোহেল।

তোমার তরফ থেকে আরও বেশ কিছুটা অগ্রগতি হওয়া দরকার। এটাকে টপ প্রায়োরিটি দিয়েছ, ভাল করছ—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটু যেন বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তুমি। মেয়েটা নকল হতে পারে, আমাদের মিসলিড করার জন্যে কারও কোন চালও হতে পারে। কাজেই একটু সাবধানে এগোনো ভাল। ভাল কথা, রানা এখন ঢাকায়। ওর সাহায্য নিতে পারো ইচ্ছা করলে। আমি এদিকের ঝামেলায় খুবই ব্যস্ত আছি, তোমরা দু'জন মিলে যা ভাল বোঝো করতে পারো, তোমাদের পেছনে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে।'

কথা ক'টা বলেই রিসিভার নামিয়ে রেখে দিলেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ঝিক করে উঠল সোহেলের চিন্তা ভারাক্রান্ত মুখটা উজ্জ্বল এক হাসিতে। ঠিক বলেছে বুড়ো: রানা! মাসুদ রানার কথা একবারও মাথায় আসেনি ওর। ওই ব্যাটাকে কোনমতে এ ব্যাপারে জড়াতে পারলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

কয়েক জায়গায় ফোন করে কোথাও পাওয়া গেল না রানাকে। বাসায় নেই, রানা এজেন্সির অফিসে নেই, সোহানার বাড়িতে নেই, ক্লাবে নেই। গেল কোথায় ব্যাটা! এই কয়টা নম্বরে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর একবার করে রিঙ করে খোঁজ নেয়ার নির্দেশ দিল সে টেলিফোন অপারেটরকে। তারপর পারভিনের রেখে যাওয়া চিকেন স্যান্ডউইচের প্লেট আর কফির ফ্লাস্কটা কাছে টেনে নিল। এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে কামড় দিল স্যান্ডউইচে। মাথার মধ্যে চলেছে চিন্তা জেটের বেগে।

ঘন্টাখানেক চুপচাপ একা বসে চিন্তা করল সোহেল। এক ধাপ এক ধাপ করে এগিয়ে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন তৈরি করে ফেলল সে মনে মনে। ভাল-মন্দ সব দিক বিচার করে দেখল যতদূর সম্ভব। ঘড়িতে দেখল: সোয়া সাতটা। টেলিফোনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট ডিপার্টমেন্টের চীফ হাতেম আলীকে নির্দেশ দিল কয়েকটা। আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখল প্ল্যানটা কোথাও কোন ফাঁক বের করতে না পেরে খুশি হলো নিজেরই উপর। কিন্তু...রানা গেল কোথায়? ওকে পাওয়া না গেলে আবার গোড়া থেকে ঢেলে সাজাতে হবে সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম। আবার ঘড়ি দেখল সে। সাড়ে সাতটা বাজে।

'কি হলো? পাওয়া গেল না মাসুদ রানাকে এখন পর্যন্ত?'

'না, স্যার।' জবাব দিল টেলিফোন অপারেটর।

তিন সেকেন্ড চিন্তা করে সোহেল বলল, 'কোন্ নাম্বার থেকে কি উত্তর দিচ্ছে?'

'ক্লাব থেকে বলছে গত কয়েক মাসে একবারও আসেননি উনি ক্লাবে। মিস্ সোহানা চৌধুরী বলেছেন গত তিনদিন দেখা হয়নি তাঁর সাথে। তিনদিন

আগে প্যারিস থেকে ফিরেছেন ওঁরা একসাথে. তার পর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ওঁর।'

'রানা এজেন্সি থেকে কি বলছে?'

'ওঁরা বলেছেন মাসুদ রানাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারবেন না।'

'আর বাসা?'

'বাসা থেকে বলছে গত তিনদিন ভোর ছ'টায় বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত বারোটায়।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সোহেল। বোঝা যাচ্ছে ঢাকাতেই আছে ব্যাটা। এমন কিছু ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে যেখানে ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আটকা থাকতে হচ্ছে ওকে। কী এমন ব্যাপার হতে পারে! হঠাৎ চট করে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে চাইল সে। সাতটা তেত্রিশ। এই সময়ে তো রানা এজেন্সিতে লোক থাকবার কথা নয়। ছুটি হয়ে গেছে পাঁচটায়, এতক্ষণ পর্যন্ত কি করছে ওরা অফিসে বসে? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় মৃদু হাসি ফুটে উঠল সোহেলের ঠোঁটে। ডিরেক্ট লাইনের টেলিফোনটা কাছে টেনে নিয়ে রিসিভার ঘাড়ে বাধিয়ে ডায়াল করল সে রানা এজেন্সির নাম্বারে।

'রানা এজেন্সি,' সালমা কবিরের মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল।

'দেখুন, মস্ত বিপদে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আমি আলী ইমদাদ, ক্লথ মার্চেন্ট। খুবই আর্জেন্ট—'

'দুঃখিত। পুরানো কেস নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছি, নতুন কেস হাতে নেয়া আপাতত আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি বরং…'

'আমাকে নিরাশ করবেন না দয়া করে। এইমাত্র ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমার দোকানে। পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না, আমি জানি। আপনাদের চীফ মিস্টার মাসুদ রানা ছাড়া…'

'ওঁর দম ফেলবার অবসর নেই, ভাই। আরও তিনটে দিন উনি কোন দিকে কোন খেয়াল দিতে পারবেন না। তবে আপনি যখন বলছেন খুবই বিপদে পড়েছেন, আপনাকে বিমুখ করা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে চলে যাবে। ঠিক আছে, চলে আসুন। বস্ অফিসেই আছেন, কোন চিন্তা নেই, সমাধান হয়ে যাবে আপনার সমস্যার।'

'থ্যাংকিউ ভেরি মাচ! আসছি আমি এক্ষুণি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে আপন মনে খানিকক্ষণ হাসল সোহেল, তারপর একলাফে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। নজর গেল ঘড়ির দিকে: সাতটা পঁয়ত্রিশ।

ঠিক এই সময়ে বদরুদ্দিনের কামরায় চূড়ান্ত প্ল্যানটা পাস করিয়ে নিচ্ছে

সিকান্দার বিল্লাহ ও চিশতি হারুন। এখুনি নামবে ওরা কাজে। ওদিকে মোহাম্মদ আলমগীর আর নিজাম বসে আছে পি.জি. হাসপাতালের একপাশে একটা বটগাছের নিচে পার্ক করা ফিয়াট সিক্স হানড্রেডের ভিতর। মেঘ করেছে আকাশে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে থেকে থেকে। আর মেয়েটা, যাকে সবাই সন্দেহ করছে হাস্না কাওসার বলে, তেমনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এখনও পেন্টাথলের প্রভাবে। চারতলার করিডরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে নায়েক ইলিয়াস দেওয়ান। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি তার। হাতে প্রস্তুত চায়নিজ স্টেন। যদিও বুদ্ধির দিক থেকে কিছুটা কমতি আছে, দ্রুত এবং নির্ভুল লক্ষ্যভেদে গোটা রেজিমেন্টে তার জুড়ি নেই। ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার একান্ত বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে অন্যতম সে। হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর বার বার চাইছে সে হাস্না কাওসারের কেবিনের বন্ধ দরজার দিকে।

তিন

কষ্টেসৃষ্টে সালমা কবীর ও গিলটি মিঞার হাত থেকে রানাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল সোহেল নিজের অফিসে।

কাজ করছিল রানা। গত তিন দিন ধরেই একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে সে ভূতের মত। সোয়া তিনশো পুরানা কেস পেন্ডিং পড়ে আছে রানা এজেন্সির। সাধ্যমত সবকিছুই করেছে গিলটি মিঞা, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান করেছে সে অসংখ্য জটিল কেস, কিন্তু যেগুলোর সমাধান ওর সাধ্যের অতীত সেগুলোই জমতে জমতে দাঁড়িয়েছে আজ সোয়া তিনশোতে। রানাকে পাওয়া যায় না, কাজেই কাস্টোমারদের চাপ ও বিরক্তি সহ্য করতে হয় ওদের দু'জনকেই। তাই এবার বিদেশ থেকে ফিরতেই রিজাইন দেয়ার ভয় দেখিয়ে আটকে ফেলেছে ওরা রানাকে। ভোর ছটার সময় গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে ওকে গিলটি মিঞা, সারাদিন অফিসে বন্দী, রাত বারোটার আগে ছাড়াছাড়ি নেই। একটার পর একটা ফাইল আনা হচ্ছে ওর সামনে, জানানো হচ্ছে কোন্ লাইনে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে; কোথায় আটকে গেছে গিলটি মিঞা। জেনে নেয়া হচ্ছে প্রতিটি ব্যাপারে রানার মতামত।

সালমা ও গিলটি মিঞার জন্যে এ এক আশ্চর্য নতুন উপলব্ধি। রানার প্রতি শ্রদ্ধার কমতি ছিল না ওদের কোনদিনই, কিন্তু এবার নতুন করে চিনল ওরা ওদের স্বল্পভাষী, ফাঁকিবাজ বসকে। মানুষের পরিচয় তার কাজে। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে রানার তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আর

নিজস্ব আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেল ওরা নতুন করে। যেসব জটিল কেস নিয়ে হাবুডুবু খেয়েছে গিলটি মিঞা, অনেক মাথা ঘামিয়েও কোন সমাধান বের করতে পারেনি সালমা, রানার সামনে ফেলে ধরতেই সহজ, সরল সমাধান বেরিয়ে পড়ছে সেসবের; সমস্ত জট ছাড়িয়ে জলের মত পরিষ্কার করে দিচ্ছে রানা প্রতিটি সমস্যা। ওদের জন্যে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। রানার সাথে সাথে ভূতের মত পরিশ্রম করেছে ওরাও এই তিনদিন ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত, কিন্তু একবিন্দু ক্লান্তি আসেনি; ধন্য মনে করেছে ওরা নিজেদেরকে এই তীক্ষ্ণধি মানুষটার সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়ে। এই না হলে বস্।

'এই সেরেচে!' সোহেলকে দেখেই আঁৎকে উঠল গিলটি মিঞা। 'কাপড়ের মার্চেন কোতায়, এ যে সেই হাতকাটা সায়েব দেকচি! আর ঠেকানো গেল না, সালমা দি, দেকবে, ঠিক উটিয়েঁ লিয়ে যাবে কাজ থেকে। খুব ডায়ানক লোক!'

নিয়ে ঠিকই গেল, কিন্তু কথা দিতে বাধ্য হলো সোহেল, যে কয়দিন অনুপস্থিত থাকবে রানা, সে কয়দিন অফিস ছুটির পর দু'ঘণ্টা করে ডিউটি দেবে সে রানার বদলে। এই ব্যবস্থায় গিলটি মিঞা মোটেই সন্তুষ্ট হলো না যদিও, সালমাকে দেখে মনে হলো সোহেলের বুদ্ধিদীপ্ত রস-রসিকতা আর তীক্ষ্ণ সংলাপ শুনে বেশ ভজে গেছে সে।

অফিসে ফিরেই গম্ভীর হয়ে গেল সোহেল। গোল্ডফ্লেকের একটা প্যাকেট রানার দিকে ঠেলে দিতেই ভুরু কুঁচকে চাইল রানা ওর দিকে।

'তোর মনটা বড় হয়ে গিয়েছে, নাকি কঠিন কিছুতে ফেঁসেছিস, দোস্ত? মেরে দেব জেনেও পুরো প্যাকেট এগিয়ে দিচ্ছিস আমার দিকে, তোর জানে ডর নেই?'

'একটা আছে ওতে,' বলেই মুচকে হাসল সোহেল। ড্রয়ার টেনে নতুন একটা প্যাকেট খুলে নিজেও ধরাল সিগারেট। তারপর সংক্ষেপে বলল রানাকে হাস্না কাওসারের ব্যাপারটা।

'আশা করছিস গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যাবে এই মেয়েটার কাছে,' বলল রানা সব শুনে। 'ভাল কথা। এর মধ্যে আমি কি সাহায্য করিতে পারি?'

'তথ্য থাকলেই যে ও আমাদের সেটা জানাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পুরানো ফাইল ঘেঁটে জানা গেছে এই মেয়েটাকে পাকিস্তানী আমলে আমরাই লাগিয়েছিলাম বাজপেয়ীর পিছনে। মেয়েটার বাপ বাঙালী, কিন্তু মা পাঞ্জাবী। ওর এলিজিয়েন্স কোন দিকে, বাংলাদেশ না পাকিস্তান, জানা নেই আমাদের।'

'পাকিস্তানের প্রতি এলিজিয়েন্স থাকলে নয়াদিল্লী থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসবে কেন?'

'বাংলাদেশের প্রতি এলিজিয়েন্স থাকলে গত সাড়ে চার বছর কন্ট্যাক্ট করেনি কেন?'

'বুঝলাম।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শিওর হতে পারছিস না। ভাল কথা। এবার তোর প্ল্যান-প্রোগ্রাম বলে ফেল। আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'ডাক্তার বলছে ওর স্মৃতি ফিরে আসতে বেশ কিছুটা সময় নিতে পারে। ঝট করে একদিনে ফিরে আসতে পারে, আবার একটু একটু করে কয়েকদিনে আসতে পারে। সেইজন্যে খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করা দরকার ওকে। আমার প্ল্যান হচ্ছে তোর সাথে ওর বিয়ে দিয়ে দেয়া।'

'বিয়ে দিয়ে দেয়া?'

'হ্যাঁ! ফল্‌স্‌ ম্যারেজ। তুই অভিনয় করবি যেন তুই ওর স্বামী। এই মুহূর্তে ও জানে না ও কে। জানে না কোথায় ছিল, কোথায় আছে, কোথায় যাবে। ব্যাকগ্রাউন্ড কিচ্ছু মনে নেই ওর। কাজেই স্বামী হিসেবে তোকে মেনে না নিয়ে ওর কোন উপায় নেই। যদি প্রমাণ চায়, দেখাবি প্রমাণ। এতক্ষণে খুবসম্ভব কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছে সার্টিফিকেট ডিপার্টমেন্টের হাতেম আলী। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নম্বর নিয়ম মোতাবেক নির্ধারিত নিকাহ্‌ নামার ফরম রেডি, মিসেস মাসুদ রানা হিসেবে ওর জন্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টও তৈরি হয়ে গেছে। তুই চট্টগ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ী, ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলি, বউ হারিয়ে যায় হোটেল থেকে, স্যাটারডে পত্রিকায় খবর পড়ে উদ্ধার করছিস ওকে হাসপাতাল থেকে। স্মৃতি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কক্সবাজার থেকে মাইল তিনেক দূরে তোর এক বন্ধুর বাংলোয় বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিস তুই স্ত্রীকে। আশা করছিস, সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় দ্রুত ফিরে আসবে ওর স্মৃতি। তথ্য পেলেই রিলে করছিস তুই আমাদের কাছে।'

'যত রাজ্যের প্যাঁচ তোর মাথায়,' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। 'যদি ঝট করে সব স্মৃতি একবারে ফিরে আসে, ভেবে দেখেছিস কি রকম গাধা বনে যাচ্ছি আমি ওর স্বামীর অভিনয় করতে গিয়ে?'

'গাধা তো আছিসই, এর বেশি আর কি বনবি?' রানাকে হাসতে দেখে বলল, 'যখন যে অবস্থার সৃষ্টি হবে—ট্যাক্‌ল্‌ করবি।'

'কক্সবাজারের তিন মাইল দূরে কোন্‌ বন্ধুর বাংলোয় উঠছি ওকে নিয়ে?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান। বাংলোটা ওর। বাবুর্চি আর দারোয়ান আগে থেকেই আছে। এখন সিকিউরিটির খাতিরে কয়েক আর্মি গার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

'সিকিউরিটি?' এইবার সজাগ হয়ে উঠল রানা। 'কিসের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি? হঠাৎ এই প্রশ্ন উঠছে কেন আবার?'

'সাপ্তাহিক স্যাটারডেতে সত্যিই বেরিয়েছে খবরটা।'

'আই সি!' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল রানা। 'কারা বাধা দেবে বলে তোর ধারণা? ভারত, না পাকিস্তান?'

'সম্ভবত উভয়েই।' সিগারেট ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'কাজেই এক্ষুণি নামতে হবে তোর কাজে।'

ছোট্ট করে শিস দিল রানা। খানিক ভাবল। তারপর অনেকটা আনমনে বলল, 'বুড়োর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হচ্ছে···তার মানে সরাসরি তার মত যদি নাও পেয়ে থাকিস, ব্যাপারটা সম্পর্কে সে পূর্ণ ওয়াকেফহাল, আশা করছিস তোর প্ল্যান-প্রোগ্রামে তার কোন আপত্তি থাকবে না। অন্তত ভাবটা তাই দেখাচ্ছিস। তাছাড়া ব্যাপারটা আমার সামনে এমন ভাবে হাজির করছিস, যেন আদেশটা এসেছে অনেক ওপর মহল থেকে, রাজি না হয়ে আমার কোন উপায় নেই। অথচ আমি এর মধ্যে ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। অতএব, কাজে নামার আগে আমি বুড়োর সাথে কথা বলে নিতে চাই।' টেলিফোনের দিকে ইঙ্গিত করল রানা, 'কোথায় পাওয়া যাবে বুড়োকে? যোগাযোগ কর্।'

'এখন ওঁকে পাওয়া যাবে না। আমি যোগাযোগ করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। উনি বললেন: তুমি আর রানা মিলে যা ভাল বুঝবে করতে পারো। তোমাদের পেছনে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। কাজেই···'

'তুই আর আমি? আমি তো দেখছি তুই আর তুই মিলেই যা ভাল বুঝছিস তাই ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছিস আমার।'

'তা কিন্তু ঠিক নয়, দোস্ত! ইট ইজ ওপেন টু ডিসকাশন। আমি যা ভেবেছি বললাম, আয়, এবার এটাকে ইমপ্রুভ করা যাক। ফাঁকটা কোথায় দেখছিস তুই?'

'প্রথম কথা, এটা আসল হাস্না কাওসার না-ও হতে পারে। আমাদের মিসলিড করার জন্যে কারও কোন চাল হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই দুপুর থেকে এ পর্যন্ত মাছি না তাড়িয়ে কিছু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করা দরকার ছিল তোর। রমনা পার্কে আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়েনি মেয়েটা। এয়ারলাইনগুলোর প্যাসেঞ্জার লিস্ট খোঁজ করেছিস? ঢাকার সমস্ত হোটেলে খবর নেয়া হয়েছে? দিল্লী থেকে কিভাবে এল মেয়েটা, উঠল কোথায়, বারবিচুরেট নিজে খেলো, না খাওয়ানো হলো? দিল্লীতে খোঁজ নিয়েছিস হাস্না কাওসার সত্যিই গায়েব হয়েছে কিনা? ঢাকায় ভারতীয় এবং পাকিস্তানী মহলের তৎপরতা লক্ষ করা হয়েছে? ঠিক···'

'পাকিস্তানী মহলে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ করা গেছে,' বলল সোহেল। 'ভারতীয় সার্কেলে কি ঘটছে কিছু বোঝার উপায় নেই, ওরা গভীর জলের মাছ, কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। হোটেল আর এয়ারলাইনসের কথা আমার

মাথায় আসেনি. এক্ষুণি লাগিয়ে দিচ্ছি লোক। দিল্লীতেও খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। এনিথিং মোর?'

আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ হলো ওদের। একটা স্লিপ প্যাডে নম্বর দিয়ে লিখে নিল সোহেল প্রত্যেকটা পয়েন্ট। তারপর উঠল সিকিউরিটির প্রশ্ন। সবদিক থেকে সন্তুষ্ট হওয়ার পর আসল প্রশ্নে এল রানা।

'এইবার আসল কথায় এসো. চাঁদ। তোমার বোনের ছিরিটা একটু বর্ণনা করো। যদি মোটা আর কুৎসিত হয়, আমি এসবের মধ্যে নেই। খোঁয়াড়ের পাঁঠা পাওনি যে যার-তার সাথে লাগিয়ে দেবে।'

ড্রয়ার টেনে পোস্টকার্ড সাইজের গোটা কয়েক গ্লসি ফটোগ্রাফ বের করল সোহেল, ফুপাৎ করে ফেলল রানার সামনে? উলঙ্গ ছবি দেখে প্রথমে চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার, তারপর ঝুঁকে পড়ে লক্ষ করল হিন্দী স্বাক্ষরটা। দ্বিতীয় ছবিটাতে কেবল স্বাক্ষরটাকেই এনলার্জ করা হয়েছে। তৃতীয় ছবিতে বুক পর্যন্ত চাদর ঢেকে ঘুমিয়ে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। চতুর্থ ছবিতে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা।

'কেমন? পছন্দ হয়েছে?' ভুরু নাচাল সোহেল।

'চলবে.' বলল রানা।

টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে একটা বড়সড় খয়েরী এনভেলাপ হাতে হাজির হলো স্বয়ং হাতেম আলী। খামটা রানার হাতে দেয়ার ইঙ্গিত করল সোহেল। দিয়ে ছোট্ট একটু নড করে বেরিয়ে গেল হাতেম আলী কোন কথা না বলে।

'এর ভেতর পাবি ফল্স্ পাসপোর্ট—মিসেস মাসুদ রানার। আরও কিছু কাগজপত্র আছে যা তোর কাজে লাগতে পারে। ম্যারেজ সার্টিফিকেটও রয়েছে এরই মধ্যে। একটা টু-টোয়েন্টি মার্সিডিস রেডি আছে তোর জন্যে নিচে—ওতে করেই যাচ্ছিস তুই কক্সবাজার। আর রাহা-খরচ,' ড্রয়ার থেকে রাবার ব্যান্ড জড়ানো দুই বান্ডিল দশ টাকার নোট বের করে ঠেলে দিল রানার দিকে, 'এই যৎসামান্য দিচ্ছি, যা খুশি খরচ করতে পারিস, তবে প্রতিটা পাই পয়সার হিসেব নেব—কথাটা মনে রাখিস। এবং সবশেষে আমাদের গিমিক ডিপার্টমেন্টের সর্বশেষ অবদান—' ছোট্ট একটা কাঠের চৌকোনা বাক্স ঠেলে দিল সোহেল এবার, 'রেডিও পিল। একটা ফিট করে নে বুড়ো আঙুলের নখের তলায়। প্রথম সুযোগেই এটা ওকে দিয়ে গিলিয়ে নিবি।'

'ফায়দা?'

'এটা খাইয়ে দিলে তোর কাছ থেকে যদি তোর বউকে ছিনিয়েও নেয়া হয়, আমরা টের পাব কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। শরীরের তাপ পেলেই দেয়াশলাইয়ের বাতির মত এই পিলের ভেতর চালু হয়ে যাবে একটা ট্রানজিস্টার

ব্যাটারি। পিক পিক্ শুরু করবে ওটা। আশি মাইল দূর থেকেও বিশেষভাবে টিউন করা র‍্যাডারে আমরা ধরতে পারব এই ব্লিপ। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা পিক্ পিক্ করে চলবে ওটা একটানা।'

ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখে রেডিও পিলটা ফিট করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, নোটের বান্ডিল দুটো দু'পকেটে, আর কাগজপত্র ও পাসপোর্ট অ্যাটাচি কেসে তুলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। চলি। দেরি করলে ওদিকে ডেমরার ফেরি মিস করব আবার। আর কিছু বলবি, না রওনা হয়ে যাব?'

'পৌঁছে ফোন করিস। খুঁটিনাটি সব খবরের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকব।' হাসল। 'হাতটা কাটা না গেলে আমি নিজে ট্রাই নিতাম, দোস্ত। অমন একটা মেয়েকে তোর মত পাষণ্ডের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করছে র‍্যা।'

বেরিয়ে গেল রানা। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগোল সে কার্পেট মোড়া লম্বা করিডর ধরে লিফটের দিকে। কেন যেন ব্যাপারটা কিছুতেই মনে ধরছে না ওর। কিসের যেন একটা খটকা বেধেই থাকল মনের মধ্যে। সায় দিচ্ছে না মন।

পি.জি. হাসপাতালের স্টাফ এগজিট দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকজন কড়া ইস্তিরির ধবধবে পোশাক পরা নার্স। ঝিরঝিরে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ কেউ ছাতা খুলে ধরেছে মাথার উপর। একহাতে শাড়ির কুঁচি ধরে সাবধানে এগোচ্ছে ওরা নার্স কোয়ার্টারের দিকে। জায়গাটা আঁধার মত।

নার্সরা গাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল নিজাম মোহাম্মদ আলমগীরকে।

'বেকার বোইয়া রইছেন ক্যেলেগা? রাইত ভর এমতে বোইয়া থাকুম নিকি? জিগান না, কুন রুমে আছে জিগাইয়া দেখেন। এগো জিগাইলে কইবার পারব।'

'জিজ্ঞেস করলেই বলবে কেন? তাছাড়া এর ফলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে সবার। এইভাবে হবে না।'

'তাইলে কেমতে অইবো? হারি মর জ্বালা, কিমুন মাইনষের পাল্লায় পরলাম! ঐদ্দ্যাহেন, আর একটা আইবার লাগছে। পেপারের কথা কন না হালায়, কন যে রিপোর্ট লইবার আইছেন।' কনুই দিয়ে গুঁতো দিল নিজাম আলমগীরের পাঁজরে।

ইতস্তত করল আলমগীর। চাইল এদিক ওদিক। আশেপাশে কেউ নেই। সামনের দলটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে একজন নার্স। বুঝতে পারল, নিজামের কথাই ঠিক। অনর্থক গাড়ির [illegible]

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলে কোন লাভ নেই। সেই মেয়েলোকটা কোন্ কেবিনে আছে জানতে না পারলে এক পা-ও সামনে বাড়তে পারছে না ওরা।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল আলমগীর। সামনেই দালান উঠছে একটা। বোধ হয় হাসপাতালের এক্সটেনশন। জানালা বসানো হয়নি এখনও, চৌকোণ অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে ভিতর থেকে। আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে কিছু বাঁশ দড়ি সিমেন্টের ব্যাগ এলোমেলো ছড়ানো রয়েছে কাঁচা মেঝের উপর।

গাড়ির কাছাকাছি চলে এল নার্স। আধো-অন্ধকারে দেখল আলমগীর, অল্পবয়সী মেয়ে।

'কিছু যদি মনে না করেন,' আড়ষ্ট উচ্চারণে বিনয়ের সাথে শুরু করল আলমগীর, দৈনিক সুপ্রভাত থেকে এসেছি। স্মৃতিভ্রষ্ট মহিলাটি কত নম্বর কেবিনে আছেন বলতে পারেন?'

থমকে দাঁড়াল নার্স। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল আলমগীরের মুখের দিকে।

'কি বললেন?'

'দৈনিক সুপ্রভাত থেকে এসেছি। স্মৃতিভ্রষ্ট মেয়েটা, ওই যার গায়ে টাট্টু আঁকা আছে, কোন্ ফ্লোরের কত নম্বর রূমে আছে জানতে চাইছি। আমাদের পেশার...'

চট করে এক পা পিছিয়ে গেল নার্স।

'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? ভেতরের ব্যাপার আমি বাইরের কাউকে জানাতে পারি না। ইনফরমেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করুন, যদি ওরা মনে করে আপনাকে জানানো যায় জানাবে।'

নার্সের মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই টের পেল আলমগীর, বেরিয়ে পড়েছে নিজাম গাড়ি থেকে। উড়ন্ত চিলের ছায়ার মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে সে মেয়েটির পিছন দিক থেকে। কথা শেষ করে মেয়েটা রওনা হতে যাবে, এমনি সময়ে পৌঁছে গেল নিজাম। বিদ্যুৎ বেগে চালাল সে ডান হাতটা। ঘাড়ের পিছনে প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে চাপা একটা আর্তনাদ করেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটা সামনের দিকে। নিজের অজান্তেই চট করে ধরে ফেলল আলমগীর পড়ন্ত দেহটা, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চাইল চারপাশে। বেশ অনেকটা দূরে দেখতে পেল দু'জন লোক দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে এই দিকে।

'ওই দালানটার বিতরে লোইয়া চলেন,' বলল নিজাম। 'জলদি!'

আলমগীর বুঝতে পারল এটাই একমাত্র রাস্তা এখন। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল সে অসমাপ্ত বাড়িটার দিকে। ঢুকে পড়ল ভিতরে। মেঝেটা পাকা করা হয়নি এখনও, বার দুই হোঁচট খেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেয়েটাকে নিয়ে ওর বুকের উপর। পড়িমড়ি উঠে

দাঁড়িয়ে কটমট করে চাইল সে নিজামের দিকে।

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'একজন মহিলাকে এইভাবে…'

কোন কথা না বলে বাম হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে নিজাম সামনে থেকে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মেয়েটার পাশে। এক ঝটকায় নার্সের টুপি সরিয়ে দিয়ে দুই হাতে ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

অস্পষ্টভাবে ককিয়ে উঠল মেয়েটা, তারপর চোখ মেলল। চট করে নোংরা এক হাত দিয়ে চেপে ধরল নিজাম মেয়েটার মুখ।

'খাবাদার! মুখ দিয়া একটা আওয়াজ বাইর করবি তো খুন কইরা ফালামু,—মারানী!'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটার চোখ। নিজামের গায়ের দুর্গন্ধে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

চুল ধরে জোরে আর একবার ঝাঁকিয়ে মুখের উপর থেকে হাত সরাল নিজাম।

'কুন ঘরে আছে ওই মায়ালোকটা? জল্‌দি! কত লম্বর?'

ঢোক গিলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল নার্স। জঘন্য একটা গালি দিয়ে চড়াৎ করে এক চড় কষাল নিজাম ওর নাক-মুখের উপর।

'কুন্ ঘরে? কত লম্বর?'

নাক-চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে মেয়েটার। 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। আবার একটা চড় তুলতে দেখে চট করে বলল, 'পাঁচতলায়, চারশো বত্রিশ নম্বর কেবিন।' আতঙ্কে কাঁপছে মেয়েটার গলা।

'কত? চাইস্‌সো বং তিরিশ? পাচতালা?'

'হ্যাঁ।'

'আগে ক'স, নাই কেন্‌নো,—মারানী! এতক্ষণ কি উইছিল কইতে?' নিজামের ডান হাতটা দ্রুত একবার সামনে-পিছনে হলো, চকচকে কি যেন দেখা গেল আবছা মত। ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত রোগীর মত বাঁকা হয়ে উপর দিকে উঠে গেল নার্সের শরীর, তিন সেকেন্ড পর ধুপ করে পড়ল আবার। অস্ফুট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে নিজাম।

আবছা আঁধারে কি ঘটেছে ভালমত দেখতে পেল না আলমগীর। খুব দ্রুত কিছু একটা করেছে নিজাম, টের পেয়েছে সে, দীর্ঘনিঃশ্বাসটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। নিজামের হাতে চকচকে কি যেন ছিল— এখন আর চকচক করছে না সেটা। শিরশির করে আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্রোত উঠে এল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে, সড়সড় করে খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের পিছনের ছোট ছোট চুলগুলো।

'কি করলে!' নিজামের শার্টের হাতা খামচে ধরল আলমগীর। ভয়ে কাঁপছে সর্বশরীর। 'কি করেছ ওকে? অমন করে শ্বাস ছাড়ল কেন।'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে শার্টটা ছাড়িয়ে নিল নিজাম আলমগীরের হাত থেকে। নিচু হয়ে ঝুঁকে সাদা ইউনিফর্মের উপর এপিঠ ওপিঠ ঘষে মুছে নিল ছুরিটা। তারপর সোজা হয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'আয়া পরেন। লম্বর পাওয়া গেছে। কাম সাইরা বাইত্ যাইগা। আয়া পরেন।'

কাঁপা হাতে পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল আলমগীর। সামনে ঝুঁকে দেখল মেয়েটার চোখ ঠিকরে বেরোনো, বীভৎস, মরা মুখ। মাত্র এক সেকেন্ড। থাবা দিয়ে কেড়ে নিল নিজাম লাইটারটা।

'আয়া পরেন!' চাপা গর্জন করল নিজাম। 'কাইল ফজরে পাওয়া যাইব লাশ। ডরান কেলেগা? কুনো ডর নাই, আয়া পরেন।'

'তুমি···তুমি খুন করলে ওকে!' আর কি বলবে ভেবে পেল না সে। 'মেরে ফেললে!'

'হাম্বরি মুরা! মাথাটা খরাপ অইছে নিকি! জবর দিগদারি শুরু করল হালায়! দিমু নিকি এইটারেও পেস কইরা?' আপন মনে বিড় বিড় করল নিজাম। তারপর বলল, 'বিলাইয়ের কলিজা লইয়া এই কামে আহন ঠিক অহে নাই আপনের। পোলাপানের চুষনি মুখে দিয়া হালায় বাইত্ বোইয়া থাকলেই পারতেন।' আলমগীরের কণ্ঠস্বর নকল করে বলল, 'মেরে ফেললে! আবে, না মাইরা উপায় আছিল? কুন পেপারে কাম করেন আপনে?'

'সুপ্রভাত।' তোতা পাখির মত বলল আলমগীর।

'মায়ালোকটারে কুন পেপারের কথা কইছিলেন?' ছুরিটা আলমগীরের দিকে ধরল নিজাম। 'আয়া পরবেন, না থাকবেন এইখানে?'

আঁৎকে উঠে পা বাড়াল আলমগীর।

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, নার্সটাকে না মেরে উপায় ছিল না নিজামের। নইলে কাল হাতকড়া পড়ত সবার হাতেই। নিজাম নয়, এই মেয়েটার মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে নিজে।

চার

করিডরের শেষ মাথায় ঘুরে দাঁড়াল নায়েক টলিয়াস দেওয়ান। ঘড়ি দেখল: আটটা বিশ। দৃষ্টি গেল বাইরের দিকে। বেশ জোরেশোরে নেমেছে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ মেকাচ্ছে থেকে থেকে। বৃষ্টির শুরুতে বার কয়েক দপ দপ করেছিল

হাসপাতালের বাতিগুলো, এখন ঠিক হয়ে গেছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত ডিউটি ওর। আরও চা-আ-র ঘন্টা। একটা হাই দমন করে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে লম্বা করিডর ধরে। চায়নিজ স্টেন ধরা রয়েছে বগলের নিচে। খটখট্ বুটের আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই।

ইলিয়াস দেওয়ান মনে-প্রাণে সৈনিক। এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সৈনিকের ভবিষ্যৎ সীমাবদ্ধ নয়, জানে সে। আগামী বিশ বছরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে একে একে হাবিলদার, সুবাদার, ইত্যাদি ধাপ টপকে একদিন একজন জেনারেলের পদে উন্নীত করতে পারে সে নিজেকে—সম্ভাবনাটা হেসে উড়িয়ে দেয় না সে মোটেই। কে জানে, হতেও তো পারে, নজির নেই এমন তো নয়। সবে তেইশে পড়ল সে গতমাসে, জীবন তো পড়েই রয়েছে সামনে। ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর বক্সিং প্রতিযোগিতায় ব্যান্টাম ওয়েটে চাম্পিয়ান হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে সে। রাইফেল শুটিং-এ প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে অদ্বিতীয় হিসেবে।

ফুটফুটে এক নার্স কোমর দুলিয়ে চলে গেল সামনে দিয়ে, যাবার সময় ঘাড় বাঁকিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসল মৃদু। ইঞ্জেকশন দিতে চলেছে কোন রোগীকে। হেঁটে বেড়ানো ছাড়া কাজ নেই ইলিয়াস দেওয়ানের। নেই কাজ তো খই ভাজ—মনে মনে কাপড় খসাতে শুরু করল সে নার্সের। শাড়ি, ব্লাউজ খুলে যেই সে মেয়েটার ব্রেসিয়ারে হাত দিয়েছে, ওমনি খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। এলিভেটর থেকে নামল কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরা আস্ত এক কর্নেল।

র‍্যাংকের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের দুর্বলতা রয়েছে ইলিয়াস দেওয়ানের ক্যাপ্টেনের সামনে পড়লে আড়ষ্ট হয়ে যায় তার হাত-পা, মেজরের সামনে পড়লে ঘাম বেরিয়ে আসে কপালে, আর কর্নেলের সামনে পড়লে মুহূর্তে পরিণত হয় সে ঘোলাবুদ্ধির এক গর্দভে।

জীবনের স্বপ্ন ওর, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে কর্নেল হবে। নিখুঁত ইউনিফর্ম পরা জলজ্যান্ত এক কর্নেল এবং তার তিন সারি কমব্যাট রিবন দেখে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল ইলিয়াস দেওয়ানের, এত জোরে পা ঠুকে প্রেজেন্ট আর্মস্ করল যে কেঁপে উঠল গোটা করিডর।

ইউনিফর্মটা সামান্য একটু আঁটো হয়েছে গায়ে তাই অস্বস্তি বোধ করছে সিকান্দার বিল্লাহ। ডান হাতটা রিভলভারের বাঁটের খুব কাছাকাছি রেখে একচোখের ভুরু উঁচু করে চাইল সে ইলিয়াস দেওয়ানের চোখের দিকে। গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে একথা জানে সে, এই বিশেষ গার্ডের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করা যাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল ওর হাবভাব দেখে।

'কি করছ তুমি এখানে?' উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে কাছে এসে দাঁড়াল বিল্লাহ।

'ক-করিডরটা গা-গার্ড দিচ্ছি, স্যার।' চিকন ঘাম বেরিয়ে এসেছে ইলিয়াস দেওয়ানের কপালে। দাঁড়িয়ে রয়েছে এ্যাটেনশন হয়ে।

মাথা ঝাঁকাল বিল্লাহ। 'জেনারেল সফদরের কেবিনটা কোন দিকে?'

'তিনশো চল্লিশ নম্বর, স্যার।'

'জেনারেলকে গার্ড দিচ্ছ।'

'না, স্যার। তিনশো বত্রিশ নম্বরের মেয়েটাকে, স্যার।'

'ও, আচ্ছা।' কেবিন নম্বর বের করা এত সহজ হবে ভাবতেও পারেনি সিকান্দার বিল্লাহ। খুশি হয়ে বলল, 'পড়েছি ওর কথা। স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অ্যাট ইজ হয়ে দাঁড়াল ইলিয়াস। সিকান্দার বিল্লার উজ্জ্বল, নিষ্ঠুর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। চট করে সরিয়ে নিল চোখ। মনে মনে বলল: বাপ্স্! এই রকম চাহনি না হলে আবার কর্নেল? আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করতে হবে ছ'মাস!

'মেয়েটাকে দেখেছ নাকি তুমি?' ট্রাউযারের দুই পকেটে দুইহাতের বুড়ো আঙুল বাধিয়ে জিজ্ঞেস করল সিকান্দার বিল্লাহ। ঠোঁটে সামান্য হাসির আভাস।

'না, স্যার।'

'পেপারে দেখলাম, পাছায় নাকি টাট্টুমার্ক আছে? সত্যি নাকি?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, স্যার।'

'জেনারেলের শরীর কেমন?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, স্যার।'

'বেশ আছ, বাবা! মাঝে মাঝে হিংসে হয় তোমাদের দেখলে, বুঝলে? সাতে নেই, পাঁচে নেই, কারও কোন খবর রাখবার দরকার নেই, খাচ্ছ, দাচ্ছ, ড্রিল-প্যারেড করছ, ডিউটি করছ···ব্যস! এদিকে জেনারেলদের মেজাজ-মর্জি সামলানো থেকে নিয়ে এন্টায়ার ফোর্সের যত রকমের যত দায়-দায়িত্ব সব চাপানো হয়েছে এই কর্নেলদের ঘাড়ে। যাই হোক, কত নম্বর যেন বলছিলে জেনারেলের কেবিন?'

'তিনশো চল্লিশ নম্বর, স্যার।'

'ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ করো,' বলে হাঁটতে শুরু করল সিকান্দার বিল্লাহ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে নায়েক। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল বিল্লাহ। 'হায়, হায়!' বলে ঘুরেই হাঁক ছাড়ল, 'এই যে···এদিকে শোনো।'

খটাস করে বুট ঠুকে আবার অ্যাটেনশন হয়ে গেল ইলিয়াস দেওয়ান।

'ইয়েস, স্যার?'

'একদৌড়ে জীপ থেকে আমার ব্রিফকেসটা নিয়ে এসো তো? ফেলে এসেছি ভুল করে।'

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল নায়েক। পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল।

'মাফ করবেন, স্যার। ডিউটিতে আছি আমি।' কথাটা এমনই কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল সে যে হাসি চাপতে বেশ কষ্টই হলো সিকান্দার ঝিন্নার।

'কোন চিন্তা নেই,' বলল সে। 'স্বয়ং আমি উপস্থিত রয়েছি এখানে। নিয়ে এসো ব্রিফকেসটা।'

'ইয়েস, স্যার।'

এগিয়ে গিয়ে এলিভেটরের কল্ বাটন টিপল নায়েক, দরজা খুলে যেতেই ওর ভিতর ঢুকে নেমে এল নিচের লবিতে। গাড়ি বারান্দার কাছে এসেই কয়েক গজ দূরে দেখতে পেল সে একটা মিলিটারি জীপ। দৌড়ে চলে গেল সে জীপের কাছে। দু'জন সেপাই গল্প করছিল, চাইল ঘাড় ফিরিয়ে।

'কর্নেলের ব্রিফকেসটা!' হাঁক ছাড়ল ইলিয়াস দেওয়ান। 'জলদি!'

'এই যে দিই,' জবাব দিল একজন। জীপের ভিতর থেকে কিছু একটা বের করবার ভঙ্গি করল সে। হাত বাড়াতে যাচ্ছিল নায়েক, ঘাড়ের পিছনে দড়াম করে লাগল কি যেন এসে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজল ইলিয়াস দেওয়ান। টের পেল, হাত থেকে স্টেনগানটা ছিনিয়ে নিল কেউ। পরমুহূর্তে আর একটা আঘাত পড়ল ওর চোয়ালের উপর। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে শুনতে পেল উর্দুতে কেউ বলছে, 'হয়েছে, হয়েছে, আর লাগবে না। গাড়িতে ওঠাও এটাকে।'

তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছে। সেপাই দু'জন ধরাধরি করে ইলিয়াসের মূর্ছিত দেহটা তুলে ফেলল জীপের পিছনে, একটা তিরপল দিয়ে ঢেকে একজন উঠল পিছনে, একজন গাড়ির ড্রাইভিং সীটে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল জীপটা হাসপাতালের খোলা গেট দিয়ে।

একহাতে ইলিয়াসের স্টেন আর অপর হাতে সিকান্দার ঝিন্নার ব্রিফকেস নিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল চিশতি হারুন হাসপাতালের ভিতর। অনুসন্ধান কাউন্টারে বসা ঘুম ঘুম চেহারার লোকটার দিকে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল লিফটে। সোজা চারতলায় এসে থামল লিফট।

করিডরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল সিকান্দার ঝিন্নাহ, চিশতি হারুনকে দেখে এগিয়ে এল দ্রুতপায়ে।

'কোন গোলমাল হয়নি তো?'

'কিচ্ছু না, ওস্তাদ!' একগাল হাসল চিশতি হারুন। 'একেবারে ক্লিন।'

ব্রিফকেসটা বিপ্লার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পায়চারি শুরু করে দিল সে করিডরে স্টেন হাতে।

লম্বা পা ফেলে কাছেই একটা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সিকান্দার বিপ্লাহ। ব্রিফকেস থেকে সাদা একটা ডাক্তারী আলখেল্লা বের করে পরে নিল ইউনিফর্মের উপর। একটা স্টেথোস্কোপ বের করে ঝুলিয়ে নিল গলায়। ছোট্ট একটা চ্যাপ্টা সিরিঞ্জের বাক্স হাতে নিয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলতেই মিলিটারি কর্নেল পরিণত হলো ব্যস্ত-সমস্ত এক ডাক্তারে। ব্রিফকেসটা বাথরুমের এক কোণে ফেলে দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ডাক্তার সাহেব।

চোখমুখ পাকিয়ে প্রশংসাসূচক ভঙ্গি করল চিশতি হারুন।

'একটা হুইল স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে ফেলো জলদি!' বলল বিপ্লাহ। 'এই ফ্লোরেই কোথাও পেয়ে যাবে।'

ছুটল চিশতি। তিনশো বত্রিশ নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল বিপ্লাহ। মৃদু চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। ভিতরে কম পাওয়ারের ম্লান আলো জ্বলছে। অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে শুয়ে আছে লম্বা, সরু বেডের উপর, পায়ের শব্দে মেলল আয়ত চোখ।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' খুশি খুশি ডাক্তারী গলায় জিজ্ঞেস করল সিকান্দার বিপ্লাহ। সিরিঞ্জ বের করল একটা, প্র্যাকটিস করা হাতে ছোট্ট করাৎ দিয়ে কাঁচের শিশির গলা কাটতে কাটতে বলল, 'আজকের মত শেষ ইঞ্জেকশন। প্রচুর ঘুম দরকার আপনার।' টোকা দিয়ে অ্যাম্পুলের মাথাটা খসিয়ে দিয়ে সূচ ডুবিয়ে বেশ কিছুটা তরল পদার্থ সিরিঞ্জে তুলল সে, ওটা ছাতের দিকে তাক করে পিচিক্ করে খানিকটা ওষুধ বের করল সূচের মুখ দিয়ে, তারপর একটুকরো তুলো দিয়ে সূচটা মুছে নিয়ে মেয়েটার কনুইয়ের পিছনটা টিপে ধরল বাম হাতে।

সূচ ঢোকাবার আগেই চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল মেয়েটা। চেশায়ার বিড়ালের হাসি মুখে টেনে এনে ঘ্যাচ করে সূচ ঢুকিয়ে দিল সিকান্দার বিপ্লাহ।

একফুট দুইফুট করে উঠে যাচ্ছে নিজাম ড্রেন পাইপ বেয়ে। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে পাইপ, জায়গায় জায়গায় নিকেজ পেয়ে শ্যাওলা জন্মেছে, ধরা যাচ্ছে না, ধরতে গেলেই সড়াৎ করে নেমে আসছে হাত। জুতোর রাবার-সোল, দুই হাঁটু আর দুই হাত ব্যবহার করতে হচ্ছে ওর। কষ্টেসৃষ্টে তেতলার কার্নিস ডিঙিয়ে চারতলার গা বেয়ে উঠছে সে এখন। প্রতিবার কার্নিসের কাছে এসেই বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে উপরে ওঠা। পা দিয়ে পাইপটা

টেনে তুলতে হচ্ছে শরীরটা উপরে, বাম হাঁটু তুলতে হচ্ছে কার্নিসের উপর, একহাত আর এক হাঁটুর উপর ভারসাম্য বজায় রেখে চট করে উপরের পাইপটা ধরতে হচ্ছে আবার, তারপর টেনে তুলতে হচ্ছে গোটা শরীরটা কার্নিসের উপর। নিচে বৃষ্টিভেজা পাকা চত্বরের উপর আবছা দেখা যাচ্ছে আলমগীরকে। অস্থির পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সে গাড়ির পাশে। মাঝে মাঝে চাইছে উপর দিকে।

খানিক জিরিয়ে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল নিজাম। একটা গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার শব্দে চট করে চাইল নিচের দিকে। একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল বেশ কিছুটা দূরে। কেউ নামল না, কেউ উঠল না। মেইন এন্ট্রান্সের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল ওটা চুপচাপ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলল নিজাম, মন দিল নিজের কাজে। চারতলার কার্নিসের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ শ্যাওলায় পিছলে হাত ফসকে গেল ওর। সড়সড় করে নেমে এল সে ফুট তিনেক। পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে আবার ধরে ফেলল পাইপ।

আঁৎকে উঠেছিল আলমগীর, চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল নিজামের পিছলে নেমে আসা দেখে, ওকে সামলে নিতে দেখে ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল। চেয়ে চেয়ে দেখল চারতলার কার্নিস পেরিয়ে পাঁচতলায় উঠে যাচ্ছে অকুতোভয় লোকটা।

ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে আলমগীর। বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করছে হৃৎপিণ্ডটা। আরেকদল নার্স বেরিয়ে এল স্টাফ এগজিট দিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে চলে গেল নার্স কোয়ার্টারের দিকে। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে উঠে পড়ল সে গাড়ির ড্রাইভিং সীটে। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল একটা। পাঁচতলায় উঠে পাইপ ছেড়ে কার্নিসের উপর দিয়ে হেঁটে এ জানালা ও জানালায় উঁকি দিয়ে হাস্না কাওসারকে খুঁজছে এখন নিজাম।

নিজাম জানে না মিথ্যেকথা বলেছিল নিহত নার্সটা। গোটা পাঁচতলায় জনা কয়েক বুড়ি ছাড়া আর কোন মহিলা পেশেন্ট নেই। চারশো বত্রিশ নম্বরের কোন কেবিনই নেই পাঁচতলার কোথাও। পাঁচ-সাতটা কেবিন বাকি আছে দেখার, এই ক'টা খুঁজেই চারতলায় নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। বিড় বিড় করে নিহত নার্সকে অনর্গল গাল দিয়ে চলেছে সে বাপ-মা তুলে জঘন্য ভাষায়। একটু একটু করে সাবধানে এগোচ্ছে কার্নিস বেয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে হাসপাতালের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল কালো একটা মার্সিডিস গাড়ি, থেমে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দার কয়েকগজ দূরেই পার্কিং স্পেসে। ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল মাসুদ রানা। অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স থেকে কিছুটা দূরে এদিকে মুখ করে দাঁড়ানো একটা

অ্যাম্বুলেন্স চোখে পড়ল ওর। কিন্তু ওটার বিশেষ কোন তাৎপর্য ধরা পড়ল না ওর চোখে। হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স থাকবে না তো থাকবে কোথায়?

দৌড়ে উঠে গেল সে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। সোজা গিয়ে দাঁড়াল 'অনুসন্ধান' লেখা কাউন্টারের সামনে।

এত রাতে ভিজিটার দেখে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে কাউন্টারের ওপাশে বসা টাক-মাথা লোকটা। কি কি বলবে গুছিয়ে নিল সে মনে মনে।

'ডক্টর আশেক রিজভি আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডক্টর রিজভি নেই এখন। বাড়ি চলে গেছেন।'

'আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। তিনশো বত্রিশ নম্বর কেবিন।'

সোজা হয়ে বসল লোকটা। কে না শুনেছে এই মেয়েলোকটার কথা! পরিচয়ের হদিস পাওয়া গেছে তাহলে! এই লোকটার ওয়াইফ। তবু আর একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'ওই যিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর কথা বলছেন?'

'রাইট। নিয়ে যেতে এসেছি। চার্জে কে আছে ওর?'

কিছু কাগজপত্র ঘাঁটল লোকটা, তারপর বলল, 'একটা নোট লেখা আছে দেখছি। আপনি কি মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ঠিক বলেছেন। কি আছে নোটে?'

'আপনি পৌঁছবামাত্র নার্স রাবেয়া মজুমদারকে ডেকে পাঠাবার নির্দেশ রয়েছে।' কথা বলতে বলতেই একটা রিসিভার তুলে কানে লাগাল সে। কয়েকটা কথা বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। হাসল রানার দিকে চেয়ে। 'এক্ষুণি আসছেন রাবেয়া মজুমদার।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। তাড়াহুড়ো থাকায় রাতের খাওয়াটা ফসকে গেছে। এখন একমাত্র ভরসা কুমিল্লা। তিনটের ফেরি যদি ঠিকমত পেয়ে যায় তাহলে আশা করা যায় এগারোটার মধ্যে পৌঁছনো যাবে কুমিল্লায়। যদি কপালগুণে এক-আধটা হোটেল খোলা থাকে তাহলে খাওয়া জুটবে, নইলে খালিপেটেই অতিক্রম করতে হবে ওকে একটানা আড়াইশো মাইল।

এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, ফুটফুটে সুন্দর চেহারা নার্সের ড্রেসে ফুটেছে চমৎকার। কাছে এসে সহজ ভঙ্গিতে হাসল। পরিষ্কার, আড়ষ্টতামুক্ত গলায় বলল, 'আপনিই মিস্টার মাসুদ রানা? স্ত্রীকে নিতে এসেছেন?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

'ডক্টর রিজভি বলে গেছেন যে আপনি আসছেন ওকে নিতে। গাড়ি এনেছেন?'

'এনেছি। খুবই কি অসুস্থ? চলতে ফিরতে পারে না?'

'না, না···তা পারে। ডক্টর রিজভি বলেছেন চলাফেরায় কোন অসুবিধে হবে না ওর।'

'বাঁচলাম। তাহলে ওকে নিয়ে আসা যাক, কি বলেন?'

এলিভেটরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বারকয়েক কৌতূহলী চোখে চাইল রাবেয়া মজুমদার রানার মুখের দিকে। রানার হাসি হাসি মুখ দেখে সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'আমরা কিন্তু সবাই দারুণ কৌতূহলের মধ্যে রয়েছি, মিস্টার মাসুদ রানা। হাসপাতাল জুড়ে সমস্ত নার্সদের মধ্যে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। আচ্ছা, বলুন তো, আপনার স্ত্রীর শরীরে এই ট্যাটু কিসের? আপনি করিয়েছেন?'

'কে? আমি? আমি তো করাইনি!' অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে গেল রানার চোখ-মুখ। 'ওটা ওদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন। গিয়ে দেখুন, ওর মায়েরও আছে।'

চোখ বড় হয়ে গেল মেয়েটির।

'কি আশ্চর্য! সত্যিই? বাহ্!'

'আপনি যা বললে কি হবে? ওটা ওদের কাছে রীতিমত গর্বের ব্যাপার।' এলিভেটরে উঠতে উঠতে রানা বলল, 'এর মধ্যে যে লজ্জার কিছু থাকতে পারে, এটা ওরা একেবারে বোঝেই না। আমার তো খুবই মুশকিল হয় ওকে নিয়ে। ওটা দেখাবার জন্যে পাগল হয়ে থাকে ও সর্বক্ষণ···যাকে তাকে, যখন তখন। মাঝে মাঝে তো পার্টি-টার্টিতে খুবই লজ্জাকর পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায়।'

অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল রাবেয়া মজুমদার, তারপর হেসে উঠল উঁচু গলায়। 'বুঝেছি···ঠাট্টা করছেন!'

হাসল রানাও। 'ঠিক ধরেছেন।'

'ওকে খুঁজে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন?'

'খু-উ-ব!'

'অতীত ভুলে যাওয়া···বাব্বা! ভয়ানক ব্যাপার!'

'সবার জন্যে নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি তো ভুলতে পারলে বেঁচে যেতাম। বিবেকের বিরুদ্ধে এত কাজ করেছি জীবনে, এত দংশন রয়েছে যে খুশি হতাম সব ভুলে যেতে পারলে।'

চারতলায় উঠে এল এলিভেটর। করিডর ধরে আগে আগে চলল নার্স, পিছনে রানা। তিনশো বত্রিশ নম্বর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। মেয়েটা ঢুকল প্রথমে, পিছনে রানা। স্বামী হিসেবে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোককে হাজির হতে দেখে কেমন লাগবে হাস্না কাওসারের, ভাবতে গিয়ে ভিতর ভিতর বেশ উত্তেজিত বোধ করছে সে। খোদা ভরসা বলে পা বাড়াল

সামনে। তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। থমকে দাঁড়িয়েছে রাবেয়া মজুমদারও। ডাক্তারী এ্যাপ্রন পরা অস্বাভাবিক লম্বা এক স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলানো লোক ঝুঁকে ছিল বিছানার উপর, সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'ওহ্-হো, আই অ্যাম সরি,' বলল রানা।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ। অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া নার্স এবং রানার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাল সে। মাসুদ রানাকে চিনতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না ওর। চিনতে পারার সাথে সাথেই লাফ দিয়ে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ওর কলজেটা। বেরিয়ে যেতে না পেরে ফুটবল থাপানোর মত লাফাতে থাকল ওটা বুকের মধ্যে ধব্ ধব্ ধব্ ধব্। কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট বিল্লাহ, নিজেকে সামলে নিতে বেশি সময় লাগল না ওর। চট করে চাইল নার্সের চোখের দিকে।

'কি ব্যাপার, সিস্টার? এই ভদ্রলোক কে?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে রাবেয়া মজুমদার। অল্পদিন হলো এই হাসপাতালে যোগ দিয়েছে সে কাজে। কিন্তু তাই বলে ডাক্তারকে চিনতে না পারার মত কম দিন নয়। ওর ধারণা ছিল নাম না জানলেও সব ডাক্তারেরই মুখ চেনে সে। অথচ এই লোকটাকে কোনদিন দেখেনি সে আগে। আমতা আমতা করে বলল, 'ইনি, মানে ডক্টর রিজভি বলে গেছেন...'

'ইনি আমার স্ত্রী,' বলল রানা বেডের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে। 'ডক্টর রিজভি আমাকে জানিয়েছিলেন ইচ্ছে করলেই বাড়ি নিয়ে যেতে পারি এখন। তাই নিতে এসেছি।'

ঘরের ম্লান আলোটা ওর পিছন দিকে থাকায় খোদার কাছে হাজার শোকর গোজার করল সিকান্দার বিল্লাহ। এখনও যখন চিনতে পারেনি রানা ওকে, আশা করা যায় চিশতি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাবে এদের। সিরিঞ্জটা চ্যাপ্টা বাক্সে ভরতে ভরতে বলল, 'আজ আর হচ্ছে না। এইমাত্র একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছি, সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙবে না এর। কাল এসে নিয়ে যাবেন।'

ডাঙায় যেমন বাঘ, জলে কুমীর, হাসপাতালে তেমনি একটা মর্যাদা উপভোগ করে ডাক্তার। সময়ে বাঘা বাঘা লোককে সহ্য করতে হয় তাদের দাপট। সাদা কোট, স্টেথোস্কোপ আর সবজান্তা ভাবভঙ্গি এমনই প্রভাব বিস্তার করে মানুষের উপর যে ডাক্তারের কথার উপর কথা বলবার সাধ্য খুব বেশি লোকের নেই। রানাও ব্যতিক্রম নয়। তবু খানিক ইতস্তত করে বলল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমাকে বলা হয়েছিল আজ রাতেই বাড়ি নিয়ে যেতে পারি আমি ওকে।'

'পারেন না,' কড়া গলায় প্রায় ধমকের সুরে বলল বিল্লাহ। 'আম রি

নাছি শুনতে পাননি? ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। আজ আর নাড়াচাড়া করা র না। কাল এসে নিয়ে যাবেন।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ফিরে যাওয়ার জন্যে তে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করল ডাক্তারের লম্বা কোটের নিচে খাকি প্যান্ট দেখা চ্ছে। চকচকে জুতোটাও নজর এড়াল না ওর—জুতোতেও মিলিটারি ছাঁট। নটা চালু হয়ে গেল ওর পূর্ণ বেগে। আর একবার লোকটাকে দেখে নেয়ার ন্য বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, ডক্টর। কাল সকালেই আসা যাবে বার। সরি ফর দা ইন্টারাপশন।'

'দ্যাটস্ অল রাইট,' মাতব্বরী চালে মাথা ঝাঁকাল সিকান্দার বিল্লাহ।

এইবার চিনে ফেলল রানা ওকে। সিকান্দার বিল্লাহ! ওরে শালা! আগেই ছে গেছে দেখছি! দাঁড়াও, জারিজুরি বের করছি তোমাদের!

বাইরে বেরোবার দরজাটা খুলেই থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে আবার। র্স পোশাক পরা চিশতি হারুন একটা স্ট্রেচার ঠেলে নিয়ে আসছিল। চারের উপর শোয়ানো ছিল ওর স্টেনগান। রানাকে দেখামাত্র বিদ্যুৎ গে স্টেনগানটা হাতে তুলে নিয়ে তাক করল রানার বুক বরাবর।

'খবরদার! একচুল নড়বে না।'

প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস টানল নার্স। এক লাফে এগিয়ে এসে পিছন থেকে চেপে ধরল বিল্লাহ নার্সের।

'টুঁ শব্দ করলেই মটকে দেব ঘাড়টা!' চাপা গলায় ওর কানের কাছে বলল।

সাবধানে পা ফেলে পিছিয়ে এল রানা কেবিনের ভিতর। দুই হাত তুলে খেছে মাথার উপর। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে চিশতি হারুনের খে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল চিশতি।

কয়েক সেকেন্ডের নাটকীয় বিরতি। নার্সের মুখের উপর থেকে হাত য়ে নিল সিকান্দার বিল্লাহ।

'মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের করলে পস্তাতে হবে। একেবারে চুপ!' ক্তারী এ্যাপ্রন খুলেই কোমরে ঝুলানো রিভলভারটা বের করল সে। 'এই য়লোকটাকে স্ট্রেচারে তোলো! তোমরা দু'জন!' রিভলভার দিয়ে রানা ও বয়াকে দেখাল বিল্লাহ। 'জলদি!'

স্ট্রেচারটা কেবিনের ভিতর টেনে নিয়ে এল রানা, লম্বালম্বি ভাবে রাখল ডের পাশে। ইতিমধ্যেই বুড়ো আঙুলের নখের নিচ থেকে রেডিও পিলটা র এসেছে ওর দু'আঙুলের মাথায়।

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে বিছানার ওপাশে গিয়ে ঘুমন্ত হাসান কাশেসারের পর্যন্ত টানা চাদরটা নামিয়ে দিল নার্স পায়ের কাছে। হাঁটুর উপর উঠে

গিয়েছিল শাড়ি, ঠিক করে দিল সেটা। এপাশ থেকে মেয়েটার ঘাড়ের নিচে ভরে দিল রানা ডানহাত, আরেক হাত চালিয়ে দিল মাজার নিচে। রাবেয়া মজুমদারকে বলল, 'আপনি পা-টা ধরুন।'

তুলতে গিয়ে সামান্য একটু হোঁচট খেলো রানা, এবং সেই সুযোগে হাত বাঁকিয়ে রেডিও পিলটা ঢুকিয়ে দিল হাস্না কাওসারের মুখের ভিতর। কিছু না বুঝেই ধমকে উঠল সিকান্দার খিল্লাহ। 'আাই, সাবধান! কোন চালাকি না!'

দু'জনে মিলে স্ট্রেচারে তুলে ফেলল ওরা হাস্না কাওসারের ঘুমন্ত দেহটা। রাবেয়ার সাথে চোখাচোখি হলো রানার একবার। ডান চোখ টিপে ওকে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তেমন কোন কাজ হলো বলে মনে হলো না ওর। রাবেয়ার ফ্যাকাসে মুখে কোন রকম রঙের চিহ্ন দেখা দিল না।

রানা যখন অস্ত্রের মুখে হাস্না কাওসারকে স্ট্রেচারে তুলছে, ঠিক সেই সময়ে পরিষ্কার হয়ে গেল নিজামের কাছে যে মিছে কথা বলেছিল নিহত নার্সটা। বারান্দার রেলিং টপকে এপাশে এসে প্রত্যেকটা ঘর আবার একবার খুঁজে দেখেছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে গোটা কয়েক অশ্লীল গালি দিয়ে পিস্তল হাতে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল নিজাম।

পাঁচ

রানা বেরিয়ে যাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদের ঘরে এসে ঢুকল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কনিষ্ঠতম এজেন্ট—গোলাম পাশা, বয়স: বাইশ, উচ্চতা: পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, গায়ের রঙ: বাদামী।

'বসো,' মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সোহেল আহমেদ। সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাল পাশার পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

দরজার কপাটের মত বিশাল চিতানো বুক পাশার, পেটা শরীর, মুখটা হাসি হাসি, চোখে কৌতুকের দৃষ্টি। মনে হয় সবকিছুতেই কি যেন একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাচ্ছে সে সর্বক্ষণ। বছরখানেক আগে ওকে ধরে এনে মেজর জেনারেল রাহাত খানের হাতে তুলে দিয়েছিল রানা মানুষ করে দেয়ার জন্যে। এরই মধ্যে পরপর কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টে আশ্চর্য ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে সে সবার।

সংক্ষেপে হাস্না কাওসার সংক্রান্ত সবকিছু জানাল ওকে সোহেল, রানা

ভূমিকার কথা বলল. তারপর দিল কাজের ভার।

'রাডার স্ক্যানার ফিট করা একটা গাড়িতে করে রানার পিছনে লেগে থাকবে তুমি। আক্রমণ আসবে বলে মনে হয় না আমার. বাংলাদেশের বুকে এতবড় সাহস কারও হবে বলে মনে হয় না. তবু বলা যায় না—তাই তুমি থাকছ স্ট্যান্ড বাই। একা কাজ করতে হচ্ছে রানাকে। যদি কোথাও কোন ঝামেলা হয়, আমি চাই, চট করে যেন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে আমাদের কেউ। ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাকে অ্যালার্ট থাকতে বলা হয়েছে. লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে সে-ও. যদি প্রয়োজন মনে করো চাইলেই সাহায্য পাবে ওদের।'

সব শুনে হাসি মুখে উঠে পড়ছিল পাশা. তর্জনীর ইঙ্গিতে বসতে বলল ওকে সোহেল। 'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। দশ মিনিট পরে রওনা হলেও চলবে তোমার। হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছোয়নি এখনও রানা। ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাকে ডাকছি, লেটেস্ট খবর শুনে যাও।'

লম্বা পা ফেলে কামরায় ঢুকল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ. চীফের ইঙ্গিত পেয়ে বসল একটা চেয়ারে।

'কি খবর, আতিক? কিছু জানা গেল?'

'দিল্লী থেকে এইমাত্র খবর এসেছে, রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছে হাস্না কাওসার ক'দিন আগে। কলকাতা জানাচ্ছে, ওই নামের একজন যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনারের সাথে. কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়নি। খুব সম্ভব কলকাতা থেকে বাসে চেপেছিল মেয়েটা, বর্ডার ক্রস করেছে টাকির কাছাকাছি কোন এক জায়গা দিয়ে। কারণ, আমাদের খুলনা এজেন্ট জানাচ্ছে শিরিন কাওসার নামে এক তরুণী দু'দিনের জন্যে উঠেছিল খুলনার শাহীন হোটেলে। বিমানের টিকেট কেটে যশোর হয়ে চলে এসেছে ঢাকায়। সাথে সুটকেস ছিল একটা। কিন্তু ঢাকায় এসে কোথায় উঠেছিল কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কোন হোটেলেই হাস্না বা শিরিন, কোন কাওসারের নামেই কোন এন্ট্রি নেই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সোহেল বলল, 'কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে উঠে থাকতে পারে। কিন্তু সেটাও আমার কাছে খুবই আনলাইকলি বলে মনে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে জলজ্যান্ত একটা মানুষ হারিয়ে গেল, কোন খোঁজ খবর নেই কেন আত্মীয়-বন্ধুর তরফ থেকে? মানুষ হারিয়ে গেলে সাধারণত যেসব জায়গায় খোঁজ করা হয়—যেমন, হাসপাতাল. পুলিস স্টেশন—এর যেকোন একটায় খোঁজ নিলেই মেয়েটার খবর পেতে পারত তারা। অজ্ঞ...মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না তোমার কাছে?'

ঠোঁট কামড়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। তারপর জিজ্ঞেস করল,

'মেয়েটাকে হাসপাতাল থেকে সরাবার সব ব্যবস্থা কমপ্লিট?'

'কমপ্লিট,' পাশার দিকে চাইল সোহেল। 'এদিকে তেমন কিছু অগ্রগতি হয়নি বোঝা যাচ্ছে। তুমি রওনা হয়ে যাও। ওরা হাসপাতাল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেলে আমাকে একটা খবর দিয়ে পিছু নেবে তুমি। তোমার খবর না পাওয়া পর্যন্ত অফিসেই থাকছি আমি।'

পাশা এবং আতিকুল্লাহ দু'জনেই বেরিয়ে গেল।

সোহেল জানে না পনেরো মিনিট পর টেলিফোন পেয়ে আঁৎকে উঠতে হবে ওকে।

চারতলায় নেমে আসতে গিয়ে মাঝপথেই মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ পেল নিজাম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আস্তে করে মাথা বাড়াল সামনে। চায়নিজ স্টেন হাতে একজন মিলিটারি গার্ড দেখতে পেল সে। দাঁড়িয়ে আছে পিছন ফিরে। গার্ড দেখে প্রথমটায় চমকে উঠল নিজাম, তারপর ওর তরমুজের বীচির মত নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ব্যাপার বুঝতে পেরে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর—বোঝা গেছে কোন্ তলায় রয়েছে মেয়েলোকটা। কিন্তু তাই বলে চায়নিজ স্টেনের বিরুদ্ধে পয়েন্ট টু-কাইভ বেরেটা নিয়ে গোলমালে জড়াতে রাজি নয় সে কিছুতেই। আবার পাঁচতলায় উঠে পাইপ বেয়ে নেমে আসবে সে চারতলায়, কার্নিস বেয়ে একটার পর একটা কেবিন খুঁজে বের করবে মেয়েলোকটাকে, চুপচাপ কাজ সেরে নেমে যাবে পাইপ বেয়ে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল সে একটা কঠোর কণ্ঠের আদেশ শুনে।

'ঠেলে নিয়ে লিফটে তোলো!'

সাবধানে উঁকি দিল নিজাম আবার। মুহূর্তে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। হুইল স্ট্রেচারের উপর শুইয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা মেয়েকে। এক ঝলকের জন্যে দেখা গেল মুখটা। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর কাছে ছবি দেখেছে সে—সেই মুখের আদল যেন মিলছে কিছুটা। তাছাড়া এই মেয়েটার চুলও বব্-ছাঁটা। তবে কি সরিয়ে নেয়া হচ্ছে একে অন্য কোথাও? স্ট্রেচারের শেষ মাথায় দামী স্যুট পরা লম্বা এক লোক, ঠেলছে ওটা এলিভেটরের দিকে। ঠিক তার পিছনেই রিভলভার হাতে একজন মিলিটারি কর্নেল। কর্নেলের পরপরই দেখা গেল এক ভীত-চকিত নার্সের মুখ।

ল্যান্ডিং-এর উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করল নিজাম এখন কি করা উচিত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, স্ট্রেচারটা ঠেলে তোলা হলো ভিতরে, বাকি সবাই উঠে পড়তেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

নিচে নামতে নামতে আড়চোখে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল

একবার সিকান্দার বিল্লাহ।

'দেখো, মাসুদ রানা, কোন রকম গোলমাল করলে কি ঘটবে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? আবার জেনোসাইড হবে। আমাদের যদি বাধ্য করো, লবিতে ম্যাসাকার করে রেখে কেটে পড়ব আমরা। কথাটা স্মরণ রাখলে তোমার, আমার, সবার জন্যেই মঙ্গল হবে।'

'দেখো, সিকান্দার বিল্লাহ,' একই সুরে উত্তর দিল রানা, 'আমার নাম যখন জানো, আমার পেশা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? এখন আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ...'

'কারেক্ট!' কথার মাঝখানেই মন্তব্য করল চিশতি হারুন। 'রানা এজেন্সি খুলেছে শালা।'

'কাজেই এই শালার কাছ থেকে কোন রকম গোলমালের আশঙ্কা নেই,' আবার নিজের কথার খেই ধরল রানা। 'ভাড়া করা হয়েছে আমাকে। অনেক দেরিতে। তোমাদের ক্ষমতা জানা আছে আমার। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মত একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাথে কেন বেহুদা গোলমাল করতে যাব? ডেঞ্জার ইজ নো লঙ্গার মাই বিজনেস। তোমরা দখল করেছ ওকে, ভোগ করো—আমার কি?'

কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিল্লাহ রানার মুখের দিকে। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'সেই মাসুদ রানা চাকরি ছেড়েই এই রকম মুরগী হয়ে যাবে কল্পনা করা যায় না।'

'কেন যায় না? টাকার বিনিময়ে জিনিস দেয়া যায়, সার্ভিস দেয়া যায়; কিন্তু প্রাণ দেয়ার কোন যুক্তি আছে? যাই হোক, সাহসিকতা দেখাবার জন্যে আমাকে ভাড়া করা হয়নি, প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেয়ার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। কোন ঝুঁকি নেব না আমি। কাজেই মারপিট না করে ওকে নিচ্ছ, নিয়ে যাও; আমাকে ছেড়ে দাও। ওর কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা দেখার কোন দরকার নেই আমার। অত টাকা পাইনি আমি সোহেল আহমেদের কাছে।'

নার্স রাবেয়া মজুমদারকে দ্রুত শ্বাস টেনে বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইতে দেখে বেহায়ার মত হাসল রানা। 'তোমারও কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না, সুন্দরী। এই মেয়েলোকটাকে রক্ষা করার ভার কেউ সঁপে দেয়নি তোমার হাতে। এরা বেপরোয়া লোক। গোলমাল পাকাতে গিয়ে এদের হাতে জখম হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

ঝট করে মুখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল রাবেয়া মজুমদার। এলিভেটর থেমে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল, সবাই বেরিয়ে এল লবিতে।

বার কয়েক চোখ মিটমিট করে সোজা হয়ে বসল অনুসন্ধান কাউন্টারের

টেকো লোকটা। অবাক হয়ে গেছে সৈন্য-সামন্ত দেখে। স্ট্রেচারের পাশেই রাবেয়া মজুমদারের কাছাকাছি রয়েছে চিশতি হারুন। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে রানার কানের কাছে বলল বিল্লাহ, 'লক্ষ্মী ছেলের মত রিলিজের কাগজপত্র সই করে দাও। একটু এদিক ওদিক করলে প্রথম গুলিটা ঢুকবে তোমারই মাথার পিছন দিয়ে।'

এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা।

'আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি,' বলল সে। 'কাগজ-পত্র কিছু সই করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই!' একবার সিকান্দার বিল্লাহ, আর একবার স্টেন হাতে দাঁড়ানো চিশতি হারুনের দিকে চাইল সে বিস্ফারিত চোখে। কেমন যেন থতমত হয়ে গেছে। 'এসব কি ব্যাপার?'

'উনি একজন ভি আই পি,' মসৃণকণ্ঠে বলল রানা। 'সেইজন্যেই আর্মি গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

একটা ফর্ম বের করে দিল লোকটা। সেটা পূরণ করে নিচে সই করে দিল রানা। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সিকান্দার বিল্লাহ রানা কি করছে দেখবার জন্যে। রিভলভারটা গোঁজা রয়েছে কোমরের হোলস্টারে। আড়চোখে চিশতির দিকে চাইল রানা। সোজা ওর পিঠের দিকে চেয়ে রয়েছে ওর হাতের স্টেন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ি বারান্দা ছাড়াতেই এগিয়ে এল একটা অ্যামবুলেন্স।

হাসপাতালের কার পার্কে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাঢ় সবুজ রঙের ডাটসান সিক্সটিন হানড্রেডের ড্রাইভিং সীটে বসে সবই দেখতে পেল গোলাম পাশা। স্ট্রেচারসহ হাম্না কাওসারকে অ্যামবুলেন্সে তোলার পর রানাকেও উঠে পড়তে দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। নার্সটাকেও যখন ওঠানো হলো, হাসিটা আর একটু বিস্তৃত হলো। সব শেষে কর্নেলের ড্রেস পরা লোকটাও যখন উঠে পড়ল অ্যামবুলেন্সের পিছনে, আঙুল বাড়িয়ে রাডার স্ক্যানারের সুইচটা টিপে দিল সে। অ্যামবুলেন্সটা হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই স্টার্ট দিল সে ডাটসানে। এদিকে গরম হয়ে কাজ শুরু করেছে রাডার স্ক্যানার। পরিষ্কার ব্লিপ পেয়ে হাসিটা এবার ওর দুই কানে গিয়ে ঠেকল। রেডিও পিলটা ঠিকই সময়মত খাইয়ে দিয়েছে গাসদ রানা···নাকি নিজেই খেয়ে বসে আছে!?

ফোয়ারাটা আধপাক ঘুরে রেস কোর্স বাঁয়ে রেখে হক সাহেবের মাজারের দিকে রওনা হয়ে গেল অ্যামবুলেন্স। ধীরেসুস্থে পিছার দিয়ে হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল গোলাম পাশা।

অ্যামবুলেন্স আর ডাটসান—দুটোকেই বেরিয়ে যেতে দেখল আলমগীর, এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল আরেকটা। কি করছে নিজাম এতক্ষণ ধরে? মেয়েটাকে পায়নি, নাকি ধরা পড়ে গেল? নিজাম ধরা পড়া মানে সবাই একসাথে ধরা পড়ে যাওয়া। স্রেফ ফাঁসি হয়ে যাবে তাহলে, কোন সন্দেহ নেই আলমগীরের। নিজামকে ফেলে এক্ষুণি পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল সে বার কয়েক। কিন্তু যাবে কোথায়? আত্মগোপন করবার মত কোন আশ্রয়ের সন্ধান জানা নেই ওর। ডাঙায় তোলা চিতল মাছের মত আকুলিবিকুলি করছে ওর ভিতরটা, অমঙ্গল চিন্তায় ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে হাত-পা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে বারবার চাইছে ড্রেন পাইপের দিকে।

বুঝে নিয়েছে নিজাম, বিফল হয়েছে সে। চারতলার কার্নিসে দাঁড়িয়ে সবই দেখল সে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর যে অ্যামবুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো যে মেয়েটাকে, তাকেই খুন করতে পাঠানো হয়েছিল ওদের। সামান্য কয়েক মিনিটের এদিক-ওদিকে হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে শালী। যজ্ঞেশ্বরের চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। পারিনি বলে কেউ পার পায়নি আজ পর্যন্ত গাঙ্গুলীর কাছ থেকে, কঠিন খেসারত দিতে হয়েছে বিফলতার। না পারার দোষটা কিভাবে এড়ানো যায় ভাবতে ভাবতে হাসপাতালের অপর পাশে নেমে এল সে পাইপ বেয়ে। গাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সাঁৎ করে সরে গেল সে একটা অন্ধকার ছায়ায়।

অর্ধসমাপ্ত দালানটার ভিতর থেকে একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। টর্চলাইট জ্বলে উঠল একটা।

পাওয়া গেছে লাশটা! এখন ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ! ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে চলে গেল সে কয়েক গজ। গাড়ির কাছে পৌঁছতে হলে প্রাঙ্গণের একচিলতে আলোর উপর দিয়ে যেতে হবে। দেখে ফেলবার সম্ভাবনা যদিও রয়েছে, তবু এই ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। এখনই খবর পেয়ে অনেক লোকজন এসে হাজির হবে। প্রাণপণ বেগে ছুটে চলে গেল সে ফিয়াটের পাশে। দরজা খুলেই লাফিয়ে উঠল ভিতরে।

'জলদি! জলদি গাড়ি ছাড়েন!'

মুহূর্তে হাত-পায়ের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল আলমগীর।

'কি-কি? কি হয়েছে!'

'আবার কোরচেন করে!' ধমকে উঠল নিজাম। 'গাড়ি ছাড়েন না, মিঞা।' রাগের ঠেলায় জুবি বের করে ফেলল সে। '—দিয়া হান্দায়া দিমু তোমার কোরচেন! খাড়োয়া রইছ কেলেগা—ধইরা ফালাইবো অক্ষণে! লাস

পাওয়া গেছে!'

শেষের কথাটায় সংবিৎ ফিরে পেল আলমগীর। কাঁপতে কাঁপতে স্টার্ট দিল গাড়িতে। হ্যান্ডব্রেক টেনে রাখা অবস্থাতেই গিয়ার দিয়ে চালাবার চেষ্টা করল, ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল গাড়ি। ক্লাচ টিপে রেখে আবার অন করল ইগনিশন সুইচ, হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করে ভোঁ করে অস্বাভাবিক গতিতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ও ভুল গিয়ে শাহবাগ অ্যাভিনিউ-এ। এঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে এসে ও বার মুখ খুলল সে।

'কেউ দেখে ফেলেছে তোমাকে?'

'না। মিছাকথা কইছিল। পাঁচতালায় আছিল না, চাইরতালায় আছিল মায়া-লোকটা। মিলিটারি আইয়া লোইয়া গেছে গা।'

নিজামের মুখের দিকে চেয়ে বারকয়েক চোখ মিটমিট করল আলমগীর। 'নিয়ে গেছে মানে? মারা যায়নি? কিসের লাশ পাওয়া গেছে তাহলে?'

যা যা দেখেছে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা দিল নিজাম। সুপ্রিম কোর্টের সামনে ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে পড়ল আলমগীর।

'হায়, হায়! তাহলে? কি জবাব দেব এখন গাঙ্গুলী বাবুকে?'

'কইবেন গাড়ির ভিতর বোইয়া বোইয়া মাক্ষী মারছেন দুই ঘণ্টা। আমার কি? আমি গিয়া পাই নাইক্কা। পাইলে ঠিকই সিজিল কইরা দিয়া আইতাম। আমারে দেখায়া দিবেন, ওই যে ওইখানে—মারানি, আমি জিনিস কইরা দিমু।'

কোনও দিকে কোনও রাস্তা খুঁজে পেল না আলমগীর। আর্মির লোক ছিল, একজন স্যুট পরা লোক ছিল, সেই সাথে নার্সও ছিল—কোথায় খোঁজ করবে সে এখন ওদের? ভেবেচিন্তে আপাতত বাড়ি ফেরাই স্থির করল সে। কবিতার সাথে আলাপ করলে হয়তো কোন সুরাহা মিলতে পারে।

আবার চেপে এসেছে বৃষ্টি। উইন্ডস্ক্রীনে পানির ঢল। ওয়াইপার চালিয়েও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না রাস্তা। এরই মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল সে নিজের ফ্ল্যাটে।

দরজা খুলেই চমকে উঠল কবিতা আলমগীরের চেহারা দেখে। মুহূর্তে বুঝে নিল সে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে বসল সবাই। ক্ষোভে ফেটে পড়ল আলমগীর। 'পারিনি। আমার কোন দোষ নেই। পাঁচতলার উপর অনর্থক সময় নষ্ট করেছে ও। চারতলায় ছিল মেয়েটা। যখন চারতলায় নেমেছে, দেখে মিলিটারি নিয়ে চলে যাচ্ছে ওকে। হাঁ করে দেখেছে, আটকাতে পারেনি।' আড়চোখে নিজামকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'কোথায় নিয়ে গেছে কিছু জানি না... কি করব এখন?'

'নিয়ে চলে গেছে!' ভুরু কুঁচকে গেল কবিতার। নিজামের দিকে ফিরে

বলল, 'কি কি ঘটেছে বলুন তো?'

নিজস্ব প্রাঞ্জল ভাষায় ঘটনার বিবরণ দিল নিজাম। গড় গড় করে বলে গেল নার্সের কাছ থেকে রুম নাম্বার আদায় করা থেকে নিয়ে হাস্না কাওসারকে অ্যামবুলেন্সে তোলা পর্যন্ত সব. নার্সের লাশ পাওয়া যাওয়ায় যে হৈচৈ উঠেছে সেটাও জানাতে ভুল করল না।

আলমগীর লক্ষ করছিল কবিতাকে। নিজামকে 'আপনি' বলে বিশেষ সম্মান দেখানোটা পছন্দ হয়নি ওর। ভিতর ভিতর গম্ভ এক হোঁচট খেলো সে যখন দেখল নিরপরাধ একটা নার্সকে সামান্য কারণে ছুরি মেরে শেষ করে দেয়ার বিবরণ শুনে ভাবান্তর তো দূরের কথা, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না কবিতার। তবে কি এসব দেখে এবং শুনে অভ্যাস আছে কবিতার? কেমন যেন ধোকা লাগল ওর ব্যাপারটা।

'আমি কেমতে জানুম ওই—মারাণী মিছাকথা কইতাছে?' বক্তব্য শেষ করল নিজাম। 'আমি তো ডাঙ্গুলি সাবেরে সিদা কমু, আমার কোন দোস্ নাইক্কা।'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল কবিতা। ফিরল আলমগীরের দিকে। 'পারিনি বলে পার পাওয়া যাবে না যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর কাছে। যেমন করে হোক, পারতেই হবে আমাদের। তুমি এক কাজ করো, ওকে বলো, তোমরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে মেয়েটাকে হাসপাতাল থেকে। বলো, কোথায় সরানো হয়েছে সেটা জানবার চেষ্টা করছ তুমি, কাল সকাল নাগাদ জেনে যাবে ও কোথায় আছে; তারপর তোমার মিশন তুমি সম্পূর্ণ করবে।'

'কিন্তু কি করে জানব আমি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে?' ঘর্মাক্ত কপাল মুছল আলমগীর।

'সেটা আমি দেখব। গাঙ্গুলী দা'কে বলো, আমার একটা কন্ট্যাক্ট আছে, আমি রওনা হয়ে গিয়েছি তার সাথে কথা বলতে।'

সন্দেহ ফুটে উঠল আলমগীরের দৃষ্টিতে।

'কে? কার সাথে কন্ট্যাক্ট আছে তোমার?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই। গাঙ্গুলী দা'ও জানতে চাইবে না। এ ব্যাপারটা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারো আমার ওপর।' নিজামের দিকে ফিরল, 'যে-কোন মুহূর্তে দরকার পড়তে পারে আপনাকে। আজ রাতে এখানেই থেকে যান আপনি। তিনজনের আন্দাজ খাবার এনে রেখেছি, অসুবিধে হবে না। আলমগীরের দিকে ফিরল আবার। 'কই?' টেলিফোনের দিকে মাথা ঝাঁকাল। 'ফোন করো। আধঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসছি আমি।' হাত বাড়াল। 'দাও। গাড়ির চাবিটা দাও।'

গাড়ির চাবিটা কবিতার হাতে দিয়ে আবার প্রশ্ন করল আলমগীর, 'কোথায়

চললে?'

শোবার ঘর থেকে লেডিস ছাতা আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এল কবিতা। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আবার জানতে চাইল আলমগীর, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল কবিতার ঠোঁটে।

'ফোন করো, প্লীজ! দেরি হবে না আমার।'

বেরিয়ে গেল কবিতা রায়।

ছয়

অ্যামবুলেন্স প্রস্তুত দেখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল রানা সিকান্দার বিল্লার দিকে।

'বাহ্! তোমাদের সেই আগের এফিশিয়েন্সিই রয়েছে দেখছি, দোস্ত! তুলনা হয় না তোমাদের। যাই বলো, বি সি আই অনেক পিছিয়ে পড়েছে, কাজ করে আর মজা পাচ্ছিলাম না ওদের সাথে।'

এসব কথায় কান দিল না সিকান্দার বিল্লাহ। কঠোর কণ্ঠে আদেশ করল, 'চোপরাও! উঠে পড়ো।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা উঠে যেতেই হাত ঝাঁকিয়ে ইশারা করল সে নার্সকে। মুখে বলল, 'তুমিও।'

চিশতির স্টেন আর বিল্লার রিভলভারের দিকে সভয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল রাবেয়া মজুমদার। রানা হাত বাড়াল ওকে উঠতে সাহায্য করবে বলে, কিন্তু রানাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সাহায্য ছাড়াই উঠে পড়ল সে অ্যামবুলেন্সে। এবার বিল্লাহ আর চিশতি উঠে বসতেই রওনা হয়ে গেল অ্যামবুলেন্স।

'এইবার শোনা যাক,' মুখোমুখি নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বসে থাকা রানার চোখের দিকে চাইল সিকান্দার বিল্লাহ। 'স্বামী হিসাবে পরিচয় দিয়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছিলে একে, বোঝা যাচ্ছে। কি প্ল্যান ছিল তোমাদের? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওকে?'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিসে হোটেল স্যুইটের মত করে সাজানো হয়েছে দুটো ঘর আমাদের জন্যে।' যা মুখে এল বলে গেল রানা। 'সোহেল আহমেদের ধারণা: প্রেম, প্রীতি আর যথেষ্ট পরিমাণে আদর পেলে জলদি ফিরে আসবে ওর স্মৃতি। আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল ওর থেকে তথ্য বের করবার জন্যে।' পকেট থেকে দশ টাকার দুটো নোটের বাণ্ডিল বের করে দেখাল রানা। 'অ্যাডভান্স দিয়েছে দু'হাজার, বাকি তিন

হাজার দেয়ার কথা ছিল ওর পেটের কথা বের করতে পারলে তারপর। যাই হোক, এখন তো আর সে সবের প্রশ্নই ওঠে না, ছিনিয়ে নিয়েছ তোমরা ওকে। কি করবে এখন ওকে নিয়ে?'

'সেটা আমরা বুঝব।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কি যেন চিন্তা করল বিল্লাহ, তারপর বলল, 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না, মাসুদ রানা। গত কয়েক মাসের মধ্যে দুই-দুইবার তোমার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। একবার লাহোরে, একবার প্যারিসে। আজ নিয়ে তিনবার হলো। বি সি আই ছেড়ে দিয়ে থাকলে বারবার দেখা যাচ্ছে কেন তোমাকে এখানে-ওখানে-সেখানে?'

'আমি ছাড়লেও কমলি তো আমাকে ছাড়ে না।' হাসল রানা। 'তুমিই বলো, লাহোরে কি আমি বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছিলাম? প্যারিসেও আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট হাতে নিয়েছিলাম, তার সাথে বাংলাদশের কোন সম্পর্ক ছিল? ছিল না। আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল জটিলেশ্বর রায় ওর কুটিল প্যাঁচ মেরে। আর এইবার ফেঁসেছি টাকার লোভে। তুমিই বলো, দিন কয়েক একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে স্বামী-স্ত্রী খেলার বিনিময়ে পাঁচটা হাজার টাকা কম হলো?' বিল্লাকে গম্ভীর মুখে চিন্তা করতে দেখে বলল, 'অত ভাবনা-চিন্তা সন্দেহের কি আছে, বিল্লাহ, তুমি তো ইচ্ছে করলেই হাতে নাতে প্রমাণ নিতে পারো।'

'কি রকম?'

'খুব সহজেই আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে পারো তুমি। মেয়েমানুষ ভজানো তোমার কাজ নয়, তোমাকে দেখলেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে যেকোন মেয়েলোকের। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখো এই নার্সকে।' নিজের চিবুক নাড়ল রানা আদর করবার ভঙ্গিতে। 'ইচ্ছে করলেই এই চেহারাটা কাজে লাগাতে পারো তোমরা। ভাড়া নিতে পারো আমাকে। সেক্ষেত্রে কাগজপত্র, পাসপোর্ট, সব তো রয়েছেই; ওর স্বামী হিসেবে অভিনয় করে যেতে পারি আমি—তথ্যগুলো সোহেল আহমেদকে না নিয়ে তোমাকে দেওয়ায় কোন অসুবিধেই নেই। তোমার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশি তথ্য বের করতে পারব আমি ওর কাছ থেকে। এজন্যে অবশ্য টাকা খসবে কিছু। আমার তো মনে হয় না পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের টাকার অভাব আছে। দশ হাজারেই রাজি হয়ে যাব আমি। তুমি কি বলো?'

বিস্ফারিত চোখে রানার কথা শুনছিল রাবেয়া মজুমদার, স্পষ্ট ঘৃণা ফুটে উঠল সে-চোখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ছিঃ! মানুষ না পিশাচ আপনি!'

অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখটা।

'তুমি চুপ করে থাকো, সুন্দরী। বড়দের কথার মধ্যে নাক গলাতে এসো

না। দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি এসব অর্থহীন দামী শব্দ তোমার মাথায় ঢুকেছে, শিকেয় তুলে রাখো সেসব। শুনে রাখো, আত্মপ্রেমই আসল। টাকাই সব। আরও জেনে রাখো, তোমার চোখে বীরপুরুষ বা ভালমানুষ সাজবার কোন প্রয়োজন নেই আমার। ফিরল সিকান্দার বিল্লার দিকে। 'কি ঠিক করলে? এক সময় আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি, দোস্ত। আবার তোমাদের সাথে কাজ করতে আমার আপত্তি নেই। রাজি আছ আমার প্রস্তাবে?'

কঠোর দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখল বিল্লাহ রানাকে।

'জাত গোক্ষুর সাপকেও বিশ্বাস করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু তোমাকে না। তাছাড়া বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না এখানে···তোমাকে আমাদের দরকার নেই। এ-সব কথাতেও রিভলভারটা রানার দিক থেকে একচুল নড়েনি। 'ভাবতে অবাক লাগছে, তোমার মত একজন লোককে কি করে নিয়োগ করে বি সি আই-য়ের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার! খোঁজ খবর রাখে না তারা কোন?'

'আমারও অবাক লাগে,' অম্লান বদনে বলল রানা। 'লোকটা এক রোমান্টিক গর্দভ, অবিশ্বাস করতে জানে না কাউকে। যাই হোক, আমাকে দরকার যদি না থাকে, কোন রকম চুক্তি সম্ভব বলে যদি মনে না করো, আমার করবার কিছুই নেই। তোমাদের যা খুশি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে জানতে পারি?'

হাটখোলার মোড় ঘুরে নারায়ণগঞ্জের পথে ছুটে চলেছে এখন অ্যামবুলেন্স।

'খানিক বাদেই গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দেব আমরা তোমাকে,' বলল সিকান্দার বিল্লাহ। 'ফিরে গিয়ে সোহেল আহমেদকে খবর দিয়ো তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে পাকিস্তানীরা হাম্না কাওসারকে। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মাসুদ রানা, তোমার বুকের ভিতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারলে আমি যার-পর-নাই খুশি হতাম, হত্যা করার অর্ডার নেই বলে পারছি না সেটা, কিন্তু বলে রাখছি, আবার যদি দেখা হয় আমাদের, কি ঘটবে বলা যায় না। এত সহজে পার পাবে না ভবিষ্যতে।

শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল রানা।

'ওরেব্বাপ! তোমার ছায়াও মাড়াচ্ছি না আমি আর! এই আদর্শবাদী বোকা—সুন্দরীকে কি নিয়ে যাচ্ছ সাথে করে, নাকি আমার ঘাড়ে চাপার জন্যে নামিয়ে দিচ্ছ আমার সাথে?'

রাবেয়ার দিকে চাইল বিল্লাহ। কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওকে আমার কোন দরকার নেই। তোমার সাথেই নেমে যাবে ও।

একটা কথা জেনে রাখো, মাসুদ রানা, আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করলে অনর্থক সময় নষ্ট হবে তোমার। আমরা কোন্ পথে কোন্‌দিকে যাব সেটা টের পাওয়ার রাস্তা রাখিনি। হাজার চেষ্টা করেও আমাদের হদিস পাবে না তোমরা।'

'চেষ্টা করতে যাব কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'আমার যা করার আমি করেছি। তোমাদের পিছু ধাওয়া করার জন্যে ভাড়া করা হয়নি আমাকে। আমার ওপর যে কাজের ভার দেয়া হয়েছিল সেটা ঠিকভাবে আদায় করতে হলে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সোহেল আহমেদের। সেটা সে করেনি বলেই তোমরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছ মেয়েটাকে। এটা কি আমার দোষ? অ্যাডভান্স যা পেয়েছি তাতেই আমি খুশি, বাকি ঠ্যালা সামলাক গিয়ে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল বিল্লাহ কয়েক সেকেন্ড। কেন যেন মনে হলো ওর কাছে, এসব কথা ঠিক মানাচ্ছে না মাসুদ রানার মুখে। কোথায় কিসের যেন গোলমাল আছে একটা কিছু। সেই নিজেজারী ফিগার, সেই দুর্ধর্ষ মাসুদ রানাকে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না এই দুর্বল-চরিত্র গোয়েন্দার ভূমিকায়। এই যে হেলান দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে চোখ বুজে বসে গুনগুন করছে উঁহুঁ, মিলছে না।

খটকাটা ঠিক কোথায় বাধছে ভেবে বের করবার চেষ্টায় মন দিল সে।

রেডিওটা আস্তে ছেড়ে দেব দুলালের গলা কাঁপানো সংবাদ পর্যালোচনা শুনছে রাফিকুল হক। পৌনে দশটাতেই নিঝুম হয়ে এসেছে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকাবাস এলাকা। টোকা পড়ল দরজায়।

ফ্যামিলি বাপের বাড়ি গেছে তিন সপ্তাহের জন্যে, তাই গত দু'দিন ধরে দক্ষিণের জানালার পর্দা তুলে দিয়েছে সে, বাড়ি ফাঁকা টের পেয়ে যদি আসে পাশের বাড়ির আরিফা, সেই আশায়। কয়েক মাস আগে এই আরিফাকে নিয়ে বেশ বড়সড় একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল রাফিকুল হক, সামলে নিয়েছে ডিপ্লোম্যাসির জোরে। টোকা শুনেই হাসি ফুটে উঠল অধ্যাপক রাফিকুল হকের পুরু ঠোঁটে।

শুধু নারীঘটিত ব্যাপারেই যে এর নামে এদিক ওদিক নানারকম কানাঘুষো শোনা যায় তা নয়, নোংরা চরিত্রের লোক হিসেবে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় জোড়া তার খ্যাতি; যে-ই তার সংস্পর্শে এসেছে সে-ই টের পেয়েছে তার তীক্ষ্ণ দুর্বুদ্ধির ছিটে-ফোঁটা আলামত; জেনে নিয়েছে, সসম্মানে এই লোককে এড়িয়ে না চললে পরিণত হতে হবে এর ভয়ঙ্কর কুটিল কোন ষড়যন্ত্রের শিকারে। বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশন, আই এ থার্ড

ডিভিশন, বি এ থার্ড ডিভিশন—হঠাৎ করে এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস এবং সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি কি করে পাওয়া যায় খুব বুদ্ধি না থাকলে বোঝা মুশকিল। দুষ্ট লোকেরা বলে তদানীন্তন হেডের সাথে নাকি বিশেষ দহরম-মহরম ছিল ভদ্রলোকের। সে যাই হোক, রাফিকুল হক যে বিলেত ফেরত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফেরত এই অর্থে যে কোন ডিগ্রী না দিয়েই দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। কায়দা করে পাইপ খাওয়া ছাড়া আর কোন বিদ্যা শিখে আসতে পারেনি সে বিলেত থেকে। ফিরেই আবার যোগ দিয়েছে শিক্ষাঙ্গনটাকে কূটনীতি আর দলাদলির মাধ্যমে দূষিত দুর্গন্ধময় করে তোলার কাজে।

ইদানীং ব্যস্ত আছে রাফিকুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিরপরাধ শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে এক বিশদ রিপোর্ট তৈরির কাজে। কোথায় যোগাযোগ করলে খুব দ্রুত ফল পাওয়া যাবে জানা আছে তার, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে ধরে তার বন্ধু ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে ইতিমধ্যেই। তারই নির্দেশে তৈরি করছে রিপোর্ট। কাগজগুলো ভাঁজ করে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে দরজায় টোকার আওয়াজ হতেই।

দরজা খুলেই চমকে উঠল রাফিকুল হক।

'কবিতা!' একেবারে আকাশ থেকে পড়ল রাফিকুল হক। 'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?' কবিতার সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ভিজে গেছ দেখছি। এসো, ভেতরে এসো।'

বিচিত্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠল কবিতা রায়ের ঠোঁটে। পা বাড়াল সামনে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে পিছন পিছন আসছে রাফিকুল হক। একটা পর্দা উঠিয়ে বলল, 'এই যে, এই ঘরে।' জানালার পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে আবার একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে কবিতার। বুকের ভিতরটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। পোকায় খাওয়া দাঁত বের করে হাসল। 'ভাল দিনেই এসেছ, কবিতা। কেউ নেই বাসায়। আমি একা।'

মাস ছয়েক আগে পরিচয় হয়েছে ওর কবিতা রায়ের সাথে ভারতীয় ছায়াছবি 'আনন্দ' দেখতে গিয়ে। প্রথম দর্শনে প্রেমের অভিনয় করেছে কবিতা, যেচে আলাপ করেছে, মুগ্ধ হয়েছে, ডেকে নিয়ে গেছে অন্ধকার কোণে, প্রশ্রয় দিয়েছে। দশ মিনিটের পরিচয়ে চুম্বন এবং গায়ে হাত দেয়ার অভিজ্ঞতা রাফিকুল হকের জীবনে এই প্রথম। বিলেতে থাকতেও এমন সুযোগ হয়নি কোনদিন। পরদিন বিকেলে দেখা হয়েছে ওদের রমনা পার্কে, ওকে ছাড়া সারাটা রাত কেমন ছটফট করেছে কবিতা সেকথা জানাতে পেরে স্থানীয় এক হোটেলে যে একঘণ্টার জন্যে রুম ভাড়া পাওয়া যায় সেই সুসংবাদ

জানিয়েছে সে কবিতাকে। কিন্তু রাজি হয়নি কবিতা, সোজা নিয়ে এসেছে ওকে অমলেশ কর্মকারের দোতলার ছোট্ট একটা কামরায়।

ছয় মাসে আরও বার চারেক হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে ওর কবিতার সঙ্গে, ঘণ্টা খানেক পর বিদায় নিয়েছে সে অমলেশ কর্মকারের দোতলার সেই ছোট্ট কামরা থেকে। কোন পিছুটান নেই, দাবি-দাওয়া নেই, শুধু ভাল লাগা, মিলন···আহা, দুনিয়ার সব মেয়েই যদি এতটা আধুনিক হত!

'বসো, কবিতা,' কয়েক পা এগিয়ে এল রাফিকুল হক। 'এতরাতে হঠাৎ কোত্থেকে এলে? আমার ঠিকানাই বা জানলে কি করে?'

একটা সোফায় বসে পড়ল কবিতা। পাশের সোফায় বসে ওর একটা হাত তুলে নিল রাফিক নিজের হাতে।

'তোমাকে একটা গল্প শোনাতে এসেছি,' হাসল কবিতা রহস্যময় হাসি। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলল হাস্না কাওসারের কাহিনী। সব শেষে বলল, 'মেয়েটাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।'

'কিন্তু আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন, কবিতা?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রাফিকুল হক কবিতা রায়ের চোখের দিকে। স্থির হয়ে রয়েছে কবিতার চোখ জোড়া ওর চোখের ওপর।

'আমরা জানতে চাই কোথায় রয়েছে হাস্না কাওসার।'

হাঁ হয়ে গেল রাফিকুল হকের মুখটা। ডাঙায় তোলা বোয়াল মাছের মত বার দুই খুলল এবং বন্ধ হলো। কবিতার কথাগুলো ঠিকমত শুনেছে কিনা সে সম্পর্কে এক সেকেন্ডের দ্বিধা এল ওর মনে। পরমুহূর্তে মনের ভিতর বেজে উঠল বিপদসঙ্কেত।

'তোমরা জানতে চাও!···কী বলছ, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমরা জানতে চাই কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে হাস্না কাওসারকে।' বিন্দুমাত্র কাঁপল না কবিতার গলার স্বর।

'সেটা আমি জানব কি করে?'

'ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তোমার। যেমন করে পার ওর কাছ থেকে জানতে হবে তোমার ঠিকানাটা। কাল সকাল দশটার মধ্যে ঠিকানা আমাদের চাই।'

ধূর্ত লোক, ধাক্কাটা সামলে নিতে বেশি দেরি হলো না। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল মুহূর্তে। বুঝতে পেরেছে সে, এই মুহূর্তে ছিঁড়তে হবে কবিতার মোহজাল, নইলে আটকে যাবে চিরতরে, ফেঁসে যাবে মহাবিপদে। মোটা শরীর নিয়ে এক লাফে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। আঙুল তুলে দরজা দেখাল সে কবিতাকে।

'বেরিয়ে যাও! এটা গুপ্তচর বিভাগ নয়, ভদ্রলোকের বাসা। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, নইলে পুলিস ডাকব আমি! গেট আউট!'

কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কবিতা ওর মুখের দিকে, তারপর খুলল ওর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা। চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল রাফিকুল হকের, ভেবেছিল পিস্তল বের করছে বুঝি কবিতা। কিন্তু পিস্তল নয়, তার চেয়েও বহুগুণ ভয়ঙ্কর অস্ত্র বেরিয়ে এল ব্যাগ থেকে। বড় সাইজের পাঁচটা ফটোগ্রাফ।

'এগুলোর দিকে একবার চাইলেই বুঝতে পারবে সব। চেয়ে দেখো। তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না এগুলো তোমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিলি করা হোক?'

হঠাৎ রাফিকুলের মনে হলো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, বাতাস নেই ঘরে। দুলে উঠল ঘরবাড়ি, মাথার ভিতরটা চক্কোর দিচ্ছে। চিবুকটা থরথর করে কাঁপছে নিজের অজান্তেই।

ছবিতে কি আছে বুঝে নিয়েছে সে আগেই, তবু থাবা দিয়ে কেড়ে নিল সে কপিগুলো কবিতার হাত থেকে। প্রথম ছবিটার দিকে এক নজর চেয়েই মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। নিজের উলঙ্গ ছবি দেখে ঘেন্না ধরে গেল নিজেরই। এতটা মোটা আর কুৎসিত হয়ে গেছে সে ভাবতেও পারেনি আগে। নিচের মেয়েটাকে, যদিও আউট অফ ফোকাস, চিনতে পারল সে—কবিতা রায়। পরের ছবিটায় নিজের মুখে অশ্লীল হাসি দেখে ঠাস করে এক চড় কষাতে ইচ্ছে করল ওর, ন্যাংটো ভাড় হয়ে হাসিমুখে ব্রেসিয়ার খুলছে কবিতার। তৃতীয়টা আরও জঘন্য। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল রাফিকুল হকের। ঠিক এমনি সময়ে টিক টিক করে টিকটিকি ডেকে উঠল ঘরের দেয়ালে। লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাফিকুল হক শব্দ শুনে, দুই হাত পিছনে নিয়ে আড়াল করবার চেষ্টা করল ছবিগুলো।

মৃদু হাসি খেলে গেল কবিতার ঠোঁটের কোণে।

'অফুরন্ত সময় নেই আমার হাতে,' বলল সে। 'আমরা জানতে চাই কোথায় আছে মেয়েলোকটা।'

শিউরে উঠল রাফিকুল হক । হাত থেকে পড়ে গেল ছবিগুলো মেঝেতে।

'আ-আমি কি-কি করে বলব সেকথা?'

'ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার কাছ থেকে জেনে জানাবে আমাকে।'

'আমি জিজ্ঞেস করলেই আমাকে সে বলবে কেন? বুঝতে পারছ না...'

'বেশ। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করবার মত ঘনিষ্ঠতা যদি এখনও না হয়ে থাকে, অন্তত এটা তো রেখে আসতে পারবে ওর অফিস কামরায়।'

বলতে বলতে ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা চারকোনা বাক্স বের করল কবিতা। 'লিম্পেট মাইক্রোফোন বলে এটাকে। ক্যাপ্টেনের ডেস্কের নিচে আটকে দিয়ে আসবে তুমি এটা, বাকি যা করবার আমরাই করব। যদি কাল সকাল দশটার মধ্যে এটা জায়গামত ফিট করা না হয়, ছবিগুলো সত্যিই বিলি করা হবে। আমাদের কাছে অসংখ্য কপি আছে প্রত্যেকটার, কাজেই এগুলো তুমি রাখতে পারো নিজের কাছে। কাছে থাকলে প্রেরণা বোধ করবে আমাদের সাহায্য করবার।'

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল কবিতা রায়। যেখানে ছিল সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাফিকুল হক আধ মিনিট, ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভাসতে থাকল ছবিগুলো হাতে পেয়ে কোলিগদের কার কি প্রতিক্রিয়া হবে সেইসব দৃশ্য। ধুমশো শরীর নিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল সে একটা সোফায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে টেবিলের উপর রাখা লিম্পেট মাইক্রোফোনের উপর :

ডানদিকে মোড় নিয়ে ডায়না সিনেমা হলের দিকে ছুটছিল অ্যাম্বুলেন্স, সিকান্দার বিল্লার আদেশ পেয়ে থেমে দাঁড়াল মাঝপথে। গাড়ি থামতেই টের পেল রানা, বাইরে শুধু বৃষ্টিই নয়, ঝড়ও বইছে জোরেশোরে।

'নামো। নেমে যাও। দু'জনই।' আদেশ দিল বিল্লাহ।

দরজা খুলল রানা। সিকান্দার বিল্লার দিকে চেয়ে হাসল। 'থ্যাংক্স্ ফর দা রাইড। কিন্তু, ভাল করে ভেবে দেখেছ, সত্যিই কি আমার সাহায্য দরকার নেই তোমাদের? আমাকে ভাড়া করলে টাকাগুলো কিন্তু পানিতে যেত না।'

'গেট আউট!' হুঙ্কার ছাড়ল বিল্লাহ।

'যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি।'

নেমে পড়ল রানা। ইতিমধ্যেই নেমে গেছে রাবেয়া মজুমদার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চুপচুপে হয়ে গেছে ভিজে। রানা নেমে যেতেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সিকান্দার বিল্লাহ। সাথে সাথেই রওনা হয়ে গেল গাড়ি। আবছা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির পিছনের লাল টেইল লাইট। শোঁ শোঁ বাতাসের গর্জন আর ঝমাঝম অঝোর ধারা—আর কোন শব্দ নেই কোথাও। পানিটা বরফ দেয়া শরবতের মত ঠাণ্ডা।

'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?' বলল রানা। 'চলুন, আগে বাড়া যাক।'

'লজ্জা করে না আপনার!' ফোঁস করে জ্বলে উঠল রাবেয়া মজুমদার। 'কাপুরুষ! আপনি নিজেকে মানুষ বলে মনে করেন?'

'করি। পিশাচ হলে এই মুহূর্তে আপনার ঘাড়টা মটকে দিতাম।' বামহাত তুলে বৃষ্টির ছাঁট আড়াল করে বলল রানা, 'ইস, একেবারে তীরের মত বিঁধছে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবেন, নাকি এগোবেন ঢাকার দিকে?'

'তার মানে কিছুই করছেন না আপনি? মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে…কিছুই করবার নেই আপনার?'

'আপনিই বলুন না কি করা যায়? অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে দৌড়াব?'

'একটা গাড়ি থামিয়ে অনুসরণ করতে পারেন। উদ্ধার করবার চেষ্টা করতে পারেন।'

'বাহ্! চমৎকার আইডিয়া!' রাবেয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বোলাল রানা। 'এইজন্যেই মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। পুরুষদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তামাশা দেখাই তাদের একমাত্র কাজ। ধরুন, অনুসরণ করলাম, তুফান বেগে গাড়ি চালিয়ে ধরে ফেললাম অ্যাম্বুলেন্সকে…তারপর? স্টেনগান আর রিভলবারের গুলিগুলো কে হজম করবে? আমি, না আপনি?'

চেহারা দেখে মনে হলো, এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল-ঘুসি-খামচি শুরু করবে রাবেয়া মজুমদার।

'তাহলে পুলিসে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করুন!' রাগের মাথায় জোরে পা ঠুকল রাবেয়া রাস্তার উপর।

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। ওই যে একটা গাড়ি আসছে, ওটাকে থামাবার চেষ্টা করা যাক।'

একটা গাড়ি আসছিল, দুই হাত নেড়ে ওটাকে থামাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু রানাকে দেখার সাথে সাথেই স্পীড বেড়ে গেল গাড়িটার, দাঁতে দাঁত চেপে অ্যাকসিলারেটার টিপে ধরেছে চালক, একরাশ কাদাপানি ছিটিয়ে রানার দামী স্যুটটা নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা, তারপর ব্যাখ্যা দিল, ঝামেলা এড়িয়ে গেল ব্যাটা। ও মনে করেছে ফুসলিয়ে ভাগিয়ে এনেছি আমি আপনাকে হাসপাতাল থেকে। প্রেম ঘটিত ব্যাপার…এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। এদিকে যে কত গভীর প্রেম জানা থাকলে হয়তো…ওই যে, আরেকটা আসছে। আসুন, আপনিও আসুন, দু'জন একসাথে কাদাপানি খাওয়া যাক।'

'বিপদের মধ্যে আবার মেয়েরা কেন?' বলল রাবেয়া, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার পাশে। গাড়িটা কাছে আসতেই পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করল দু'জন মিলে। ব্রেক চাপল এবারের চালক। রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল চাকাগুলো, স্কিড করল কয়েক গজ, সামলে নিয়ে দ্বিতীয়বার ব্রেক-পেডাল পাম্প করল চালক, কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা রাস্তার পাশে সাইড নিয়ে।

দৌড়ে চলে এল ওরা দু'জন গাড়িটার পাশে। জানালা দিয়ে মাথা বের করল গোলাম পাশা। মুখে হাসি।

'ঠিক জানতাম, নামিয়ে দেবে আপনাদের। উঠে পড়ুন, মাসুদ ভাই, চমৎকার ট্রিপ আসছে।'

পিছনের দরজা খুলে রাবেয়া মজুমদারকে তুলে দিয়ে সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রানা। গাড়ি রওনা হতেই সামনে ঝুঁকে রাডার স্ক্রীনটা পরীক্ষা করল সে, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, আস্তে, আস্তে! থেমে দাঁড়াচ্ছে ওরা। খুব সম্ভব গাড়ি বদল করছে। আর কিছুটা এগিয়ে তুমিও থেমে দাঁড়াও।'

ডায়না হলের কাছাকাছি এসে রাস্তার বাম পাশে থেমে দাঁড়াল পাশা।

'মাসুদ ভাই, আপনি চলে আসুন ড্রাইভিং সীটে, আমি কথা বলি সোহেল সাহেবের সাথে। খুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন উনি।'

'দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি, তুমি ভিজো না,' পাশাকে গাড়ি থেকে নামার উপক্রম করতে দেখে বাধা দিল রানা। নিজেই নেমে আর এক দফা ভিজে ঘুরে এসে দাঁড়াল ড্রাইভারের দরজার পাশে। পাশা ছেঁচড়ে প্যাসেঞ্জার সীটে সরে যেতেই উঠে পড়ল।

'কর্নেল সাহেবটা কে?' জিজ্ঞেস করল পাশা।

'সিকান্দার বিল্লাহ।'

'তাই নাকি!' চোখ কপালে উঠল পাশার। 'সেই সিকান্দার বিল্লাহ! খবরটা তো এক্ষুণি জানাতে হয় চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে! এই লোকটা ঢাকায়, অথচ কেউ কিচ্ছু জানে না··· বিপদের কথা!' আনমনে সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে জিভ কাটল গোলাম পাশা। চট করে সিগারেটটা পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখল ওর নাকের কাছে জ্বলে উঠেছে রানার হাতে ধরা গ্যাস লাইটার। 'না, না। আপনার সামনে···'

'আরে ঠিক আছে, ম্যান্। চালাও। আমি কি বুড়ো মেজর জেনারেল নাকি?'

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে পাশা বলল, 'কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি, বুড়ো মিঞা রিটায়ার করলেই আপনাকে বসিয়ে দেয়া হবে সেই চেয়ারে। এখন থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি না করলে বিপদে পড়ব পরে। সুপ্রীম বসের সামনে তখন তো আর মাসুদ ভাইও বলা যাবে না, সিগারেটও খাওয়া যাবে না।'

'আমি ওই চেয়ারে বসলে তো?' হাসল রানা। 'আর যদি বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নিতেই হয় আমাকে ভাইও ডাকা যাবে, সামনে সিগারেটও খাওয়া যাবে। কিন্তু গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না দিয়ে এখন নোটেসি কোন খবর আছে কিনা শোনা যাক।'

'দিল্লী জানিয়েছে গায়েব হয়ে গেছে হাসনা কাওসার। আতিক সাহেব আরও যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে, এই মেয়েই সেই হাসনা কাওসার। ব্যস, আর তেমন কিছু জানা যায়নি।'

আবার চলতে শুরু করেছে রাডার স্ক্রীনের আলোক বিন্দু। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। একটা সুইচ টিপে দিয়ে হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করল গোলাম পাশা। সোহেল আহমেদের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনে হাসল রানা মুচকে। রানাদেরকে গাড়িতে তুলে নেয়ার কথা জানাল পাশা, সিকান্দার বিল্লার কথা জানাল। পরিষ্কার ভেসে এল সোহেল আহমেদের গলা, 'রানাকে দাও মাইকটা।'

'দিচ্ছি, স্যার। উনি গাড়ি চালাচ্ছেন, জাস্ট এক মিনিট।' হঠাৎ চমকে উঠল পাশা। 'আরে! ফিরে আসছে, মাসুদ ভাই! ফিরে আসছে ওরা!'

নদীর ধার ঘেঁষে নারায়ণগঞ্জের দিকে ছুটছিল ডাটসান, ঘ্যাচ করে ব্রেক চেপে থেমে দাঁড়াল রানা, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুরে গেল গাড়ির মুখ, ধীরে সুস্থে ঢাকার দিকে চলল এবার ওরা। স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে, তুমুল বেগে ছুটে আসছে বিন্দুটা ওদের দিকে। হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা নিল রানা।

'কি রে, শালা। কি বলবি বলে ফেল।'

'অ্যাই, খবরদার! জুনিয়ার ছেলেপিলের সামনে গালাগালি করবি না, উল্লুকে পাটঠা! আগেই বুঝেছিলাম তোর মত ভীতুর ডিম দিয়ে কাজ হবে না, নিল তো ছিনিয়ে! এবার কি করবি? আতিকুরের লোকজন লেলিয়ে দিতে বলছিস, নাকি আর কোন প্ল্যান রয়েছে তোর?'

'আমার বউ নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেনরে, ইস্টুপিড? আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, যেমন করে পারি আমি উদ্ধার করব; তুই টাইট মেরে বসে থাক অফিসে, যতক্ষণ পারমিশন না দিই নড়বি না।'

মাইক্রোফোন পাশার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে হেডলাইট দেখল রানা। ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে প্রায়। মাইক্রোবাস একটা। কর্কশ হর্ন বেজে উঠল, বার কয়েক হেডলাইট অন্ হলো ডিপ্ হলো, রানা সাইড দিতেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে।

'কিন্তু সিকান্দার বিল্লাহ কি করে ছেড়ে দিল আপনাকে, মাসুদ ভাই? এত সহজে ছেড়ে দেয়ার তো কথা না? কি গুল্ মেরেছেন?'

'বলেছি, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ছেড়ে দিয়েছি, এখন আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হাম্মা কাওসারের স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে আমাকে।'

'বিশ্বাস করল?'

'সহজে কি আর বিশ্বাস করতে চায়? হাজারো প্রশ্নের জেরা তার। সবশেষে শাসিয়ে দিয়েছে, যদি ভবিষ্যতে তার সামনে পড়ি তাহলে নাকি বারোটা বাজিয়ে দেবে আমার।' বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনে ইঙ্গিত করল রানা। 'পেছনের এই বোকা-সুন্দরী অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে সিকান্দার

বিল্লার বিশ্বাস উৎপাদনের ব্যাপারে। আমার নির্লজ্জ কাপুরুষতায় নিরতিশয় মর্মাহত হয়ে এমন এক আদর্শবাদী ভূমিকা নিয়ে বসল, এবং ভূত-পিশাচ, ইত্যাদি বলে এমনই গালমন্দ শুরু করে দিল যে ঘোরে পড়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল আমার কৈফিয়ৎ।'

হা-হা করে হেসে উঠল গোলাম পাশা। কৌতূহলী চোখে রাবেয়া মজুমদারের মুখের দিকে চাইল। 'সুযোগ পেয়ে খুব একহাত ঝেড়ে দিয়েছেন বুঝি?' চোখমুখ পাকাল প্রশংসার ভঙ্গিতে। তারপর শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না। লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই! গাল দিয়েছেন, বেশ করেছেন। গাল দেবেন না কেন, একশোবার দেবেন, এইটেই তো আপনাদের স্পেশ্যালিটি। আপনাদের গাল খাওয়ার জন্যেই তো জন্ম আমাদের আপনাদেরই পেট থেকে। ওসব আমরা গায়ে মাখি না, কি বলেন, মাসুদ ভাই?'

'রাখো তোমার লেকচার!' মেডিকেল কলেজের সামনে এসে সলিমুল্লাহ হলের দিকে মোড় নিল রানা। 'তোমাকে তো আর গাল দেয়নি! সেই সময়ে চোখ-মুখের চেহারা দেখলে বুঝতে।...ব্যাটারা মনে হচ্ছে মীরপুরের দিকে যাবে। অনর্থক এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে যে কেউ ফলো করছে না। একবার মীরপুর রোডে উঠে পড়লে পরিষ্কার হয়ে যাবে ডেসটিনেশন, তাই বেহুদা ঘুরছে। এই দেখো, আবার ঢুকে পড়ল এলিফ্যান্ট রোডে।'

বিরক্তিসূচক শব্দ করল রানা জিভ দিয়ে।

মীরপুরের একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির গেটের সামনে এসে গতি কমে গেল মাইক্রোবাসের। গেট খুলে দিল একজন তাগড়া জোয়ান লোক। একটু লক্ষ করলে যে কেউ বুঝবে, লোকটার ঢোলা বুশ-শার্টের নিচে রয়েছে একটা পিস্তল-পোরা শোলডার হোলস্টার। গাড়িটা গাড়ি-বারান্দার দিকে এগোতেই আবার গেট বন্ধ করে দিল সে।

গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই একটা মোমবাতি জ্বলে উঠল গাড়ি-বারান্দায়। শাকিলা মির্জা এসে দাঁড়াল দরজার মুখে। সালোয়ার-কামিজ পরা সাড়ে পাঁচফুট লম্বা পেশীবহুল পুরুষালী শরীরের অধিকারী এই মহিলা। মনে হয় জন্মের ঠিক পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ মত পাল্টে ওকে মেয়ে হিসেবে দুনিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধাতা। লোমশ হাত-পা, একসময় গোঁফেরও আভাস ছিল ঠোঁটের উপর, কিন্তু গুজরানওয়ালায় এক দুর্ঘটনায় এসিড দিয়ে মুখ পুড়ে বীভৎস হয়ে যাওয়ায় পাতলা রাবারের মুখোশ ব্যবহার করে এখন, দাড়ি-গোঁফ দেখা যায় না। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের নিষ্ঠুরতম মহিলা এজেন্ট সে। নির্যাতনে এর জুড়ি নেই বলে সহকর্মীদের কাছে উপাধি পেয়েছে সে:

টরচার উওম্যান। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসীম সাহসিকতার প্রমাণ দিয়ে আজ সে পাকিস্তানের সেরা এজেন্টদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। সিকান্দার বিল্লার মত দুর্ধর্ষ এজেন্টও, যদিও দু'চোখে দেখতে পারে না, ওকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে।

'এই যে তোমার শিকার ধরে এনেছি,' গাড়ি থেকে নেমে এল সিকান্দার বিল্লাহ। 'ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। কাল ন'টা -শটা নাগাদ ভাঙবে ঘুম। তখন ইন্টারোগেশনের জন্যে আসব আমরা।'

'আর লোক কোথায়? একে ওপরে তুলে দিয়ে যাবে তোমরা।' কর্কশ পুরুষালী কণ্ঠে বলল শাকিলা মির্জা। 'কেউ অনুসরণ করেনি তো তোমাদের?'

'অনুসরণ?' ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল বিল্লার। 'কি বলতে চাও তুমি?'

তীক্ষ্ণ একজোড়া কুচকুচে কালো চোখ অবজ্ঞার দৃষ্টি রাখল বিল্লার চোখে। 'বলতে চাই, কেউ ফলো করেনি তো? মেজর জেনারেল রাহাত খানের দেশে কাজ করছ, কথাটা খেয়াল রাখা দরকার। এদেরকে আন্ডার-এস্টিমেট করা মোটেই উচিত হবে না।'

চল্ করে রক্ত চড়ে গেল সিকান্দার বিল্লার মাথায়। ইচ্ছে করল ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিতে। কিন্তু সামলে নিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখো, শাকিলা, আমি জানি কার দেশে কাজ করছি। আমাকে কাজ শেখাতে এসো না… কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা উচিত নয় ভাল করেই জানা আছে আমার। তোমার কাজ উপদেশ খয়রাত করা নয়, এই মেয়েলোকটার দেখাশোনা করা। আমার কাজ আমি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছি, তোমার কাজ তুমি করো।'

ড্রাইভার আর চিশতি হারুন স্ট্রেচারে শোয়া ঘুমন্ত মেয়েটাকে মাইক্রোবাস থেকে বের করে নিয়ে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। শাকিলার পিছনে গিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে চোখ টিপল চিশতি সিকান্দার বিল্লার দিকে চেয়ে। বিল্লার মুখটা একটু হাসি হাসি হতেই পাঁই করে ঘুরল শাকিলা পিছন দিকে, কিন্তু তার আগেই ঘাড় সোজা করে নিয়েছে চিশতি।

সিকান্দার বিল্লার কড়া কথা বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না শাকিলা মির্জাকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এর সাথে আমার নিজের নিরাপত্তাও জড়িত, তাই পরামর্শ দিতে বাধ্য হচ্ছি। কেউ ফলো না করে থাকে, ভাল কথা, কিন্তু তবু সতর্কতার খাতিরে দয়া করে এখনই মাইক্রোবাসটা লুকাবার ব্যবস্থা করো। বলা যায় না, কারও চোখে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে এটা।'

'আমাকে কাজ শেখাতে এসো না, শাকিলা!' বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠল বিল্লাহ রাগ সামলাতে না পেরে। 'নিজের চরকায় তেল দাও, দেখাশোনা করোগে যাও মেয়েটার!'

তীব্র ঘৃণা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের চোখের

দিকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল শাকিলা মির্জা। কটমট করে সেদিকে চেয়ে নিজের অজান্তেই বিড় বিড় করে জঘন্য ভাষায় গালি দিল বিল্লাহ শাকিলা মির্জার মা বাপ আর বোন তুলে। রাগ একটু কমতেই টের পেল ঠিকই বলেছে শাকিলা, যত দ্রুত সম্ভব গাড়িটা ঢুকিয়ে দেয়া দরকার কোন গ্যারেজে।

ফিরে এল টিশতি আর ড্রাইভার। 'এবার কি করতে হবে, ওস্তাদ?' জানতে চাইল টিশতি।

'এবার গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে,' বলল বিল্লাহ। 'আচ্ছা, গার্ডের কি বন্দোবস্ত। সাঈদ ছাড়া আর কে কে রয়েছে পাহারায়?'

'কোন চিন্তা নেই, ওস্তাদ। আরও চারজন আর্মড গার্ড রয়েছে কম্পাউন্ডে। তাছাড়া আমাদের মিস্ মির্জা একাই একশো। নিরাপত্তার ব্যাপারে কিচ্ছু ভাববেন না আপনি—সব ঠিক আছে।'

তবু একটু বিচলিত বোধ না করে পারল না বিল্লাহ। রাহাত খানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় কেন যেন এই ব্যবস্থাকে আর যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না ওর। তাছাড়া রানার ব্যবহারটাও কেমন যেন ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে ওর এখন। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সে—যারা মাসুদ রানার মত মেরুদণ্ডহীন একজন এক্স-এজেন্টকে ভাড়া খাটায়, যারা নিজের ডিপার্টমেন্টে যোগ্য লোক খুঁজে পায় না, তাদের নিয়ে অযথা ভয় করবার কোন অর্থ হয় না। তারচেয়ে এখন ঢাকায় ফিরে বদরুদ্দিনের কাছে রিপোর্ট দিয়ে একপেট খেয়ে ঘুম দেয়া অনেক ভাল। কাল সকালে এসে কথা বের করতে হবে এই মেয়ের কাছ থেকে।

'সব ঠিক থাকলেই ভাল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরস কণ্ঠে বলল সে। 'চলো তাহলে রওনা হয়ে যাই।'

গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল মাইক্রোবাস, ডাইনে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঢাকার পথে।

কাছেই একটা বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাশার পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো দিল রানা।

'এইবার।'

সাত

উদ্ভট আকৃতির দুটো এক ইঞ্চি মোটা নলের গ্যাস গান হাতে, আর বিদঘুটে

গ্যাস-মাস্ক মুখে পরে নিয়ে বাড়িটার বাম পাশে পাঁচিল ডিঙাল ওরা দু'জন নিঃশব্দে। দোতলার একটা জানালায় কেবল বাতি দেখা যাচ্ছে, তাছাড়া গোটা বাড়ি অন্ধকার। ভিতরে কয়জন লোক আছে বুঝবার উপায় নেই, তবে রানা আশা করছে ছয়জনের বেশি হবে না। যদি আরও লোক থাকে কিছু একটা বুদ্ধি বের করে নেবে সে তাদের কাবু করবার।

মীরপুর পৌছে কথা হচ্ছে রানার সোহেলের সাথে। অপেক্ষা করতে বলেছিল সোহেল, বলেছিল দু'জনে এতটা ঝুঁকি না নিয়ে উদ্ধার পর্বটা ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার দলবলের হাতে ছেড়ে দিতে; কিন্তু দেরি হলে ফেরি পাওয়া যাবে না, এই ওজুহাতে এক্ষুণি কাজে নামাই স্থির করেছে রানা পাশার সাথে পরামর্শ করে। ক্যাপ্টেন এসে পৌছবার আগেই কাজ সেরে ডেমরার কাছাকাছি পৌছে যেতে চায় ওরা।

ইতিমধ্যেই সুযোগ বুঝে না জেনে কটু কথা বলবার জন্যে মাফ চেয়ে নিয়েছে রাবেয়া মজুমদার রানার কাছে। রানা কোন কথা বলার আগেই একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠেছে পাশা: 'না, না, মাফ-টাফ হবে না। মাফ করতে পারব না কিছুতেই। মাসুদ ভাই কি ফকির নাকি যে মাফ করো বললেই মাফ করে দেবে? আমরা এমনিতেই আগে দেখছি—মাফ চাওয়ার কোন দরকার নেই।' নেমে গেল সে গাড়ি থেকে।

রানার প্রশস্ত কাঁধ চেপে ধরল রাবেয়া। 'প্লীজ! সাবধানে থাকবেন।'

হেসে উঠল রানা। পাশার কণ্ঠস্বর নকল করে বলল, 'সাবধান হওয়ারও কোন দরকার নেই। জখম-টখম হলে আপনি তো আছেনই!'

কথাটা কানে যেতেই জোরে হেসে উঠতে গিয়ে জিভ কাটল পাশা। দু'জন হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল একটা বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর দেখল রাবেয়া আবছা দুটো ছায়ামূর্তি এক-মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের উপর দিয়ে অবলীলায় ডিঙিয়ে চলে গেল ভিতরে।

একটা ঘন পাতা ছাওয়া কামিনী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিল রানা। গেটের কাছাকাছি মানুষের নড়াচড়ার আভাস টের পেল সে। আর কোথাও কিছু নেই। গেটের দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা: 'এটা তোমার। একে কাবু করে বাড়ির সামনে দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করবে তুমি। পিছন দিক থেকে জানালা ভেঙে ঢুকব আমি। ওই যে দোতলার জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে···আমার বিশ্বাস ওই ঘরেই পাওয়া যাবে মেয়েটাকে। আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি, ঠিক দুইমিনিট পর তুমি শুরু করবে তোমার অ্যাকশন।

মাথা ঝাঁকাল পাশা।

প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে ভেজা খসখসে ঘাসের উপর দিয়ে এগোল

রানা। চারদিকটা অন্ধকার, কিন্তু দিশে হারিয়ে ভুল দিকে চলে যাওয়ার মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। আবছা মত সবই দেখতে পাচ্ছিল সে, কিন্তু লনের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই আঁধার হয়ে এল চোখের সামনে। বাষ্প জমছে মাস্কের কাঁচে। ঠেলা দিয়ে মাস্কটা কপালের উপর তুলে দিয়ে দ্রুতপায়ে পেরিয়ে গেল সে লনটা, দেয়াল ঘেঁষে এগোল সন্তর্পণে। বাড়ির পিছনে যাওয়ার জন্যে শেষ কোনাটা ঘুরেই আঁৎকে ওঠা ঘোড়ার মত থেমে দাঁড়াল সে এক পা শূন্যে তুলে। স্থির হয়ে গেল মূর্তির মত।

দশ গজও হবে না, ওর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক—নিঃশব্দ, স্থির। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা। সামান্য একটু কুঁজো হয়ে চিতাবাঘের মত লাফ দিল সে সামনের দিকে। আবছা নড়াচড়ার আভাস পেয়েই পাঁই করে ঘুরল লোকটা এদিকে। হাঁটুর কাছে রানার একটা লাথি খেয়ে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ওর। মাটিতে আছড়ে পড়তে গিয়ে চাপা একটা আর্তনাদ বেরোল ওর মুখ থেকে। একসাথেই পড়ল দু'জন মাটিতে। চার হাত-পা সমানে ছুঁড়তে শুরু করল লোকটা। মাটিতে পড়বার আগেই লোকটার নাকের উপর দমাদম দুটো বেমক্কা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে রানা, এইবার টিপে ধরল গলা। আছড়ে-পাছড়ে রানার হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করল লোকটা, ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে চোখ, দুই হাতে গলা থেকে রানার হাত সরাবার চেষ্টা করল, সেদিকে সুবিধে না করতে পেরে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি চালাল রানার মাথা লক্ষ্য করে। পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল লোকটা, আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঢিল হয়ে গেল ওর শরীর। ভান করছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও কিছুক্ষণ টিপে রাখল রানা ওর গলাটা, তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলাল চারপাশে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ বা নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে দ্রুতপায়ে উঠে গেল সে সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির পিছন দিকের বারান্দায়।

সামনেই একটা দরজা, ভিতর থেকে বন্ধ। কপাট খুলবে ভিতর দিকে। মৃদু ঠেলা দিয়ে ছিটকিনির অবস্থান বুঝে নিয়ে কারাতে ফাইটারের মত লাফিয়ে শূন্যে উঠে প্রচণ্ড এক কিক্ মারল রানা ছিটকিনি বরাবর। ঠিক এমনি সময় দূর থেকে একটা চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এল, পর মুহূর্তে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল এটা একটা ডাইনিং রুম। সামনেই আর একটা ভিড়ানো দরজা দেখা যাচ্ছে। আন্দাজ করল, দরজার ওপাশে হলরুম। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতে যেতেই কপাট ফুটো হয়ে রানার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। ঝপ করে বসে পড়ল রানা, চট করে একহাতে টেনে জায়গামত বসিয়ে নিল

গ্যাস মাস্কটা, পরমুহূর্তে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। মাস্কের কাচের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা, শ্বাস নিতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে, সেই অবস্থাতেই সামনের হলরুমের দিকে তাক করে টিপে দিল সে গ্যাস গানের ট্রিগার।

ভুশ করে শব্দ হলো। মুহূর্তে সাদা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল গোটা হলরুম।

দ্রুতপায়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল একজন। হাতে পিস্তল। হোঁচট খেলো, ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল একবার, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে এল নিচে। সিঁড়ির মুখে মুখ থুবড়ে পড়েই জ্ঞান হারাল সে। ঘরে ঢুকল রানা। লোকটার শরীর টপকে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়া গ্যাসগান বয়ে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না, তাই হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা ওটা। কয়েক ধাপ নেমে এসে গার্ডের হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা তুলে নিল কার্পেটের উপর থেকে। আর কয়জন গার্ড রয়েছে কে জানে! দোতলায় উঠে সিঁড়ির মুখেই দু'দিকে দরজা পেল সে। কোন্‌দিকে যাবে স্থির করে নিল সে তিন সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে। যেদিকটায় যাবে না, সেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সাবধানে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল। সাঁই সাঁই করে ধোঁয়াটে গ্যাস ঢুকতে শুরু করল দরজার ফাঁক গলে। রানা জানে, শ্বাসের সাথে সামান্য গ্যাস বুকে ঢুকতে পারলেই জ্ঞান হারাবে যেকোন লোক। দরজাটা আরও খানিক ফাঁক করে দিয়ে অপেক্ষা করল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর সাবধানে চোখ রাখল সে ফাঁকে। ঘরের মধ্যে নড়াচড়ার কোন আভাস নেই বুঝতে পেরে ভিতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল রানা। গেস্টরুম একটা। কেউ নেই। পিছন থেকে আক্রমণ আসবে না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার সিঁড়ি-মুখের দ্বিতীয় দরজার হাতল ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁক করল সে।

'মাসুদ ভাই।' গোলাম পাশার কণ্ঠস্বর ভেসে এল নিচ থেকে। এসে গেছে সিঁড়ির গোড়ায়।

'এই যে, আমি ওপরে!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'তুমি নিচতলাটা ভাল করে দেখো আরও কেউ আছে কিনা, আমি দেখছি ওপরতলা।'

এপাশের দরজা পেরোলেই প্যাসেজ। ঢুকে পড়ল রানা ভিতরে। পাশাপাশি পর পর তিনটে বন্ধ দরজা দেখতে পেল সে। প্রথম দরজাটা খুলেই টের পেল, ওটা একটু আগে দেখা গেস্টরুমেরই দ্বিতীয় দরজা। কেউ নেই। হলরুমের ঘন ধোঁয়া উঠে এসেছে প্যাসেজে—কাজেই পরের দরজাটা খুলে দিয়েই তৃতীয় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। এই ঘরেই আলো দেখেছিল সে নিচ থেকে—এখন অন্ধকার। সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখল রানা দরজার

ফাঁকে।

মাসুদ ভাই—ডাকটা কানে যেতেই দপ্ করে জ্বলে উঠেছে শাকিলা মির্জার চোখ জোড়া। তবে কি এতদিনে সত্যিই হাতে পেল সে মাসুদ রানাকে? অ্যাসিডের বোতল ছুঁড়ে মারার দৃশ্যটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। আজ থেকে চার বছর আগে এই মাসুদ রানাই ছুঁড়েছিল বোতলটা—গুজরানওয়ালা ক্যাম্পে* । প্রতিহিংসায় ধকধক করে জ্বলে উঠেছে শাকিলা মির্জার চোখ। এক হাতে নাকে ভেজা রুমাল চেপে ধরে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল সে। অপর হাতে লোডেড পিস্তল।

দরজা ফাঁক করতেই রানার আগে আগে ঘরে ঢুকল ধোঁয়াটে গ্যাস। নাকে রুমাল চাপা থাকলেও পরিষ্কার টের পেল শাকিলা, অল্পক্ষণেই অবশ হয়ে যাবে ওর শরীর গ্যাসের আক্রমণে। দম বন্ধ করে রাখল সে বেশ কিছুক্ষণ, যখন বুঝল আর চেপে রাখা যাবে না, এলোপাতাড়ি পা ফেলে এগোল সে দরজার দিকে।

পায়ের শব্দ পেল রানা। খুক্ করে ছোট্ট একটা কাশির আওয়াজ পেল। দড়াম করে লাথি মারল সে কপাটের গায়ে। আঁৎকে উঠল ঘরের ভিতর কেউ। বুম করে গুলি ছুটে গিয়ে লাগল ঘরের ছাতে। আগুনের ফুলকি দেখেই লাফ দিল রানা। খপ করে কব্জি চেপে ধরেই মোচড় দিল। দ্বিতীয় গুলি একটা কাঁচের জানালা চুর করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটানে ভেজা রুমালটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে রাবারের মুখোশসহ টেনে খসিয়ে আনল রানা। বাম হাতে রানার চোখ খুবলে নেয়ার শেষ চেষ্টা করল শাকিলা। ঝট করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে কনুই চালাল রানা শাকিলার পেট বরাবর। পেটে গুঁতো খেয়ে আটকে রাখা বাতাস বেরিয়ে গেল শাকিলার বুক থেকে, হাঁ করে দম নিল সে, পরমুহূর্তে ঢলে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

ঘরের বাতি জ্বেলেই চমকে উঠল রানা শাকিলার বীভৎস মুখ দেখে। মানুষের মুখের চেহারা যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে কল্পনাও করা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল গোলাম পাশা। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ওর: 'ইয়াল্লা!' বিস্ফারিত চোখে শাকিলার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'এ যে মেয়েমানুষ দেখছি, মাসুদ ভাই!'

'এর নাম শাকিলা মির্জা,' নিচু গলায় বলল রানা, অনেকটা যেন আপন মনে। চিনতে পেরেছে সে। 'ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ। কিন্তু এর এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী ভাবতে রাগ লাগছে এখন নিজের ওপর। অবশ্য উপায় ছিল

---

* রানা ২৫-২৮ বিপদজনক দ্রষ্টব্য

না আমার। ওর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া বোতলটায় যে এসিড ছিল, জানতাম না আমি। তবু নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না, আমি এর কথা ভাবলে। হঠাৎ সচকিত হয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে। 'আর কাউকে পেলে নিচে?'

'সন্ধান পাইনি। আমি তিনটেকে সাবড়েছি, আপনি একটা—এটাকে ধরলে দুটো। তবু এক গোলে এগিয়ে আছি।'

'তার মানে বাইরের কম্পাউন্ড দেখোনি। চট্ করে একচক্কোর ঘুরে দেখো। কাউকে না পেলে গাড়িটা নিয়ে এসো ভেতরে, আমি মেয়েটাকে নিয়ে নামছি।'

একটা বিছানায় শোয়া ঘুমন্ত হাস্না কাওসারের দিকে চাইল পাশা। প্রশংসা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। 'বাহ্, চমৎকার তো দেখতে! একেবারে রাজ-কপাল আপনার, মাসুদ ভাই। যে ব্যাটা হিংসে না করবে সে ব্যাটা মানুষ না—অতিমানব। একেই বলে লাক!' আর একবার ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

তিন মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওয়া ডেমরার পথে।

কপাল ভাল, পেয়ে গেল শেষ ফেরি।

'স্লামালেকুম! আসতে পারি?'

খুব ভোর থেকেই কাজ করছে আজ ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। চট্ করে ফাইল থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে চাইল, তারপর চাইল ঘড়ির দিকে। এখন বাজছে সাতটা পঞ্চান্ন। এখনও যথেষ্ট সকাল। এত সকালে হঠাৎ কেন এসে হাজির হলো এই লোকটা?

অনেকের বিরুদ্ধে অজস্র নালিশ নিয়ে এসেছিল লোকটা বেশ কয়েক মাস আগে। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করে দেখে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছে হপ্তাখানেক আগে। লোকটার গায়ে পড়া ভাব, মতলববাজ হাসি, আর সবার বিরুদ্ধে অনর্গল বিষোদগার ও কোটনামী অসহ্য হয়ে উঠেছে আতিকুল্লার কাছে। কি শিক্ষা দিচ্ছে এই লোক ছাত্রদের? অধ্যাপক! বন্ধুর আত্মীয় না হলে কান ধরে বের করে দিত কবে! ওর প্রতিটা নালিশের সূত্র ধরে তিন কদম ফেলবার আগেই মন বিষিয়ে যায় ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ধে। নিজের সামান্য সুবিধের জন্যে অন্যের সর্বনাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই লোকটার। ওকে দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার।

'আসুন, রাফিক সাহেব,' জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে আনল ক্যাপ্টেন। 'এত সকালে...হঠাৎ কি মনে করে? সাতদিনে তো আপনার রিপোর্ট শেষ

হওয়ার কথা নয়?'

'শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি,' একগাল হেসে বলল রাফিকুল হক। বাড়ি থেকে বহুবার রিহার্সেল দিয়ে এসেছে সে কথাগুলো। 'ছুটিটা ওখানেই কাটাব ঠিক করলাম। ওখানে বসেই কমপ্লিট করব রিপোর্টটা! বেশ কিছুটা লেখা হয়ে গেছে অবশ্য, ঠিক হচ্ছে কিনা দেখাবার জন্যে নিয়ে এলাম প্রথম দিকের কয়েকটা পাতা। আপনি খুব ব্যস্ত নাকি?'

ভিতর ভিতর ঘেমে উঠেছে রাফিকুল হক। ব্যস্ত থাকলেই বাঁচা যায়। কোনমতে কাজটা সেরে ভালয় ভালয় কেটে পড়তে পারলে হয় এখন। ব্রিফকেস থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে ফেলেছে সে কথা বলতে বলতে। সেই সাথে লিপ্সেট মাইক্রোফোনটা চলে এসেছে ওর ডান হাতের ঘর্মাক্ত মুঠির ভিতর।

বিজিবিজি করে লেখা কাগজ দেখেই কলজে শুকিয়ে গেল আতিকুল্লার। এখন যদি এইসব ছাইপাশ পড়তে হয়, তাহলেই গেছে সে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি। মাসুদ রানার নির্দেশ মত কাল মীরপুরের সেই বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। ঘন্টাখানেক প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যে কাটাবার পর পাশার কাছ থেকে খবর এসেছে—প্রথম ফেরি পার হয়ে ছুটে চলেছে ওরা দাউদকান্দির দিকে। মেয়েটাকে উদ্ধার করা হয়েছে জেনে বেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছে সে, কিন্তু ওরা নিরাপদে কক্সবাজার না পৌঁছানো পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কিছুতেই। হাজার হোক, গোটা অপারেশনের গোড়ায় রয়েছে সে। সেই ইনিশিয়েটার। কাজটা সুসম্পন্ন হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করছে সে, জানা যাবে ওদের খান ভিলায় গিয়ে পৌঁছানোর সংবাদ। সমস্ত মন পড়ে রয়েছে ওর ওইদিকে।

'ব্যস্ত?' ভয়ে ভয়ে চাইল ক্যাপ্টেন কাগজগুলোর দিকে। 'তা, হ্যাঁ, কাজের চাপ তো আছেই। সত্যি বলতে কি, খুবই ব্যস্ত আছি আমি। কয়েকটা জরুরী টেলিফোন আশা করছি। এসব আমার দেখার কোন দরকার নেই···আপনি প্রফেসার মানুষ, আপনার লেখার আমি কি ভুল বের করব?'

'তবু একবার যদি চোখ বুলাতেন, হয়তো···' শার্টের হাতায় কপালের ঘাম মুছল রাফিকুল হক। 'না হয় আমিই পড়ে শোনাতে পারি।'

'কোন দরকার নেই,' বাম হাত আর মাথা একসাথে নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'শেষ করুন, একবারে দেখব সবটা।'

ব্রিফকেসটা দুই পায়ের ফাঁকে মেঝের উপর নামিয়ে রেখেছিল রাফিকুল হক, নিচু হয়ে তুলে নিল হাতে। সেই সুযোগে পিছন দিকে আঠা লাগানো লিম্পেট মাইক্রোফোনটা টিপে সাঁটিয়ে দিল সে ডেস্কের নিচে। ঢিব ঢিব হাতুড়ি পিটছে বুকের ভিতর—যখন সোজা হয়ে বসল, মনে হলো শুনতে পাচ্ছে কান

দু'টো। দ্রুত কাঁপা হাতে কাগজগুলো ভরে ফেলল সে ব্রিফকেসের ভিতর।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আতিকুল্লার দৃষ্টি।

'শরীর খারাপ নাকি আপনার?'

রুমাল বের করে ঘাড়ে-মুখে বুলিয়ে ঘাম মুছল রাফিকুল হক। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'না, না। মোটা মানুষ—ঘাম একটু বেশি হয়। উঠি তাহলে। হপ্তা তিনেক পর আসছি আবার। স্লামালেকুম।'

রাফিকুল হক বেরিয়ে যেতেই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ভুরু জোড়া কুঁচকে রইল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার। কেন এসেছিল লোকটা? এই সাত-সকালে তেড়ে এসেছিল রিপোর্ট পড়াবার জন্যে? ওর নিজের কাছে ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়—রিপোর্ট তৈরি হলে সেটা হয়তো পড়ে দেখবারও সময় পাবে না সে, হয়তো সবসুদ্ধ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে, কিন্তু রাফিকুল হকের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ওর ধারণা এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারতে যাচ্ছে সে এই রিপোর্টের মাধ্যমে। তাই কি এই ব্যগ্রতা? কিন্তু পড়ে দেখার জন্যে তেমন চাপাচাপি তো কই করল না!

যাকগে, এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই আসলে ওর। রিসিভারটা কানে তুলে অপারেটারকে বলল, 'চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সাহেবকে দাও।'

সাদা একটা ফিয়াট সিক্স হানড্রেড দাঁড়িয়ে আছে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটা ব্যস্ত সড়কের চৌমাথার কাছে। সাদা পোশাক পরা ট্রাফিক পুলিশ হুইসেল দিল গাড়িটাকে উদ্দেশ্য করে, ড্রাইভারকে নেমে এঞ্জিনের বনেট খুলতে দেখে এগিয়ে এল—এইখানে গাড়ি থামানো নিষিদ্ধ।

'আগে বাড়ায়া রাখেন গাড়ি···সামনে লইয়া যান, এইখানে রাখতে পারবেন না, স্যার।'

পাংশুমুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল আলমগীর।

'র‍্যাডিয়েটারে টগবগ করে ফুটছে পানি। প্লাগেও তেল এসে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্লিন করে নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'এক মিনিটও না!' কড়া গলায় ধমক দিল সেপাই। 'লোক দিয়া ধাক্কায়া লোইয়া যান সামনে। এইখানে রাখা যাইবো না, স্যার।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করল কবিতা। মিষ্টি হাসিতে মুগ্ধ করে দিল সিপাইকে।

'দু'টো মিনিট সময় দিন, ভাই। বিপদে পড়ে গিয়েছি।'

সুন্দরী মহিলা বিপদে পড়েছে—গলে গেল সিপাই সাহেব। মহিলার কানে ডেফ এইড রয়েছে দেখে একটু অবাক না হয়ে পারল না সে। সাধারণত

বুড়ো মানুষ ছাড়া আর কাউকে এসব ব্যবহার করতে দেখা যায় না। যাই হোক, এক পা পিছিয়ে মহিলাকে আরেক নজর ভাল করে দেখে নিয়ে অনুমতি দিল সে আলমগীরকে।

'ঠিক আছে। পেলাগ পরিষ্কার কইরা জলদি রাস্তা ছাড়েন। সার্জেন আইয়া পড়লে মুসিবতে পড়বেন।'

নিজের কাজে ফিরে গেল ট্রাফিক পুলিস। এঞ্জিনের উপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ল আলমগীর।

কবিতার এয়ারফোন সরু তারের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছে সীটের নিচে রাখা একটা শক্তিশালী রিসিভিং সেটের সাথে। পর পর কয়েকটা টেলিফোন এল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার ঘরে। মন দিয়ে শুনল কবিতা প্রতিটা কথা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। এয়ারফোনটা খুলে ডাকল সে আলমগীরকে।

'হয়েছে, চলো এবার।'

এঞ্জিনের ঢাকনি নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল আলমগীর। উয়ারির পথে ছুটল গাড়ি। গাড়ি চালাতে চালাতে চট করে পিছন ফিরে চাইল একবার আলমগীর। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে কবিতা।

'কি হলো? চুপ হয়ে গেলে যে? জানা গেল ঠিকানা?'

'কক্সবাজার নিয়ে গেছে। শহর থেকে তিন মাইল দূরে মেজর জেনারেলের "খান ভিলা"য়। আজই দুপুরের ফ্লাইটে রওনা হতে হবে আমাদের।'

'আমাদের মানে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল আলমগীর। 'আমি যাব কি করে? ছুটি পাওনা নেই—চাইলেও পাব না। তোমার তো যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আমারও যাওয়ার কোন দরকার নেই। নিজামকে ওই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

'কখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয় বলা যায় না। ও একা সামলাতে পারবে না। আমাদেরও থাকতে হবে সাথে। একবার পার পাওয়া গেছে, কিন্তু এবার সফল না হলে মহাবিপদ ঘনিয়ে আসবে তোমার মাথার ওপর। ছুটি পাওনা না থাকে, মেডিকেল লিভের একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও অফিসে। আজই দুপুরে রওনা হচ্ছি আমরা।'

তর্ক করবার জন্যে হাঁ করল আলমগীর, কি ভেবে মুখ বন্ধ করে ফেলল আবার।

আসলে সেই [illegible] [illegible]। হঠাৎ চোখ-কান খুলে গেছে ওর। চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেছে যেন। নতুন আলোকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখছে সে জগৎটাকে। কাল রাতে কবিতার ড্রয়ার ঘেঁটে কয়েকজনের সাথে নোংরা ভঙ্গিতে তোলা অনেকগুলো ছবি পেয়েছে সে।

গভীর রাতে পা টিপে পাশের ঘরে নিজামের বিছানায় যেতে দেখেছে সে কবিতাকে। যদিও এঘর থেকে কাশি দিতেই ফিরে এসেছে সাথে সাথে, কিন্তু গিয়েছিল।

আরও রহস্যময়, আরও দুর্বোধ্য আরও আধুনিক হয়ে উঠেছে কবিতা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, এতদিন প্রেমের অভিনয় করেছে কবিতা ওর সাথে। একই সাথে আরও অনেকের সাথেই চালিয়েছে এই একই অভিনয়।

ভুল করেছে, মস্ত ভুল করেছে সে কবিতার কুহকে ভুলে।

আট

কক্সবাজার এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিল রানা গোলাম পাশাকে। সকালের ফ্লাইটেই ফিরে যাবে সে ঢাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে গেল সে গাড়ি থেকে। টাটা করে ঢুকে গেল এয়ারপোর্ট ভবনে।

এই আড়াইশো মাইল চলতেই বার দুয়েক চাকা লিক হয়েছে ডাটসানের, স্পেয়ার হুইলের বদৌলতে যদিও বেশিক্ষণ আটকাতে হয়নি কোথাও, কিন্তু ঝাড়া দুটো ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে কক্সবাজার পৌঁছতে। প্রতি ঘণ্টায় একবার করে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে ওদের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রেখেছে পাশা ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ্ এবং সোহেল আহমেদকে। আর কোন গোলমালের আশঙ্কা না থাকায় সকালের ফ্লাইটেই ঢাকায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সোহেল গোলাম পাশাকে। বিমান বন্দরে ওকে নামিয়ে দিয়ে খান ভিলায় গিয়ে উঠবে রানা হাস্না কাওসার এবং নার্স রাবেয়া মজুমদারকে নিয়ে।

রাবেয়াকে পি. জি. হাসপাতালের সামনে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল রানা মীরপুর থেকে ফেরার পথে। প্রথমে রাবেয়া, তারপর পাশা এবং সবশেষে সোহেলের অনুরোধে নিয়ে এসেছে সাথে করে। হাস্না কাওসারের নার্সিং দরকার হতে পারে। রাবেয়ার কক্সবাজার যাওয়ার আগ্রহ দেখে হেসেছে রানা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা জীবনে ঘটেনি ওর। হাস্না, মাসুদ রানা, এবং প্রতিপক্ষ বিল্লাহ সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে সে এক ঘণ্টার মধ্যে: জেনে ফেলেছে, সবার চোখের আড়ালে কি প্রচণ্ড কর্মতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বলে এক দারুণ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জানতে পেরেছে, পাকিস্তানীরা তথ্য আদায় করতে চায় হাস্না কাওসারের কাছ থেকে, ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একবার, কোথায়

সরিয়ে নেয়া হয়েছে জানতে পারলে আবার আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করবে না। কথায় বার্তায় টের পেয়েছে ভারতীয়রাও লিপ্ত রয়েছে গোপন তৎপরতায়: আজ সন্ধের পর নাকি ছুরি মারা হয়েছে পি. জি.-র এক নার্সকে. সোহেল আহমেদের ধারণা এটা ভারতীয় তৎপরতার নমুনা। অর্থাৎ তিন দেশের তিনটে গোপন সংস্থার এক জমজমাট খেলা চলেছে। কি তথ্য রয়েছে হাস্না কাওসারের কাছে, কে জানে! সত্যিই স্মৃতি ফিরে আসবে কিনা, এলে কিভাবে গ্রহণ করবে সে নকল স্বামী মাসুদ রানাকে, কেউ জানে না। এতটা জেনে ফেলবার পর মাঝপথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইলেই খুশি মনে নেমে যাওয়া যায় না। শেষ দেখতে চায় রাবেয়া এই আশ্চর্য গতিশীল নাটকের। ঠিক আছে, দেখুক না, রানার অসুবিধে কোথায়?

পাশা নেমে যেতেই পিছন ফিরে ঘুমন্ত হাস্নাকে ধরে বসে থাকা নার্সের দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'কি অবস্থা?'

'একই রকম,' মৃদু হেসে জবাব দিল রাবেয়া। 'একে বিছানায় শুইয়ে দেয়া দরকার যত শীঘ্রি সম্ভব।'

'আর দেরি নেই। আর মাত্র তিনমাইল।' ঘুমন্ত মুখটা পরীক্ষা করল রানা। 'দারুণ! তাই না? আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটা।'

'হ্যাঁ।'

রানার চোখের উপর স্থির হয়ে রইল রাবেয়ার দৃষ্টি।

'এতক্ষণ খেয়ালই করিনি যে এত ভাল দেখতে! এই জন্যেই হিংসেয় জান বেরিয়ে যাচ্ছিল পাশার, ফোঁসফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল বারবার।' খুশি মনে হাসল রানা। 'কপালটা সত্যিই ভাল দেখছি!'

কোন জবাব দিল না রাবেয়া।

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে ডানদিকে একটা খোয়া বিছানো রাস্তায় পড়ল গাড়ি। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো পাহাড়ী পথ, দু'পাশে জঙ্গল। মাঝে মাঝে সমুদ্রের আভাস দেখা যাচ্ছে ডানদিকে ঝোপঝাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে। এই রাস্তা ধরে মাইল দুয়েক গেলে ছোট ছোট টিলার মাথায় দূরে দূরে বাংলো প্যাটার্নের কয়েকটা বাড়ি আছে, জানে রানা। চতুর্থ বাড়িটা 'খান ভিলা।' পিছনে উঁচু পাহাড়, সামনে উন্মুক্ত সাগর। অবসর বিনোদনের জন্যে চমৎকার।

পর পর তিনটে সাইড রোড ছেড়ে চতুর্থটায় ঢুকে পড়ল রানা। টিলার গা বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা আড়াই প্যাঁচ খেয়ে একেবারে মাথায়। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকায় বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না নিচে থেকে। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে উঠে এল রানা উপরে। লোহার পাত মোড়া একটা বিশাল কাঠের গেট। বন্ধ।

নেমপ্লেট নেই কোথাও।

'একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গ মনে হচ্ছে!' আপন মনেই বলল রানা। হর্ন বাজাল পর পর তিনবার।

প্রায় সাথেই গেটের গায়ে বসানো একটা ছোট্ট জানালা খুলে গেল। অল্পবয়সী এক কোঁকড়া চুলো মাথা দেখা গেল সেখানে।

'এটা কি খান ভিলা?' জিজ্ঞেস করল রানা গাড়ি থেকে নামতে নামতে।

'আপনি কাকে চান?' পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমি মাসুদ রানা। এই নামের কোন লোকের আসার কথা আছে?'

'পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

হিপ পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দিল রানা। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই লাইসেন্সটা ফেরত দিল লোকটা, অদৃশ্য হয়ে গেল মাথা। কয়েক সেকেন্ড পর হড় হড় শব্দ তুলে খুলে গেল গেট। গাড়িতে উঠে পড়ল রানা। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে লক্ষ করল গেটের দু'পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন সশস্ত্রপ্রহরী।

গেটের কাছেই একটা ছোট্ট পাকা ঘর। সেই ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাগড়া চেহারার এক হাবিলদার মেজর—এক হাতে চায়নিজ স্টেন, অপর হাতে ধরা রয়েছে ভয়ঙ্কর দর্শন এক কুকুরের গলার চেন। নতুন মানুষ দেখে গোটা দুই কলজে কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা।

রানাকে নামতে দেখে হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল হাবিলদার মেজর শামসুদ্দিন।

'ভেতরে চলে যান, স্যার। কাল সন্ধে থেকে ওয়েট করছি আপনার জন্যে।'

'কতজন?'

'মোট ছয়জন আছি আমরা। কোন চিন্তা নেই, স্যার। কারও সাধ্য নেই কোন গোলমাল করে। এক ব্যাটেলিয়ান এলেও সমান করে দেব মাটির সাথে। সোজা চলে যান—ওই বাঁশ ঝাড়ের ওপাশেই ভিলা।'

গাড়ির কাছে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে হাসনা কাওসারকে দেখল হাবিলদার, দৃষ্টি সরে স্থির হলো নার্সের মুখের উপর, প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল একপাশে। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে রাবেয়া মজুমদার, হালকা করে নাক টানল, তারপর চোখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

বাঁশ ঝাড়ের গা ঘেঁষে মোড় নিয়েই দেখতে পেল রানা বাড়িটা। মনে হচ্ছে পাহাড় কেটে তার গায়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়িটাকে। পাকা বাড়ি, দোতলা। দোতলায় প্রশস্ত একটা রেলিং ঘেরা ছাতখোলা ব্যালকনি পাতাবাহারের টব দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র—

পৃথিবীর এই তিন মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে ওই ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে বসলে।

গাড়ি বারান্দায় থেমে দাঁড়াল ডাটসান। লম্বা একজন সাদা উর্দি পরা লোক গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সালাম জানাল কোমর বাঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে।

'সালাম, হুজুর।'

'ওয়ালেকুম সালাম। কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা নামতে নামতে।

'অহিদোরর্অন।'

নামেই বুঝে নিল রানা লোকটার পরিচয়। চট্টগ্রামের লোক। মুসলমান।

'আচ্ছা! ওয়াহিদুর রহমান। বেশ। আমাদের জন্যে কোন্ ঘরের ব্যবস্থা করেছ? নিচে না উপরে?'

'উফরে, হুজুর।'

'ঠিক আছে। তুমি চট্ করে নাস্তার বন্দোবস্ত করো দেখি, ঘর আমরা খুঁজে নেব।' ধরাধরি করে গাড়ি থেকে বের করল রানা হাসনা কাওসারকে রাকেশার সাহায্যে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল দুই হাতের উপর। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছয়জনের নাস্তা রেডি করে নিয়ে এসো ওপরে।'

'ছয়জন!' চোখ কপালে উঠল ওহিদোরঅ্নের।

'হ্যাঁ। খাব আমরা দু'জনে, কিন্তু নাস্তা লাগবে ছয়জনের—খুব ক্ষিদে। জলদি।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল রানা।

গোসল সেরে, তিনজনের নাস্তা একা খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে এক হাতে কফির কাপ, অপর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে যোগাযোগ করল রানা ঢাকার সাথে।

'উফ্! বড় জব্বর বাড়ি কিনেছে, দোস্ত, বুড়ো মিঞা। সত্যিই, রুচির তারিফ করতে হয়!'

'বাজে কথা রাখ্,' ধমক দিল সোহেল। 'মেয়েটার কি অবস্থা?'

'সেই একই। কবে, কখন জ্ঞান ফিরবে বোঝা যাচ্ছে না, খালি শ্বাস টানছে আর ছাড়ছে—চোখ খোলে না।'

'ডাক্তার দেখানো দরকার মনে করিস?'

'আমি কিছুই মনে করি না। নার্স বলছে দরকার নেই। এখন তোর যা খুশি।'

'কিন্তু এই অবস্থাতেই যদি পার করে দেয় সাতদিন?'

'আমার ক্ষতি কি? আরামসে বুড়োর অন্ন ধ্বংস করব, সকালে সাঁতার কাটব সাগরে, বিকেলে ঘুম সেরে বেড়াব পাহাড়ে, রাতে তারা গুণব খোলা

আকাশের নিচে ব্যালকনিতে শুয়ে।'

'কেন নার্সটা বুড়ি নাকি?'

'বুড়ি হতে যাবে কেন? দেখতেও ভাল। তবে বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মত—জটিল, আদর্শবাদী টাইপ। অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়।'

'ঠিক আছে, দেখ তুই, দেখতে থাক। কি হয় জানাস। আপাতত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে কি মনে হচ্ছে তোর? সাফিশিয়েন্ট?'

'এই মাত্র নাস্তা খেয়ে উঠলাম। খানিক রেস্ট নিয়ে নামব নিচে। ঘুরেফিরে না দেখে এই মুহূর্তে কোন মতামত জানাতে পারছি না। ভাল কথা, দু'দুটো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলাম—এক কাপড়ে। এদের জামা কাপড়-প্রসাধনীর কি ব্যবস্থা?'

'তোর বউ আর তোর বউয়ের নার্স···আমি কি করে বলব কি পরাবি ওদের? যা লাগবে কিনে দিবি। দু'হাজার টাকা কি তোকে হোয়াইট হর্স খেতে দিয়েছি নাকি, শালা? নাকি ভেবেছিস, নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিবি ব্যাঙ্কে? যা লাগবে খরচ করবি।'

'আমি চাটগাঁর এতবড় ব্যবসায়ী···খরচের হাতটাও বড় হওয়াই স্বাভাবিক। দু'হাজারে কি হবে? ও তো দুটো শাড়িতেই বেরিয়ে যাবে।'

'দেখো, শ্যালক, এটা সি আই এ পাওনি যে বোল্‌বোলতেই লাখ লাখ ডলার এসে যাবে। দু'হাজারে চল্লিশটা ভাল শাড়ি পাওয়া যায়। যদি এতে না কুলায় ওহিদোরনের ভাই আবিদোরনকে বলবি। খান ভিলার দারোয়ান। ওর অ্যাকাউন্টে বসের হাজার দশেক টাকা আছে। ওকে বলে রাখা হয়েছে, লাগলে তুলে দেবে।'

'অলরাইট। ডেকে পাঠাচ্ছি ব্যাটাকে। ওদিকে আর কোন নতুন খবর আছে?'

'এখনও নেই। হলেই সাথে সাথে জানানো হবে তোকে। রাখি এখন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, দরজায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে রাবেয়া মজুমদার।

'কে আপনার বাংলা উপন্যাসের নায়িকা—দেখতে ভাল, কিন্তু···'

'আড়ি পাতা হয়েছিল বুঝি?'

'দুনিয়া ফাটানো চিৎকার কানে গেলে সেটাকে আড়ি পাতা বলে না। জামা-কাপড়ের কথা শুনে সামনে এলাম। সত্যিই, আমার পেশেন্টের জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় খুবই দরকার।'

'আপনার নিজের জন্যেও দরকার।'

'আমার না হলেও চলবে, কোনমতে চালিয়ে নিতে পারব, কিন্তু···'

'কার্পণ্য করবার কোন অর্থ হয় না। একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলুন।

তারপর দারোয়ানকে নিয়ে সোজা শহরে গিয়ে কিনে আনুন যা যা লাগবে। কঞ্জুসি করতে যাবেন না, টাকার অভাব নেই, মন খুলে ঝেড়ে লিস্ট করুন। মনে রাখবেন, আপনি এখানে বাংলাদেশের একজন সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি।'

'আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি, আলমগীর,' একঘেয়ে বিরস কণ্ঠে বলল যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী। 'ব্যর্থতার কথা শুনলে খেপে যাবে নয়াদিল্লী। এতক্ষণে হান্না কাওসারের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল নয়াদিল্লীতে। ওরা আমার সংবাদের অপেক্ষায় রয়েছে।'

'কালই কাজ শেষ হয়ে যেত,' বলল আলমগীর 'দেরিটা আমার দোষে হয়নি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স যে মাঝখান থেকে গোলমাল বাধিয়ে বসবে সেটা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারিনি। যাই হোক, এটুকু তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে খুব তাড়াতাড়িই বের করে ফেলেছি আমরা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে।'

যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর ভাল করেই জানা আছে এই ব্যাপারে কৃতিত্ব আসলে কার। পলকের জন্যে প্রশংসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে সোফার হাতলে বসা কবিতা রায়ের দিকে। আড়চোখে একবার ঘরের কোণে পিছন ফিরে বসে থাকা পিস্তল পরিষ্কার করায় ব্যস্ত নিজামের দিকে চাইল। তারপর কথাটা যাতে তার কানেও পৌঁছায়, সেজন্যে গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে বলল, 'আগে থেকেই বলে রাখছি, এটাই শেষ সুযোগ। এবার আর ব্যর্থ হলে চলবে না। কোন কৈফিয়তই বরদাস্ত করা হবে না আর। যাই হোক, রওনা হচ্ছ কখন?'

'দুপুরের ফ্লাইটে টিকেট বুক করা হয়েছে ঢাকা টু চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে গাড়িতে কক্সবাজার।'

'সরাসরি কক্সবাজারের টিকেট পাওয়া গেল না?'

'পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কাল সকালে...'

'চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে?'

'হয়নি, কিন্তু হয়ে যাবে। ওখানে আমার এক বন্ধুর গাড়ি আছে। ট্রাংকল বুক করে রেখেছি...গাড়ি পাওয়া যাবে, অসুবিধে হবে না।

কবিতার দিকে ফিরল এবার যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আতিকুল্লার ঘরে মাইক্রোফোন পাওয়া যাবে। রাফিকুল হকের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়বে। চাপের মুখে সব স্বীকার করে বসবে লোকটা। ওকে তোমার আর দরকার আছে?'

'ধরা পড়ে গেলে দরকার নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল কবিতা। 'যদি ধরা না পড়ে তাহলে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা যাবে হয়তো।'

'ধরা পড়ে কিনা দেখে তারপর ব্যবস্থা নিতে বলছ?'

'সম্ভব হলে সেটাই সবচেয়ে ভাল হয়।'

'দেখি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী। 'ওকে রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না, তবু দেখব আমি শেষ পর্যন্ত।' উঠে দাঁড়াল। 'আবার একবার সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাদের সবাইকে। আর যেন কোথাও কোন ভুল না হয়। ভুলের পরিণতি হবে মারাত্মক।'

বেরিয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী। বাইরে অপেক্ষমাণ একটা গাড়িতে উঠে বসতেই চলতে শুরু করল গাড়িটা। থামল গিয়ে ধানমণ্ডির সতেরো নম্বর রোডের একটা দোতলা বাড়িতে। নিজের অফিস কামরায় ঢুকে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিল গাঙ্গুলী। নিচু গলায় কয়েকটা নির্দেশ দিয়েই নামিয়ে রাখল রিসিভার।

যার সম্পর্কে এই নির্দেশ জারি হলো সেই অধ্যাপক রাফিকুল হক টাঙ্গাইল ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে এখন মধুপুরের দিকে। বিলেত থেকে আনা অস্টিন এ-ফরটি গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে মনে মনে রিপোর্টে কার বিরুদ্ধে কি লিখবে সেসব গুছিয়ে নিচ্ছে সে। হঠাৎ চমকে উঠল একটা কথা মনে পড়ে যেতেই।

ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার অফিস থেকে কাজ সমাধা করে অক্ষত অবস্থায় বেরোতে পেরেই মনের সব ভার হালকা হয়ে গিয়েছিল ওর। আপাতত বাঁচা গেছে। ও জানে আবার কোন প্রয়োজন পড়লেই নোংরা ছবির ভয় দেখাতে আসবে কবিতা—কিন্তু সে-ও কম ত্যাঁদোড় নয়, তার আগেই কিভাবে কবিতা রায়কে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেকে কন্টকমুক্ত করবে সে প্ল্যান ভেবে বের করে ফেলেছে সে কাল রাতেই। সেদিক থেকে কোন দুশ্চিন্তা নেই, বর্তমান ফাঁড়াটা কাটতে পেরে এতই খুশি হয়েছিল সে যে মনের আনন্দে অন্যের সর্বনাশের পরিকল্পনা আঁটতে আঁটতে চলেছিল শ্বশুর বাড়ির পথে। হঠাৎ খেয়াল হলো, আজ হোক বা কাল হোক মাইক্রোফোনটা পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার ডেস্কের নিচে। পাওয়া যাবেই। তখন ওর উপর সন্দেহ পড়বে না তো কারও?

কি করে পড়বে? কত লোকই আসছে যাচ্ছে, কে রেখেছে ওটা তার কোন প্রমাণ আছে? প্রমাণের কথা মনে আসতেই চট করে মনে পড়ল আঙুলের ছাপের কথা। তাই তো! এতই চমকে উঠল রাফিকুল হক যে নিজের অজান্তেই ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে গেল সে রাস্তার মাঝখানে—যেন মস্ত বিপদ দেখতে পেয়েছে সে সামনে। ইশ্! একটা বার যদি মনে আসত আঙুলের ছাপের কথা। প্রমাণ রেখে এসেছে সে মাইক্রোফোনের গায়ে। এখন উপায়?

দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মাথার চুল টানল কিছুক্ষণ রাফিকুল হক। গাড়ির ঘর্ণ কাচ পিছন দিকে চাইল সে। টিনটিনে ক্ষীণ। লাফিয়ে উঠল বুকের ভিতর

কলজেটা। থরথর করে কাঁপছে সর্বশরীর। একেবারে ঘাড়ের উপর এসে আবার হর্ন বাজল জীপের। ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে চাইল রাফিকুল হক। অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে জীপের ড্রাইভার, কি বলছে শোনা যাচ্ছে না, হাতের ইশারা দেখে বুঝতে পারল সরে যেতে বলছে রাস্তা ছেড়ে। চট্ করে স্টিয়ারিং দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে গেল রাফিকুল হক, পাশ কাটিয়ে চলে গেল মিলিটারি জীপ। কয়েকটা গালি কানে এল ওর—তারমধ্যে 'বানচোত' আর 'চুথিয়া' শব্দ দুটো খুবই অপমানজনক বলে মনে হলো ওর কাছে।

আর্মি জীপ যে ওকে ধরবার জন্যে ধাওয়া করে আসেনি সেটা যখন বুঝতে পারল, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে কম্পিত হাতে বাঁকা পাইপটা ধরাল রাফিকুল হক। সবটা ব্যাপার আবার একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করল ঠাণ্ডা মাথায়। বুঝতে পারল: যা হবার হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ভয় করবার কিছুই নেই। এখন ভেবে বের করতে হবে উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা আছে কিনা। ধরা যদি পড়েই যায়, কবিতাকে ফাঁসিয়ে দেবে সে, ব্ল্যাকমেইলের কথা বলে পা চেপে ধরবে ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যদি অপরাধ স্বীকার করে পায়ে ধরে মাফ চায়, তারপরেও কি দয়া হবে না ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার? যাই হোক, সেসব পরের কথা পরে, অবস্থা বুঝে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবেই; আগে থেকে কেবল খারাপ দিকটাই ভাবছে কেন সে? এমনও তো হতে পারে, কেউ টেরই পাবে না মাইক্রোফোনের কথা; দু'সপ্তাহ পরে গেলেও হয়তো দেখা যাবে যেখানে রেখে এসেছিল সেইখানেই রয়েছে ওটা। কিন্তু তাই বলে এতদিনের ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না মোটেই। কিছু একটা ছুতো বের করে নিয়ে কালই যাবে সে আবার আতিকুল্লার অফিসে। খুলে নিয়ে আসবে মাইক্রোফোন। আর ইতিমধ্যে যদি ওটা ওরা খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলেই বা অত ঘাবড়াবার কি আছে? ওর আঙুলের ছাপ তো আর কারও কোন রেকর্ডে নেই—এত লোক ছেড়ে ওর উপরেই কেন সন্দেহ আসতে যাবে ওদের? নাহ্, কোন চিন্তা নেই। আবার গাড়ি ছুটাল সে মুক্তাগাছার পথে।

এসব যুক্তিতর্কের মধ্যে ফাঁক আছে—টের পেল রাফিকুল হক, কিন্তু আর কোন উপায় যখন নেই, এসবের সাহায্যেই আশ্বাস পাওয়ার চেষ্টা করল ওর মন। বাস্তবকে ধামাচাপা দিয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করল সে নিজের মনগড়া নিরাপত্তাবোধের বুদ্বুদের ভিতর।

গোলাম পাশাকে দেখে ফেলল ফারুক হাসান ঢাকা এয়ারপোর্টে। চট্টগ্রাম থেকে আগত প্লেন থেকে মালপত্র ছাড়া খালি হাতে পাশাকে নামতে দেখে অবাক হলো সে। কাল বিকেলে ঢাকা ক্লাবে টেনিস খেলতে দেখেছে সে

গোলাম পাশাকে, অথচ আজ সকালে ফেরত আসছে সে চট্টগ্রাম থেকে। ব্যাপার কি! নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘাপলা আছে এর মধ্যে, জানাতে হয় বসকে।

ফারুক হাসানের টেলিফোন পেয়ে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল বদরুদ্দিনের। রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা চাইল সামনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে চোখ বুজে ধূমপানরত সিকান্দার বিল্লার মুখের দিকে। বদরুদ্দিনের মুখে গোলাম পাশার নাম শুনে বাম চোখটা এক ইঞ্চির সিকি ভাগ খুলেছে সে।

'গোলাম পাশা ফিরল আজ চিটাগাং থেকে। খালি হাতে। লাগেজ নেই সাথে।'

'তাতে কি?'

'ফারুক বলছে, কাল বিকেলে ঢাকায় দেখেছে ওকে লন টেনিস খেলতে।' বিল্লার বাম চোখটা পুরোপুরি খুলে যেতেই নিজের সন্দেহের কথা জানাল বদরুদ্দিন। 'শাকিলা বলছে মাসুদ রানার সাথে আরও অন্তত একজন ছিল। মাসুদ ভাই বলে ডাকছিল রানাকে? গোলাম পাশা নয়তো?'

'ভাবছেন, কাল রাতে গাড়িতে করে চাটগাঁ নিয়ে গেছে ওরা হাস্না কাওসারকে? নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দিয়ে আজ সকালে ফিরে এসেছে গোলাম পাশা?' ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সিকান্দার বিল্লাহ। তারপর বলল, 'হতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রামের কোথায়—রাঙামাটি, কাপ্তাই, কক্সবাজার, না চিটাগাং শহরে?'

'সেটা বের করতে হবে তোমার। একটা লিড যখন পাওয়া গেছে হাঁ করে বসে না থেকে এই সূত্র ধরে যতটা সম্ভব এগোবার চেষ্টা করো। গাধামির পরিচয় দিয়েছ তোমরা কাল। তোমারই দোষে হাতে পেয়েও হারিয়েছি আমরা মেয়েটাকে। ধরা পড়তে পড়তেও অনেক কষ্টে পালিয়ে আসতে পেরেছে শাকিলা। এই সমস্ত রিপোর্টই যাবে ইসলামাবাদে। সেখানে কি রিঅ্যাকশন হবে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় তোমার।' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বিল্লাকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে দেখে রেগে গিয়ে বাজে কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ থেকে, সামলে নিল বদরুদ্দিন। শান্তকণ্ঠে বলল, 'তোমার পজিশন রিগেইন করবার একমাত্র উপায় এখন যেমন ভাবে পারো হাস্না কাওসারকে উদ্ধার করে আনা।'

কোন কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল সিকান্দার বিল্লাহ। বাইরে একটা বেপরোয়া ভাব বজায় রাখলেও ভিতর ভিতর হকচকিয়ে গেছে সে। আবার ধোঁকা খেল সে মাসুদ রানার কাছে। সুযোগ পেয়েও অ্যামবুলেন্স থেকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়ার সময় কেন সে ওই লোকটার মাথার পিছনে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিল না, সেই অনুশোচনা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে কাল রাত

থেকে। শাকিলার কথাই ঠিক, সত্যিই আন্ডার-এস্টিমেট করেছিল সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের নিজ হাতে গড়া এককেটা ক্ষুরধার তলোয়ার এই সব হারামজাদারা। হুঁশিয়ার হয়ে সমঝে না চললে ঘ্যাচ করে ধড় থেকে আলাদা করে দেবে কল্লাটা। বিশেষ করে কাল রাতে তো অমার্জনীয় অপরাধ করেছে সে! শাকিলাকে নিয়ে ছয়জন পাকিস্তানী ধরা পড়তে যাচ্ছিল এসপিওনাজের দায়ে। নতুন ভাবে সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছে পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের সাথে। এই সময়ে সত্যি যদি ওরা ধরা পড়ত তাহলে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হত ভাবতে গিয়ে থেকে থেকে চমকে উঠছে ওর কলজেটা।

ঠিকই বলেছে বদরুদ্দিন শালা। নিজের পজিশন রাখতে হলে এখন কিছু সিকান্দারী অ্যাকশন দেখাতে হবে। উঠে দাঁড়াল সিকান্দার জিন্নাহ। চিশতি ছোঁড়াটা গেল কোথায়? ওল্ড স্মাগলারের বোতল নিয়ে কাল রাতে সেই যে গায়েব হয়েছে আর কোন পাত্তাই নেই।

চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেল সিকান্দার জিন্নাহ বদরুদ্দিনের কামরা থেকে।

।

দুপুর ঠিক বারোটার সময় ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার ঘরে এসে ঢুকল সিকিউরিটি চীফ কিবরিয়া।

'কি খবর? এসো, কিবরিয়া। চা খাওয়ার সঙ্গী পাচ্ছিলাম না। বলি চায়ের কথা···নাকি ব্যস্ত?'

'ব্যস্ত। ছারপোকার দুঃসংবাদ দিতে এলাম।'

'বাগ? কোথায়?'

'তোমার ঘরে। ডাকব ছেলেদের?'

'আমার ঘরে!' চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল আতিকুল্লার। 'আমার ঘরে বাগ! অসম্ভব! প্রত্যেকদিন সকালে প্রত্যেকটা রুম চেক করা হয় না আজকাল?'

'হয়। আজও তুমি পৌঁছবার আগেই চেক করা হয়েছে। তখন ছিল না। এখন আছে।'

'কী যা-তা বলছ, কিবরিয়া। অফিস ছেড়ে কোথাও যাইনি আমি। তেমন কেউ আসেওনি আজ। অসম্ভব ব্যাপার।'

'বিলিভ মি। আছে। কোন ভুল নেই তাতে।' হাতে ধরা ছোট্ট একটা গাইগার কাউন্টারের দিকে চাইল কিবরিয়া। 'এই ঘরে কোথাও রয়েছে একটা ছারপোকা।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আতিকুল্লাহ। 'তাহলে আর দেরি কিসের? থাকে যদি বের করে ফেলো।'

দরজার কাছে গিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে আসবার ইঙ্গিত করল কিবরিয়া দু'জন টেকনিশিয়ান কিসিমের লোককে। সার্চ শুরু হলো। সকাল থেকে এই পর্যন্ত এই ঘরে বসে টেলিফোন বা ইন্টারকমে কার সাথে কি কথা বলেছে মনে করবার চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদের কল ছাড়া আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন আসেনি। সে নিজেও কাউকে ফোন করেনি।

তিন মিনিটের মধ্যেই পাওয়া গেল লিম্পেট মাইক্রোফোনটা।

'এই যে স্যার, এইখানে!'

নিচু হয়ে ঝুঁকে একনজর দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। কোন রকম তারের সংযোগ ছাড়া এই ধরনের মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কিছু শুনতে হলে কাছাকাছিই কোথাও শক্তিশালী রিসিভিং সেট থাকতে হবে।

'ইন্সপেক্টার মারুফকে লাগিয়ে দিয়েছি আমি আগেই,' বলল কিবরিয়া ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার চিন্তাধারা আঁচ করে নিয়ে। 'আশেপাশে চেকিং শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এল কি করে জিনিসটা? সকাল থেকে কে কে এসেছে তোমার কাছে?'

'অ্যাডমিনি-চীফের সেক্রেটারি পারভিন, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রাফিকুল হক, আমার পিওন, আর সার্টিফিকেটের হাতেম আলী।'

বাম চোখটা তিন সেকেন্ড টিপে রেখে আবার খুলল কিবরিয়া। 'অর্থাৎ আর সবাই বাদ, কান চেপে ধরতে হচ্ছে তোমার মাস্টারের।'

'শ্বশুর বাড়ি গেছে রাফিকুল হক। মুক্তাগাছার সিমলা গ্রামে। এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দাও তুমি, ধরে নিয়ে এসো কুত্তার বাচ্চাকে। পাছার ছাল তুলে নেব আমি ওই হারামজাদার! আর,' ডেস্কের দিকে মাথা ঝাঁকাল, 'ওটা সাবধানে খসাতে বলো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যেতে পারে। এদিকটা তুমি সামলাও, কিবরিয়া, আমি অ্যাডমিনি-চীফকে জানাচ্ছি সব। মাসুদ রানা সাহেবকে সাবধান করতে হবে—নইলে বিপদ ঘটতে পারে। হাসনা কাওসারকে ঢাকা থেকে সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে জেনে নিয়েছে কেউ এই কৌশলে। এরা কারা জেনে যাব আমরা—তুমি তোমার স্টীমরোলার চালু করে দাও। টপ্ প্রায়োরিটি।'

'অলরাইট,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল সিকিউরিটি চীফ কিবরিয়ার।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ নিজের কামরা ছেড়ে। সোহেলের সেক্রেটারিকে অফিসে না দেখে একটু অবাকই হলো সে।

ঠিক দুই ঘণ্টা পর আবার ক্যাপ্টেন আতিকুল্লার ডাক পড়ল চীফ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের কামরায়।

এবারও লক্ষ করল সে, পারভিন নেই তার সীটে। ঘরে ঢুকে ওর কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে, কিন্তু বসের চেহারা দেখে মুখের কথা আটকে গেল ওর মুখেই।

'জ্ঞান ফিরেছে পারভিনের,' বলল সোহেল।

'জ্ঞান ফিরেছে মানে?' আকাশ থেকে পড়ল আতিকুল্লাহ। 'জ্ঞান হারাল কখন?'

'তুমি জানো না? অফিসের কাজে পাঠিয়েছিলাম ওকে বাইরে। দিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে জোর করে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে।'

'কারা! কারা করল কাজটা?'

'চেহারার যে বর্ণনা দিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সিকান্দার বিল্লাহ আর চিশতি হারুন। হাস্না কাওসারের খবর জানতে চেয়েছে। ও বলেছিল, ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। বিশ্বাস করেনি। গোলাম পাশা চট্টগ্রাম থেকে ফিরল কেন জিজ্ঞেস করেছে, তারপর স্কোপোলামিন পুশ করেছে ওর শরীরে। হাস্না কাওসারকে কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে এখন আর অজানা নেই ওদের কাছে।'

'দিন দুপুরে! বড় বাড় বেড়ে গেছে দেখছি ওরা!'

'নিজের সুনাম বজায় রাখবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিল্লাহ। ঠিকই বলেছ—বেড়ে গেছে। ব্যবস্থা করছি...'

টেলিফোন এল। রিসিভার কানে তুলে নিয়ে দু'মিনিট চুপচাপ শুনল সোহেল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার। বিচিত্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে। উদগ্রীব ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে চাইল সে।

'ফোন করেছিল ইন্সপেক্টার মারুফ। সকাল আটটার দিকে একটা ফিয়াট সিক্স হানড্রেড এসে থেমেছিল আমাদের অফিসের সামনে ওই মোড়ের কাছে। স্পার্কপ্লাগে নাকি তেল এসে গিয়েছিল। গাড়ির ভেতর বসে ছিল সুন্দরী এক মহিলা। মহিলার কানে পরা ছিল ডেফ এইড।'

'অর্থাৎ, অ্যামপ্লিফায়ার নয়, শক্তিশালী কোন রিসিভিং সেটের সাথে জোড়া ছিল ডেফ এইডের তার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সোহেল আহমেদ।

'ট্রাফিক পুলিস আপত্তি জানিয়েছিল গাড়িটা ওখানে দাঁড়ানোয়, কিন্তু গাড়িতে মহিলা রয়েছে দেখে গোলমাল করেনি। কপাল ভাল, গাড়ির নম্বর মনে ছিল লোকটার। ঢাকা গ ৫৯৯৯।'

'কার গাড়ি ওটা, স্যার?'

'আন্দাজ করতে পারো?' ক্যাপ্টেনকে মাথা নাড়তে দেখে বলল সোহেল, 'দৈনিক সুপ্রভাতের স্টাফ রিপোর্টার মোহাম্মদ আলমগীর।'

'মেয়েটা নিশ্চয়ই কবিতা রায়?'

'সম্ভবত। আগেই সাবধান করেছিলাম আমি তোমাকে, আতিক। অমলেশ কর্মকারের যাতায়াত দেখে আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

'তার মানে, স্যার, ইন্ডিয়ানরাও জেনে গেছে কোথায় রয়েছে হাস্না কাওসার!'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান—সবাই লেগে গেছে বেচারী হাস্না কাওসারের পিছনে। কি তথ্য রয়েছে ওর কাছে আল্লাই মালুম। আমাদের কথা ছেড়েই দিলাম—আমরা চান্স নিচ্ছি একটা; কিন্তু সত্যি যদি কোন তথ্য ওর কাছে না থাকবে, তাহলে এমন খেপে উঠেছে কেন ভারত-পাকিস্তান?'

'মেজর রানাকে জানিয়েছেন?'

'এখনি জানাচ্ছি। যদিও আমার মনে হয় না খান ভিলার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে ভারত বা পাকিস্তান ভিড়তে পারবে হাস্না কাওসারের কাছে, তবু প্রতিটা ডেভেলপমেন্ট জানা দরকার রানার। তুমি এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে আর ডেমরা ফেরিঘাট—তিন জায়গাতেই লোক রাখার ব্যবস্থা করো। আলমগীর, কবিতা, সিকান্দার, চিশতি হারুন, প্রত্যেকের চেহারার বর্ণনা দেবে ওদের। এই চেহারার কেউ যেন এখন থেকে আগামী তিনদিন ঢাকা ছেড়ে কোথাও না যেতে পারে।'

'ইয়েস, স্যার।'

সোহেল আহমেদকে টেলিফোন রিসিভার কানে তুলে নিতে দেখে লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ।

ওদের দু'জনের কেউই জানে না, এতক্ষণে দাউদকান্দির প্রথম ফেরি পার হয়ে গেছে সিকান্দার বিল্লাহ আর চিশতি হারুন। আর পতেঙ্গা বিমান বন্দরে পৌঁছে গেছে মোহাম্মদ আলমগীর, কবিতা রায় ও নিজাম।

সবার লক্ষ্য হাস্না কাওসার—ঘুমই ভাঙেনি যার এখন পর্যন্ত।

এসপিওনাজ-২

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

এক

'মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, তাই না?' বলল রাবেয়া হাসনা কাওসারের বেকায়দায় রাখা হাতটা সোজা করতে করতে। চাইল রানার মুখের দিকে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। মাথা ঝাঁকাল। শুধু সুন্দরী বললে অবিচার করা হয় মেয়েটির প্রতি। সৌন্দর্যের পাশাপাশি চেহারায় রয়েছে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছাপ। ঘুমন্ত অবস্থাতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি বাঁদি নয়—বেগম। ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে এরা বশ করে রাখে আশেপাশের সবাইকে। ওর অঙ্গুলী-সঙ্কেতে উঠতে হবে সবাইকে, বসতে হবে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই। সাধে আর পাগল হয়নি বাজপেয়ী।

অস্বস্তি বোধ করল রানা। এর সাথে স্বামীর অভিনয় করতে হবে ভাবতেই কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠছে ওর মনটা। বুঝতে পারল, মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসবার ব্যাপারে মোটেই উদগ্রীব নয় সে—বরং উল্টোটাই সত্য। যত বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততই ভাল। জেগে উঠে যখন প্রশ্ন করবে 'তুমি কে?'—তখন কিভাবে কি বলবে ভাবতে গিয়ে কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছে সে ভিতর ভিতর।

'কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। জানালা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। 'ঘুম ভাঙবে কখন?'

'কখন ভাঙবে ঠিক বলা যায় না। পালস্ বিট স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মনে হয় সন্ধে নাগাদ উঠে পড়বে।' রানাকে মুখভঙ্গি করতে দেখে হাসল রাবেয়া। 'কেন? ভয় লাগছে বুঝি?'

'ভয় ঠিক নয়,' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। 'অনিশ্চয়তা...অস্বস্তি। পরিচয়ই নেই, অথচ মেয়েটির সবচেয়ে আপনজনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে আমার। কি বলতে যে কি বলবে—অভিজ্ঞতা তো নেই—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হয় জানি না, ধরা পড়ে যাব না তো?'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল রাবেয়া। তারপর হাসি সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ট্রেনিং দিতে পারি আপনাকে। আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'তাই নাকি!' অবাক হলো রানা। 'আপনি বিবাহিতা?'

'বিধবা। এক বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে। একটা বছর কম কথা নয়।'

'কিন্তু আমার যে তিন বছরের অভিজ্ঞতা দরকার?'

'খারাপ ব্যবহারগুলোকে তিন দিয়ে গুণ করে নেবেন, তাহলেই হবে।'

'আর ভালগুলোকে তিন দিয়ে ভাগ?'

দক্ষিণের জানালা খুলে দিল রাবেয়া, তারপর রানার পিছু পিছু চলে এল ব্যালকনিতে। পাহাড়ের গায়ে পড়েছে বিকেলের কমলা রোদ, দূরে ঝিলমিল করছে সাগরের একাংশ। ঠোঁটে আঙুল রেখে কে যেন বলেছে 'চুপ!'— তাই নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে পাহাড়ী বিকেলটা। দুটো ফোল্ডিং চেয়ার আর একটা ছোট্ট টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চা নাস্তার ব্যবস্থা করতে গিয়েছে ওহিদোরশন। একটা চেয়ারে বসল রানা, রেলিঙে হেলান দিয়ে রানার দিকে মুখ করে দাঁড়াল রাবেয়া মজুমদার।

'পুরুষরা বিয়ের পরে খুব খারাপ ব্যবহার করে বুঝি? সবাই?'

মাথাটা একপাশে কাৎ করে সায় দিল রাবেয়া।

'সবাই। ব্যতিক্রম নেই। কেউ হাতে মারে, কেউ মুখে মারে, আর কেউ মারে ব্যবহারে। কেউ কারও চেয়ে কম নয়।' মুচকে হাসল। 'দুর্ব্যবহার করবে না-ই বা কেন? ক্ষমতা রয়েছে ওদের, সমাজ শাসন করছে ওরাই। হাত পা-মুখ বেঁধে নিয়েছে ওরা মেয়েদের। কেউ যদি কুপথে যায়, সেটাও নাকি মেয়েদেরই দোষ— তারা ধরে রাখতে পারেনি স্বামীকে।'

'ওরেব্বাপ!' আঁৎকে ওঠার ভঙ্গি করল রানা। 'বারুদ হয়ে রয়েছেন দেখছি! থিসিস লিখে ফেলুন না একটা? সাবধান করে দিন সব মেয়েকে, বারণ করে দিন বিয়ে করতে। তাহলেই চুকে যাবে সমস্যা।'

'কেউ শুনবে না আমার কথা,' হাসল রাবেয়া। 'আমি নিজেই শুনব না…মুখে যাই বলি না কেন, আসলে তো পুরুষ ছাড়া, সংসার ছাড়া, সন্তান ছাড়া একেবারে অসম্পূর্ণ মেয়েমানুষের জীবন।'

'অর্থাৎ চান্স পেলেই আবার ভুল করবেন আপনি। গুড়। এবার বলুন দেখি, কি ধরনের অত্যাচার করলে এই মেয়েটাকে দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারব যে সত্যিই আমি তার স্বামী?'

'সেটা বলতে হলে মেয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে কিছুটা। কে ও, কোথাকার মেয়ে, কি ধরনের শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন—এসব জানলেই আমি বলে দিতে পারব কেমন ব্যবহার আশা করবে ও আপনার কাছে।'

হাসল রানা।

'আসল কথা, সবটা শুনে ফেলতে চান। ঠিক আছে, সন্ধের পর শোনাব। এখন হাবিলদারের সাথে খানিক কথা বলে আসি। গোটা এলাকা আর একবার দেখে নিতে চাই আমি সন্ধের আগে।'

রানার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল রাবেয়া মজুমদার। লোকটাকে ওর ভাল লাগছে বুঝতে পেরে চট্ করে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার চাইল। তারপর হাস্না কাওসারকে একবার দেখে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

গেটের কাছাকাছি সেই ছোট্ট ঘরের সামনে একটা টুলে বসে আছে হাবিলদার শামসুদ্দিন। পাশেই টুলের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা ভয়াল-দর্শন কুকুরটা। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল কুকুরটা। এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় একটা থাবড়া দিয়ে কান চুলকে দিল রানা।

পাশ ফিরেছিল বলে রানাকে এগিয়ে আসতে দেখেনি হাবিলদার, হঠাৎ আঁৎকে উঠে তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ছানাবড়া হয়ে গেছে দুই চোখ।

'কি রে, ব্যাটা? এত রাগ কিসের?' বলেই আর এক থাবড়া লাগাল রানা কুকুরটার মাথায়।

আড়চোখে রানাকে লক্ষ্য করল বিশাল অ্যালসেশিয়ান, গর্‌র্ করে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর ভেজা জিব বের করে চেটে দিল রানার হাত।

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়ল হাবিলদার শামসুদ্দিন।

'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, স্যার। আমি তো মনে করেছিলাম, গেল আপনার হাতটা। সাংঘাতিক পাজি কুত্তা, স্যার, এটা।'

'তাই নাকি? বেশ ভালমানুষই তো মনে হচ্ছে এখন?' আর একবার কুকুরটার কান চুলকে দিয়ে বসে পড়ল রানা একটা টুল টেনে নিয়ে। 'বসুন। মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান সবাই এই মেয়েটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। খুবই সাবধান থাকতে হচ্ছে আপনাকে।'

'আসুক, স্যার। যতখুশি আসুক, মানা করব না। গোর দেয়ার ভার আমার ওপর যদি না পড়ে পাঁচশো বা হাজার এলেও ক্ষতি নেই। আমি রেডি।' এই কথায় রানা কতটুকু আশ্বস্ত হলো বোঝার চেষ্টা করল হাবিলদার রানার মুখের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে। বোঝা গেল না কিছুই। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'খানিক আগে এক ছোকরা খোঁজ করছিল এটা মনসুর লজ কিনা।'

'মনসুর লজ?'

'পাশেরটা। পশ্চের টিলায়।'

'তারমানে মনসুর লজের আগের টিলায় খান ভিলা। অর্থাৎ, এটাই খান ভিলা তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না ছোকরার।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল হাবিলদারের। ধীরে বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল।

'এইভাবে ঘুরিয়ে ভাবিনি কথাটা।'

'লোকটা দেখতে কি রকম?'

'ঢোঙা, পাতলুন পরা হালকা-পাতলা এক অল্পবয়সী ছোকরা। নোংরা। ধমক মারতেই কেটে পড়ল।'

নাকের পাশটা চুলকাল রানা।

'ধরুন, যদি গ্রেনেড মেরে গেটটা ধসিয়ে দেয়া হয়, হুড়মুড় করে দলবল নিয়ে ঢুকে পড়তে পারবে যে কেউ। পারবে না?'

'পারবে, স্যার। কিন্তু ঢুকে কোন লাভ হবে না কারও। ভিলার দু'পাশে দুটো ঘরের জানালায় মেশিনগান নিয়ে বসে আছে আমার দু'জন লোক।' আঙুল তুলে পাকা ঘরের একটা ফোকড় দেখাল হাবিলদার। হাতখানেক লম্বা একটা নল বেরিয়ে আছে বাইরে। 'ওই যে আর একটা মেশিনগান। পেছন দিক থেকে—দেখছেন তো কি রকম খাড়া? কোন রকমের আক্রমণ আসা সম্ভব নয়। আক্রমণ যদি আসে, আসবে সামনে দিয়ে। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে টের পাওয়ার আগেই সাফ হয়ে যাবে পাঁচশো লোক।'

অপ্রয়োজনীয় দু'একটা টুকরো আলাপের পর উঠে পড়ল রানা। গোটা এলাকাটা ঘুরে দেখে হাবিলদারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন খুঁত বের করতে পারল না সে। ঠিক যেখানটায় যা দরকার তাই করেছে সে, এরচেয়ে মজবুত ডিফেন্স আর কিছু হতেই পারে না। ফিরে এল ভিলায়। সন্ধেটা উপভোগ করবার জন্যে ব্যালকনির ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। হাসান কাওসারের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আর করবারই বা কি আছে?

একটা দুটো করে জ্বলে উঠছে তারার পিদিম। দূর থেকে আবছা কানে আসছে সাগরের হুল্লোড়। এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ ভরা বালতির মধ্যে—কালো হয়ে গেছে সাগরের পানি। মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপচাপ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনের উঁচু পাহাড়। আহত সাপের মত বুকে হেঁটে আসছে রাত। দ্রুত মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে গোধূলির রঙ।

কেন যেন দিনাবসান ব্যাপারটা সবসময় আশ্চর্য এক গভীর বিষণ্ণতায় ছেয়ে দেয় রানার মনটাকে। কিছুতেই এটাকে সাধারণ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারে না সে। এর মধ্যে অতল রহস্যময় আরও কোন ব্যঞ্জনা যেন রয়েছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল কর্মকাণ্ড আর সূক্ষ্ম লীলাখেলার কি এক গোপন সূত্র যেন ওর মনের গভীরে ধরা পড়তে গিয়েও পড়ে না। নিজেকে ধূলিকণার মত নগণ্য মনে হয়। জন্ম, জীবন-যাপন, মৃত্যু—এসব ব্যাপারকে এইসব মুহূর্তে একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারে না সে, কেমন যেন ধাঁধা মত লাগে, মনে হয় নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য রয়েছে

সবকিছুর পিছনে। কিন্তু একটা···

রাবেয়া মজুমদার এসে বসল। কমলা রঙের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। এক কথায় দু'কথায় জমে উঠল গল্প। আধঘণ্টার মধ্যে রাবেয়ার জীবনের অর্ধেকটা জানা হয়ে গেল রানার। হাসনার প্রসঙ্গে ফিরে এল রাবেয়া।

'মেয়েটা সম্পর্কে বলবেন বলেছিলেন, তার কি হলো? কে মেয়েটা? কেন মিছেমিছে স্বামী সাজতে হচ্ছে আপনাকে? পাকিস্তানী বা ভারতীয়রাই বা ওর ব্যাপারে এতটা খেপে উঠেছে কেন?'

'একেবারে আঁটি ভেঙে শাঁস না খেলে চলছে না আপনার, তাই না? শুনুন তাহলে···'

রাবেয়া মজুমদার যতটা জানলে ক্ষতি নেই, সংক্ষেপে সেটুকু জানাল রানা।

'মেয়েটা তাহলে স্পাই একজন? বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই রকম স্পাইং চলে?'

'বন্ধুর হাঁড়ির খবর, কিংবা আপনার সম্পর্কে তার কি ধারণা জানবার সুযোগ পেলে আপনি ছাড়বেন? প্রথমে হাঁ করে গিলে নেবেন—তারপর আসবে বড় বড় সুনীতির বোলচাল। এটাও তেমনি। এসপিওনাজে শত্রু-মিত্র নেই, সবার সম্পর্কেই খবর রাখতে হবে আপনাকে, হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তফাৎ, শত্রুদেশের স্পাই ধরা পড়লে বিচার-টিচার করে, জেলে পুরে দিয়ে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়া হয়, আর মিত্রদেশের স্পাই ধরা পড়লে অভিমানী সুরে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় সে দেশের কাছে—খুব একটা লজ্জাশরম কোন দেশই পায় না, তবে একটু কথার তলে থাকতে হয়, এই যা। ভারতের স্পাইও কাজ করছে আমাদের দেশে, আমরা যে তাদের একেবারে চিনিই না, তাও নয়। কিন্তু তাদের বেকায়দামত পাওয়া খুবই মুশকিল। ধরতে গেলে হয়তো দেখা যাবে বাংলাদেশের নাগরিককে ধরেছি, ভারতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা যাচ্ছে না।'

'আপনারা একটা মেয়েকে লাগিয়েছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে স্পাইং করতে···এর মধ্যে পাকিস্তান আসছে কি করে?'

'এই ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমরা আসলে ভারতের বিরুদ্ধে কাউকে লাগাইনি। পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তান লাগিয়েছিল ওকে শত্রুদেশ ভারতের বিরুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এতদিন কেউ মেয়েটার কোন খোঁজ খবর করেনি। আমরা করিনি, আমাদের কাগজপত্র রেকর্ড সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে। পাকিস্তান করেনি মেয়েটি বাঙালী বলে। এখন হঠাৎ [illegible] কাওসার আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। ফাঁপড়ে পড়ে ও নিজেও যোগাযোগ

করেনি কারও সাথে। কারণ, কোথাও সামান্য ভুল হলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ত ওর।'

'তাই পালিয়ে এসেছে সে দেশে?'

'এখানে আরও একটা প্যাঁচ রয়ে গেছে। দেশ বলতে এই মেয়েটি কোনটাকে বুঝবে—বাংলাদেশ না পাকিস্তান, সেটাও এখন কারও কাছে পরিষ্কার নয়। মেয়েটির বাবা ছিল বাঙালী, কিন্তু মা হচ্ছে পাঞ্জাবী। বাবা মারা গেছে, কিন্তু মা বেঁচে আছে—লাহোরে। এই অবস্থায় পাকিস্তান সঙ্গত কারণেই ভাবতে পারে হাস্না কাওসারের সংগৃহীত তথ্য জানবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে ওদের। এখন পর্যন্ত কেউ জানে না মেয়েটার অনুগত্য কোন্ দেশের প্রতি—বাংলাদেশ না পাকিস্তান।'

'পাকিস্তান হলে পালিয়ে সে ওখানেই যেত, ঢাকায় আসত না।'

'সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেক কারণেই সে ঢাকায় আসতে পারে। এমনও হতে পারে, এদিকের পথঘাট ভালমত চেনা আছে বলে এইদিকেই এসেছে মেয়েটা, গন্তব্যস্থল হয়তো পাকিস্তান—কে জানে?'

'ওরে বাবা। এ যে দেখছি গোলক ধাঁধা! মেয়েটা এখন আমাদের দলের হলে বাঁচা যায়। যাইহোক, কি ধরনের খবরের জন্যে স্পাইং করছিল ও?'

'ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পেছনে লাগানো হয়েছিল ওকে। লোকটার চারিত্রিক দুর্বলতার কথা আঁচ করে নিয়ে হাস্না কাওসারকে ভিড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ওর সাথে। অনেকটা কেপ্টের মত ছিল ও সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ীর সাথে গত কয়েকটা বছর।'

'কয়েকটা তথ্যের জন্যে নিজের সম্ভ্রম এভাবে বিলিয়ে দিতে পারল মেয়েটা?'

'কাকে সম্ভ্রম বলবেন, কোন্ কাজটা স্বীকৃতি পাবে আপনার রুচির কাছে, সব নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর মূল্যবোধের ওপর। দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আবার নির্ভর করে আপনার বংশ, ফ্যামিলি, প্রতিপালন, শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকতার ওপর। সেই সাথে যোগ হচ্ছে আপনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আপনার...' এইটুকু বলেই পরের অংশটুকু আর মনে করতে পারল না রানা। কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক বিচিত্রা থেকে বিদ্যুৎ মিত্রের 'প্রতিবিম্ব' কয়েকটা লাইন মুখস্থ করেছিল সে। হোঁচট খেয়ে থামল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তাছাড়া যেরকম বলছেন মেয়েটা সুন্দরী, দেখে তো মনে হয় প্রাণ-পাখি, দৈহিক পবিত্রতার থোড়াই কেয়ার করে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল রাহেল্লা। 'আমার কিন্তু তা মনে

হয়নি। যাই হোক আমি আপনার চোখ দিয়ে দেখিনি ওকে। বব-ছাঁটা চুল আপনার খুব সুন্দর লাগে বুঝি?'

ওয়েইটার জানিয়ে গেল, আধঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে খাবার, জানতে চাইল তক্ষুণি টেবিল সাজাবে, নাকি খেতে দেরি হবে ওদের। ওর মুখে রান্নার ফিরিস্তি শুনে জিভে পানি এসে গেল রানার। বলল, 'পারলে এক্ষুণি টেবিল সাজাও, আর এক মিনিট দেরিও সহ্য হচ্ছে না!'

দুই

পাশাপাশি দুটো কটেজ ভাড়া নিল ওরা। একটা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ আলমগীর ও কবিতা, অপরটা নিজামের জন্য। ঠিক হলো, এক্ষুণি একবার খান ভিলার আশপাশটা দেখে আসবে নিজাম। আলমগীরের মাথা ভয়ানক ধরেছে, তাই গাড়ি চালাবে কবিতা। চোখে-মুখে খানিক পানি ছিটিয়ে নিয়ে মরিসের ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল কবিতা, পাশের সীটে নিজামকে উঠতে দেখল আলমগীর জানালা দিয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল ওর। হাত নেড়ে থামবার ইঙ্গিত করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে—ধরুক মাথা, নিজেই যাবে। কিন্তু ওর ইঙ্গিত দেখতে পায়নি কবিতা, ভোঁ করে ছেড়ে দিল গাড়ি। ভুরু কুঁচকে সাগরের দিকে চাইল আলমগীর, যেন অবাক হয়েছে, এটা আবার কোত্থেকে এলো এখানে!

গাড়িটা শহর ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় আসতেই কবিতার গায়ে হাত দিল নিজাম। কবিতার মুখে চাপা হাসি দেখে আরও একটু সাহসী হয়ে উঠল ওর হাত। স্টিয়ারিং থেকে একহাত সরিয়ে মৃদু চাপ দিল সে নিজামের হাতে, মুখে বলল, 'এখন নয়।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! পট্‌পট্‌ খুলে গেল ব্লাউসের টিপ্‌ বোতাম।

খান ভিলার গেট থেকে পায়ে হেঁটে নেমে এল নিজাম।

'এইটাই,' বলল সে। 'গেট বন্। বিরতে মিলিটারি দেখলাম। চিপি দিয়া দেখলাম, কুত্তা বি আছে এউগা।'

'উঠে আসুন,' বলল কবিতা। 'ভেতরে ঢোকার আর কোন রাস্তা আছে কিনা দেখতে হবে।'

খানিকদূর এগিয়ে রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে ঘন ঝোপের আড়ালে গাড়িটা রেখে নেমে পড়ল ওরা দু'জন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুর-পথে উঠতে শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। সাঁঝ হয়ে এসেছে, দ্রুত ঘন হয়ে আসছে

অন্ধকার। জঙ্গলে গাছ-পাতার একটা বুনো গন্ধ। আধাআধি উঠেই হাঁফ ধরে গেল কবিতার। দাঁড়িয়ে পড়ল সে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে।

'খানিক জিরিয়ে নিই, আর পারছি না!'

খপ করে ওর হাত ধরল নিজাম। সেও হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

'না!' আপত্তি জানাল কবিতা। 'এখন না।'

'কেনেগা? অহন না কেনেগা—মাগ্নী?' হ্যাঁচকা টানে বুকের উপর নিয়ে এল সে কবিতাকে। আঙুল তুলে দেখাল, 'ঐদ্যাখ! হালায় খাড়া উইঠা গেছে গা আসমানে। এইদিক দিয়া হান্দান যাইবো না বিরতে।'

কবিতা চেয়ে দেখল, সত্যিই, পাহাড়ের পিছন দিকটা একেবারে খাড়া হয়ে উঠে গেছে। বহু নিচে একচিলতে পানির রেখা দেখা যাচ্ছে সাদা ফিতের মত। এদিক থেকে কোন সুবিধে করা যাবে না। ভিতরে ঢুকতে হলে হয় পাঁচিল ডিঙাতে হবে, নয়তো ভাঙতে হবে গেট। আর কোন উপায় নেই।

জামা-কাপড়ের এখানে ওখানে ক্ষিপ্র হাতে টান পড়তেই অর্ধনগ্ন হয়ে পড়ল কবিতা।

'অ্যাই, অ্যাই··· কি হচ্ছে!' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল সে। কল্পনাও করতে পারেনি কবিতা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সাথে কেউ এরকম ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আচমকা ল্যাঙ খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। উঠে বসবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর নিজাম। 'অ্যাই, কাপড়টা নষ্ট হবে··· টের পেয়ে যাবে আলম!'

চড়াৎ করে চড় পড়ল কবিতার গালে।

'চোপ! খাবাদার! খুন কইরা ফালামু! এক্কেরে খামোস!' চাপা গর্জন করল নিজাম।

ধস্তাধস্তি করল কবিতা, কিন্তু অসুরের শক্তি এসে গেছে নিজামের গায়ে। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে রেখে অপর হাতে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলল ওকে। গলা দিয়ে বন্যজন্তুর মত কেমন একটা ঘরঘর আওয়াজ বেরোচ্ছে নিজামের, ঠোঁট দুটো সরে গেছে দাঁতের উপর থেকে।

এই ভয়ঙ্কর লোকটাকে খেলিয়ে, কিছুটা সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ ক্রীতদাস করে রাখবার শখ হয়েছিল কবিতার—কল্পনাও করতে পারেনি এমন নির্মম ভাবে ধর্ষিতা হবে। রাগে-দুঃখে ফোঁপাতে শুরু করল সে। চড়াৎ করে আরেকটা চড় পড়ল গালের উপর।

যতক্ষণ সম্ভব বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কবিতা, আঁচড়ে কামড়ে মুক্ত করার চেষ্টা করল নিজেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো সে আত্মসমর্পণ করতে। কয়েক মিনিট পর যখন সব ঝড় শান্ত হয়ে গেল, তখন

কিন্তু ক্ষোভের লেশমাত্রও রইল না কবিতার মানে। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে পরিতৃপ্তির চুমো খেলো সে নিজামের নোংরা চিবুকে, আবেশ জড়িত কণ্ঠে বলল, 'জানোয়ার!'

গটমট করে ঘরে ঢুকল বদরুদ্দিন।

নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে সিকান্দার বিল্লাকে ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে দেখে ঝাঁই করে মেজাজটা সপ্তমে উঠে গেল বদরুদ্দিনের। ইসলামাবাদ থেকে এইমাত্র কনফার্মেশন মেসেজ এসেছে—কোন সন্দেহ নেই যে এই মেয়েটাই হাস্না কাওসার, নয়াদিল্লীতে নাকি মহা হুলস্থূল পড়ে গেছে একে নিয়ে। গায়েব হয়ে গেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং গোপনীয় কিছু কাগজপত্র ও নকশার মাইক্রো ফিল্ম রয়েছে মেয়েটির কাছে—ফাঁস হয়ে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়বে ভারত। ইসলামাবাদের আদেশ যেমন করে পারো উদ্ধার করো ওকে—বেলা বাজে বারোটা, আর এই লোকটা নিশ্চিন্তে কান খোঁচাচ্ছে!

'কি আশ্চর্য! এখনও বসে রয়েছ?' কোন জবাব না দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে ওর দিকে বিল্লাকে চেয়ে থাকতে দেখে রীতিমত অপমানিত বোধ করল বদরুদ্দিন। 'রেগে আগুন হয়ে গেছে হেড অফিস!'

'কার ওপর?' কাঠিটা একবার শুঁকে নিয়ে ফেলে দিল বিল্লাহ অ্যাশট্রেতে।

'কার ওপর আবার? তোমার ওপর! হাতে পেয়েও হারিয়েছ তুমি ওকে।'

সোজা হয়ে বসল সিকান্দার বিল্লাহ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হলো বদরুদ্দিনের চোখে।

'সুখের বিষয়, কারও এক তরফা রিপোর্ট পেয়েই কাউকে বিচার করে না পি.সি. আই। আমার বক্তব্য জানাবার সুযোগও দেয়া হবে আমাকে। আমার কথা আমি বলব।'

'কি বলবে তোমার কথা? তুমি বলতে চাও, তোমার দোষে ছিনিয়ে নেয়নি ওরা হাস্না কাওসারকে?'

'না। আমার হাত থেকে নেয়নি। আমার কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছিলাম। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আপনার সোহাগের শাকিলা মির্জার হাতে।'

'সোহাগের শাকিলা মির্জা! কি বলছ বুঝে বলছ, বিল্লাহ?'

'ভুল বলেছিলাম। দুঃখিত। আমি বলতে চেয়েছিলাম, আপনার রক্ষিতা, বেশ্যা শাকিলা মির্জা!'

লাল হয়ে গেল বদরুদ্দিনের ফর্সা মুখটা। টাক পর্যন্ত গোলাপী হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের চোখের দিকে। চোখ না

সরিয়েই একটা সিগারেট ধরাল বিল্লাহ। মৃদু হেসে বলল, 'পাঁচজন গার্ড, তার ওপর শাকিলার মত একজন ট্রেইনড্ এজেন্ট এঁটে উঠতে পারল না দু'জনের বিরুদ্ধে, ধড়াদ্‌ধড় চিৎ হয়ে গেল—দোষটা আমার? যার তার ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেই হলো?'

'তুমি বলতে চাও, তোমাকে অনুসরণ করে মীরপুরে পৌঁছায়নি ওরা?'

'সেটা ওদের গুণ, স্বীকার করি, কিন্তু আমার দোষটা দেখছেন কোথায়?'

জবাব দিতে পারল না বদরুদ্দিন। বিফলতার দায় দায়িত্ব যে বিল্লাহ এত সহজে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারবে কল্পনাও করতে পারেনি সে। ওকে ফাঁসানো গেছে বলে মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছিল সে। এখন দেখছে পুরো ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়—এবং সেক্ষেত্রে দোষের একটা অংশ ওর নিজের ঘাড়েও এসে পড়ে। কারণ, মেয়েটাকে মীরপুরের সেই বাড়িতে শাকিলার চার্জে রাখার প্ল্যানটা ওর নিজের। যাইহোক, মুখে বলল, 'এসব আজেবাজে যুক্তি দিয়ে পার পাবে না, বিল্লাহ। কাজ দেখাও। এখানে বসে বসে মাছি তাড়ালে তো চলবে না, যেখান থেকে পারো, যেমন করে পারো উদ্ধার করে আনো ওকে। ফারুক হাসানের ইনফর্মেশন জানানো হয়েছে তোমাকে সকাল দশটায়··· গোলাম পাশাকে দেখা গেছে বিনা লাগেজে চট্টগ্রাম থেকে ফিরতে··· কি করেছ তুমি এই দুই ঘন্টা?'

'ঠিকানা বের করেছি।'

'ঠিকানা বের করেছ? কিসের ঠিকানা?'

'হাস্না কাওসারের। কক্সবাজারের তিন মাইল উত্তর পুবে "খান ভিলা"য় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। আর্মড গার্ড রয়েছে। বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে এমন ভাবে বসানো যে ডায়রেক্ট ফ্রন্টাল অ্যাটাক ছাড়া ওকে বের করে আনা অসম্ভব।'

হাঁ হয়ে গেল বদরুদ্দিনের মুখটা।

'কি-কি বলছ! এতসব খবর কোথায় পেলে তুমি?'

'জোগাড় করে এনেছি।'

'কিভাবে?'

'সোহেল আহমেদের পার্সোনাল সেক্রেটারিকে কিডন্যাপ করেছিলাম রাস্তা থেকে। একটা ইঞ্জেকশন পুশ করতেই গড় গড় করে বলে দিল সব।'

'সর্বনাশ! সোহেল আহমেদকে খেপিয়ে দিয়ে ভাল করোনি, বিল্লাহ! লোকটা ম্যান-ইটারের চেয়েও ডেঞ্জারাস! ঠ্যালা সামলানো মুশকিল হবে এখন! যাহোক, এই মুহূর্তে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না কোন। এখন কি ভাবছ বসে বসে?'

'গাড়ির অপেক্ষা করছি. আমার সুটকেসটা আনতে গেছে টিশতি। ভাবছি দেখে আসি কক্সবাজারটা।'

'অ্যাটাকের মধ্যে যাব না আমরা, অন্য কৌশল বের করতে হবে তোমার,' বলল বদরুদ্দিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে সিগারেট টানায় মন দিল সিকান্দার বিল্লাহ। কয়েক সেকেন্ড ওর নিষ্ঠুর মুখের উপর নজর বুলিয়ে নিয়ে চলে গেল বদরুদ্দিন নিজের কামরার দিকে।

তিন

'জেগেছে।' ছুটে এল রাবেয়া ব্যালকনিতে। 'জেগেছে হাস্না কাওসার!'

তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেয়ে ব্যালকনির ইজিচেয়ারে শুয়ে দক্ষিণের তারাজ্বলা আকাশে একটা উপগ্রহের মন্থর গতি দেখছিল রানা, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। উঠে বসল।

'এই সেরেছে। কি বলছে উঠে?'

'জানতে চাইছে ও কোথায়। আমার মনে হয় আপনার···'

'ঠিক বলেছেন। আসছি।'

লম্বা পা ফেলে রাবেয়ার পিছু পিছু হাস্নার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। ঘরে পুরু শেড দেয়া একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখ মেলল হাস্না কাওসার। ঘুমন্ত অবস্থাতেই অপূর্ব সুন্দর মনে হয়েছিল রানার মেয়েটিকে, আয়ত কাজল চোখ মেলতেই মহৎ কোন পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়ালে যে অনুভূতি হয় তেমনি একটা শিরশিরে কাঁপন অনুভব করল সে বুকের মধ্যে। আবছা-অন্ধকার সাজানো-গোছানো ঘরে হঠাৎ বাতি জ্বলে উঠলে যেমন ঝকঝক করে ওঠে ঘরটা, চোখ মেলতেই তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠেছে হাস্না কাওসারের মুখটা।

'কোথায় আছি আমি?' আকুল নয়নে চাইল মেয়েটি রানার মুখের দিকে। 'আপনি কে?'

'আমি রানা··· তোমার স্বামী···মাসুদ রানা।' হাস্নার একটা হাত তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিল রানা। 'তোমাকে বাড়ি নিয়ে এসেছি। সব ঠিক আছে। আর কোন চিন্তা নেই।'

'বাড়ি?' পাশ ফিরে মাথাটা উঁচু করল হাস্না কাওসার। 'কিছু তো মনে করতে পারছি না! আপনি···মানে, তুমি আমার স্বামী?'

'হ্যাঁ। চিনতে পারছ না আমাকে?'

'নাহ্!' কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বুজল মেয়েটা, আপন মনে বলল, 'এ ছাপ যদি না ওঠে? বিয়ের রাতে কি জবাব দেব বরকে!'

তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি।

'কি বললে?'

চোখ মেলল হাস্না কাওসার।

'কিছু বলেছি নাকি?'

'বলছিলে: এ ছাপ যদি না ওঠে? বিয়ের রাতে কি জবাব দেব বরকে!'

'তাই নাকি? কেন বললাম কথাটা! কি যেন নাম বললে তোমার?'

'মাসুদ রানা।'

'সত্যিই··· কিছু মনে নেই আমার। আমি জানতামই না যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আগে কোনদিন তোমাকে দেখেছি বলেও মনে হয় না।'

'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ডাক্তার বলেছে দুই একদিনের মধ্যে সব স্মৃতি ফিরে আসবে তোমার। কিছু মাথা ঘামিয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভয়ানক ক্লান্তি লাগছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল মেয়েটা। 'একসময় আমার মনে হয়েছিল হাসপাতালে আছি।'

'তাই তো ছিলে। শরীর অনেকটা ভাল হওয়ায় বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'সুন্দর ঘরটা।' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল হাস্না, দৃষ্টি ফিরে এসে আবার স্থির হলো রানার মুখের উপর। 'কি নাম যেন বললে···রানা? রানা তোমার নাম?'

'হ্যাঁ। মাসুদ রানা। মাথার কাছে এই ড্রয়ারে তোমার প্যাসপোর্ট রয়েছে, হাস্না। পরে এক সময় ঘেঁটে দেখো, স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। না, এখন না···এখন তোমার ঘুম দরকার। ঘুমোবার চেষ্টা করো। কাল সকালে উঠে দেখবে বেশ অনেকটা ভাল লাগছে। কিছু ভেবো না, আমি সব সময় তোমার পাশে আছি। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কি নামে ডাকলে আমাকে? হাস্না, হাস্না আমার নাম?'

'হ্যাঁ। এটাও মনে নেই বুঝি? হাস্না কাওসার।'

'জানতাম না।' আবার একবার রানার মুখটা পরীক্ষা করল হাস্না। 'সত্যিই তুমি আমার স্বামী?'

'কোন সন্দেহ নেই,' ওর পিঠে মৃদু দুটো চাপড় দিল রানা হাসিমুখে। 'নাও, এবার ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মী?'

'তুমি ঘুমাবে না?' পাশ ফিরে বিছানা দেখল হাস্না। 'তোমার বালিশ কোথায়?'

'ও, বালিশ দেয়নি বুঝি? তা সবে তো এখন সন্ধে. দেবে পরে···তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

নিশ্চিন্তে চোখ বুজল হাস্না কাওসার। বিড়বিড় করে বলল, 'ভাল লাগছে।' তারপর ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

ব্যালকনিতে ফিরে এল রানা। পিছু পিছু এল রাবেয়া। বসল একটা ফোল্ডিং চেয়ারে।

'বাপ্পা! দারুণ অভিনয় করেছেন কিন্তু! আগে থেকে জানা না থাকলে আমিও বিশ্বাস করে ফেলতাম যে আপনি ওর স্বামী।'

'কিন্তু বালিশ? এটার কি ব্যবস্থা করা যায়?'

রাবেয়াকে চিন্তিত দেখাল। 'সত্যিই। প্রশ্নটা যখন উঠে পড়েছে, আলাদা ঘরে ঘুমানো আপনার ঠিক হবে না। বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ঠিক মন থেকে গ্রহণ করতে পারছেন না আপনি। আর কেউ হলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে লুফে নিত এই সুযোগ। কিন্তু ভাল না লাগলেও আর তো কোন উপায়ও নেই এখন।'

'ভাল আমার সত্যিই লাগছে না, কিন্তু সেটা আপনি বুঝলেন কি করে?'

'মানুষ চেনার ব্যাপারে মেয়েদের জুড়ি নেই। দশ মিনিটের পরিচয়েই টের পেয়ে যাই আমরা কে কেমন। গত চব্বিশ ঘণ্টা আপনার কাছাকাছি থাকবার সুযোগ পেয়েও চিনতে না পারার কি আছে? অভিনয় করতে হচ্ছে করছেন, কিন্তু একটা মেয়েকে ঠকিয়ে নিজের লালসা চরিতার্থ করবার লোক আপনি নন।'

'বুঝলাম, খুব ভাল লোক আমি. কিন্তু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মেয়েটা যদি কিছু চরিতার্থ করতে চায়, তখন?'

হেসে উঠল রাবেয়া মজুমদার। হাসতে হাসতে বলল, 'যাহ্, মেয়েরা এত খারাপ না!' তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'নিজের স্বামীর কাছে যে-কোন মেয়ে এটা তো আশা করতেই পারে···তখন, মৃম্‌ম্···উঁহু, কোন উপায় দেখছি না!' হেসে ফেলল আবার।

'আপনি হাসছেন, আমার কাছে চিটিংবাজ মনে হচ্ছে নিজেকে। সাধুপুরুষ নই আমি, ব্রহ্মচারী বিড়াল-তপস্বীও নই। কিন্তু তাই বলে আলাপ নেই, পরিচয় নেই, চেনা নেই, জানা নেই···নাহ্, এভাবে কিছুতেই···'

'একটা উপায় আছে,' বলল রাবেয়া। 'আজ রাতের মত আপনাকে উদ্ধার করতে পারি। মাইল্ড সিডেটিভ দিলে ভোর পর্যন্ত ঘুমাবে, এক্টোনা, জানাবে না আপনাকে। কিন্তু বলা যায় না, হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে আপনাকে পাশে না পায় তাহলে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—তাই আপনার ওইখানেই শোয়া

দরকার।'

'ওড!' হাসল রানা সমাধান পেয়ে। 'আমাকেও খানিক ঔষধ খাইয়ে দিলে কেমন হয়? শুধু আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছেন কেন, ওর দিকটাও তো আপনার ভাবতে হবে!'

'প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। রুচি সে রকম হলে অনেক আগেই আমার বুকে হাত দিয়ে বসতেন।'

'আপনার বুক আছে নাকি? আপনি না নার্স? নিঃস্বার্থ সেবিকা?'

'উল্টো কথা শোনাচ্ছেন। লোকে মুখে বলে সিসটার, কিন্তু লোভী নজর সরাতে চায় না বুকের ওপর থেকে। আমাদের কেউ আবার ভদ্রমহিলা বলে গণ্য করে নাকি? আমি একজনাকে বলতে শুনেছি: হ্যাগো যেইহানে টান দেয় হেইহানেই যায় গা—বেশ্যার নাহাল।'

উঠে পড়ল রাবেয়া।

'উঠছেন কেন? বেশ তো জমেছিল। আসুন না, গল্প করি?'

'আসছি। ওষুধটা খাইয়ে আসি। আপনার ঘুম পায়নি বুঝি?'

'নাহ্। বারোটার আগে ঘুম আসে না আমার।'

তিন মিনিটেই ফিরে এল রাবেয়া। অনেক রাত পর্যন্ত অনেক আলাপ হলো ওদের মধ্যে। কথায় কথায় জেনে নিল রানা মেয়েটার জীবনের আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতার কথা। কত আর বয়স হবে—বাইশ কি তেইশ। এরই মধ্যে জগৎ-সংসারের বহু রূপ দেখে নিয়েছে সে। বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিল এক বড়লোক ফ্যামিলির তৃতীয় পুত্রকে। ছেলে মারা যাওয়ার পর বের করে দেয়া হয়েছে ওকে শ্বশুরবাড়ি থেকে। পথে-ঘাটে অনেক আছাড় খেয়েছে সে, কিন্তু নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দেয়নি কিছুতেই। জীবিকার জন্যে এই পেশা গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু ও জানে, ঘর-সংসার আর সন্তান ছাড়া নারীর জীবন পরিপূর্ণ বা সার্থক হতে পারে না—মনের মত মানুষ পেলে আবার বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে। এত ঠোকর খেয়েও পরাজয় মানেনি মেয়েটা, বিতৃষ্ণা আসেনি ওর জীবনের প্রতি। ভাল লাগল রানার। নিজের বিচিত্র জীবনের অনেক কথাই বলল সে ওকে। অনীতা আর সোহানার গল্প শোনাল। মজার মজার চুটকি শুনিয়ে হাসাল। একসময় পা টিপে কিচেনে গিয়ে দু'কাপ কফি করে নিয়ে এল রাবেয়া। হাসি-গল্পে সহজ সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল ওদের মধ্যে। দু'জনেই স্থির করল, যতদিন সম্ভব বজায় রাখবে এই বন্ধুত্ব।

রাত একটার দিকে উঠে পড়ল ওরা। আলোতে এসে হঠাৎ খেয়াল করল রানা কেমন যেন অন্য রকম লাগছে রাবেয়াকে। চোখ গেল চুলের দিকে।

সেই লম্বা চুল আর নেই।

'আরে! চুলগুলো ছোট হয়ে গেল কি করে?'

'ছেঁটে ফেলেছি। কেন, খারাপ লাগছে দেখতে?'

'না। বরং আরও অনেক ভাল লাগছে। কিন্তু কখন ছাঁটলেন?'

'সন্ধের সময়।'

'কেন? হঠাৎ?'

'আপনার চোখে সুন্দর হওয়ার জন্যে।' মাথা নিচু করল রাবেয়া। 'আপনাকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।' বলতে বলতে লজ্জায় গোলাপী হয়ে গেল রাবেয়ার গাল। 'তখন জানতাম না বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চাইছি।'

'আমি চাঁদ নহি—অভিশাপ!' গম্ভীর ভাবে বলল রানা নজরুলের একটা গানের লাইন। তারপর হাসল। 'লম্বা হলেই কি চাঁদ ধরা যায়? তাছাড়া ধরে ফেলার চেয়ে আমাদের মধ্যে যে মিষ্টি বন্ধুত্ব গড়ে উঠল সেটাই অনেক ভাল না?'

'অনেক ভাল। অনেক সুন্দর। আগে কখনও ভাবিনি এটা সম্ভব।'

'ভেরি গুড।' রাবেয়ার চিবুক নেড়ে দিয়ে বিদায় নিল রানা। নিজের ঘর থেকে দুটো বালিশ দুই বগলে চেপে ধরে হান্নার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চাইল সে রাবেয়ার ঘরের দরজার দিকে। দরজা খোলা, ঘরটা অন্ধকার, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাবেয়া এইদিকে চেয়ে। তিন সেকেন্ড দ্বিধা করল রানা, তারপর নীরবে টাটা করে ঢুকে পড়ল হান্নার ঘরে, বন্ধ করে দিল দরজা।

চার

'আর উঠতে পারব না,' পাহাড়ের অর্ধেক উঠেই হাঁপাতে হাঁপাতে একটা শালগাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল মোহাম্মদ আলমগীর। 'আমার ফোবিয়া মত আছে, পাহাড়ে উঠলে আর নামতে পারি না। একবার বাটালি হিলের মাথায় উঠে…'

'আপনি বোইয়া থাকেন এই হানে. আমি দেইখা আহি।'

'দাঁড়ান, আমি আসছি,' নিজামকে পা বাড়াতে দেখে চট করে বলল রবিনা।

'তোমার আবার যাওয়ার দরকার কি? ও-ই দেখে আসুক না।' রাগ রাগ

কণ্ঠে বলল আলমগীর।

'গাঙ্গুলী দা'র কথা মনে নেই? তুমি না গেলে যেতেই হবে আমাকে। হি ইজ জাস্ট আ মেশিন, উই আর দা ব্রেইনস্ বিহাইন্ড দিস্ অপারেশন।'

'কি উইলো? গাইল পারেন নিকি? বাল্য অইবো না কোলাম।'

'আই ডোন্ট রিলাই অন দিস্ ম্যান,' বলল আলমগীর। 'হি মে রেপ ইউ!'

'আরে না, কোন ভয় নেই। তুমি চুপটি করে-বসে থাকো, এক্ষুণি ঘুরে আসছি আমরা।'

'ওপরে পাহারার ব্যবস্থা থাকতে পারে। কুকুর থাকাও বিচিত্র নয়! হয়তো অপেক্ষা করছে...'

'অনর্থক দুশ্চিন্তা করছ, আলম। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল রয়েছে নিজামের কাছে।'

আর কোন কথা বলল না আলমগীর। নিজামের সাথে কবিতার একা পাহাড়ে ওঠায় যে ওর সমর্থন নেই, সেটা বোঝাবার জন্যে বিরক্ত ভঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। অন্ধকারে দেখা গেল না, তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল কবিতার ঠোঁটে। হাঁটতে শুরু করল নিজামের পিছু পিছু।

সন্ধের পর পরই ফিরে গিয়েছিল ওরা কটেজে। নাইট গ্লাস রয়েছে নিজামের সুটকেসে। স্থির হলো, খাওয়া-দাওয়া সেরে আজই রাতে ওটা নিয়ে আবার যাবে ওরা, উঠবে খান ভিলার পিছনের পাহাড়ে। ওখান থেকে সবকিছু দেখা যাবে পরিষ্কার। ভিতরের অবস্থা বুঝে নিয়ে কাজ সমাধার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে অসুবিধে হবে না।

খাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়েই রওনা হয়ে গিয়েছে ওরা। আলমগীরকে রেখে আসতে চেয়েছিল কবিতা, জোরাজুরি করায় আনতে হয়েছে সাথে। ভাগ্যিস পাহাড়ে উঠতে ভয় পায় আলমগীর, নইলে মাটি করে দিত আজকের রাতটা।

কিছুদূর বেশ তরতর করে উঠে গেল ওরা, তারপর দুর্গম হয়ে উঠল পাহাড়টা। বিপজ্জনক কয়েকটা খাড়াই কোনমতে আঁচড়ে-খামচে উঠে আর উপরে ওঠার কোন রাস্তা দেখল না ওরা। গাছের শিকড়-বাকড় ধরে কয়েকগজ সরে গেল নিজাম, কবিতাকে সাহায্য করল সরে আসতে; তারপর আবার শুরু হলো ওঠা।

চূড়া থেকে গজ পঁচিশেক নিচে থেমে দাঁড়াল নিজাম। আঙুল বাড়িয়ে একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখাল সামনের দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খান ভিলার ছাতের একাংশ। একহাতে কবিতার কোমর জড়িয়ে ধরে আরও খানিক বাঁয়ে সরে গেল নিজাম। দেখা যাচ্ছে ব্যালকনি। মানুষের আভাস

পেয়ে গলায় ঝুলানো নাইট-গ্লাসটা চোখে তুলল নিজাম।

ত্রিশ গজ নিচে প্রায় একশো গজ দূরে ব্যালকনির উপর সোজা নিজামের দিকে মুখ করে বসে আছে মাসুদ রানা। তার সামনে বসে মাথা নেড়ে গল্প করছে একটা বব-ছাঁটা চুলের মেয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। রিনকিউলারটা কবিতার হাতে দিল নিজাম। চাপা গলায় বলল, 'ঐদ্যাহো—মারানী!'

চমকে উঠল মোহাম্মদ আলমগীর। গাছের গুঁড়িতে বসে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সে নিজামের কথাটা। মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে তাহলে নিজাম!

'কিন্তু এতদূর থেকে তোমার পিস্তলে কোন কাজ হবে না।' কবিতার গলা। খুবই নিচু গলায় কথা বলল কবিতা, কিন্তু প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার কানে এল আলমগীরের। চারপাশে চেয়ে বুঝল সামনের মস্ত খাদের জন্যে ঘটছে ব্যাপারটা—নিঝুম রাত আর দক্ষিণের হাওয়া তো আছেই।

'হ, রাইফেল লাগবো। ইস্কোপ লাগবো। সাইলেন্সার লাগবো। জান লইয়া ভাগতে হইলে সাইলেন্সার ছাড়া কাম অইবো না।' আবার নিজামের কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে, কাল সকালেই এসবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এইখান থেকেই কাজ সারতে চাও?'

'কাইলকার কাম কাইল দ্যাহা যাইবো। আইজকার কাম সাইরা লই, আহো।'

'অ্যাই! আবার কি!' কবিতার কপট ধমক শোনা গেল। 'একবারে শখ মেটেনি বুঝি?'

'তুমার খাউজানি মিটছে?'

চাপা গলায় খিলখিল হেসে উঠল কবিতা, 'না!'

আদর করে গালি দিল নিজাম। '—মারানী।'

আবার কবিতার বেহায়া হাসি।

কানে আঙুল দিল আলমগীর। রাগে দুঃখে জল বেরিয়ে এসেছে ওর চোখে। কিসের ছলনায় ভুলেছিল সে এতদিন! কোথায় নেমেছে সে ছলনায় ভুলে। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই, তারপর কবিতার মৃদু আদুরে গলা শোনা গেল, 'জানোয়ার।'

রাত দুটোয় পৌঁছল কক্সবাজারে সিকান্দার বিল্লাহ আর চিশতি হারুন। মোটেল, হোটেল বা কটেজের ঝামেলা নেই, আগে থেকে যোগাযোগ করে এসেছে ওরা জাফরের সাথে। সোজা গিয়ে উঠল ওর বাসায়।

পাতলা-সাতলা, লম্বা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক জাফর। চট্টগ্রাম থেকেই পিকাপ

করা হয়েছে ওকে। বিহারী। গোটা চট্টগ্রাম জেলা ওর নখদর্পণে। সিকান্দার বিল্লাহ হচ্ছে ওর আদর্শ। তাকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে পাবে, কল্পনাও করতে পারেনি সে। বাংলাদেশ-চীফ বদরুদ্দিনের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে ওর। স্থানীয় ম্যাপ সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে সে বিল্লার জন্যে।

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই কাজের কথা তুলল জাফর।

'ভিলাটা দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। মেশিনগান নিয়ে জায়গায় জায়গায় বসে আছে ট্রেইনড্ আর্মি।' বলতে বলতে ম্যাপটা খুলে একটা টেবিলের উপর বিছাল জাফর। 'এই যে, এইটা হচ্ছে খান ভিলা।'

ম্যাপের উপর চোখ বুলাল সিকান্দার বিল্লাহ। পিছনের পাহাড়টার উপর টোকা দিল।

'এই পাহাড়টা কত উঁচু? মাঝখানটায় পানি কিসের?'

'ওটা অনেক উঁচু পাহাড়। অবজার্ভেশন টাওয়ার হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে হয়তো, তাছাড়া আর কোন লাভ নেই। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ছোটখাট একটা খালের মত ঝর্ণা। তারপরেই একেবারে খাড়াভাবে উঠে গেছে খান ভিলার পাহাড়—ওদিক থেকে ওপরে উঠতে হলে স্যার হিলারীকে ডেকে আনতে হবে।'

'দরকার হলে প্ল্যাঙ্কেটের মাধ্যমে ডাকা যাবে হিলারীকে, আপাতত খাবার কি আছে বের করো। খেয়েদেয়ে লম্বা এক ঘুম দেব। উঠব কাল বেলা ঠিক সাড়ে এগারোটায়। ইতিমধ্যে তুমি ওই পাহাড়ের ওপর উঠে নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে আসবে। ঠিক বারোটায় সময় নাস্তা এবং ইনফর্মেশন হাজির চাই। অলরাইট?'

'অলরাইট, স্যার।'

খুব ভোরে ফোন এল সোহেলের কাছ থেকে।

'দোস্ত, নতুন খবর কিছু আছে?'

'নাহ্, ঘুম ভেঙেছে ওর, কিন্তু জানাবার মত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হঠাৎ আপন মনে বলল: এ ছাপ যদি না ওঠে? বিয়ের রাতে কি জবাব দেব বরকে?— বাস। মানেটা ঠিক বোঝা গেল না। রাতে আবার ঘুমের ঘোরে হঠাৎ বলে উঠল: ম্যাই রিম্মা, রোকেয়া হল যাবে?—তারপর আমার গায়ে পা তুলে দিল পাশ ফিরে। কিছু বুঝলি এ থেকে?'

'গায়ে পা-তুলে দিল মানে?' আঁৎকে উঠল সোহেল, তারপর বলল,

'বুঝলাম, শালা খুব মৌজে আছ! একটা দিনও তর সইল না. গল্প। য়াতেই চান্স নিয়ে নি-ি? তুই মানুষ, না গাড়োল রে?'

হাসল রানা। বলল, 'এত সকালে কি মনে করে? কিছু সংবাদ আছে মনে হচ্ছে?'

'দুঃসংবাদ। ভারত বা পাকিস্তান কোন তরফেরই কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না আর। মেয়েটার ঠিকানা জেনে নেয়ার পর থেকে একেবারে চুপ, কোথাও কোন মুভমেন্ট নেই। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে গার্ড বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও চোখে কিছুই পড়েনি দেখে হঠাৎ একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে মনের ভিতর। মনে হচ্ছে একটা চিড়িয়াও আর আমাদের খাঁচায় নেই।'

'ভাবছিস তোদের ব্যারিয়ার ক্রস করে চলে এসেছে এখানে?'

'বড় সাহেবেরও তাই ধারণা। আরও ছয়জন গার্ড রওনা করে দিয়েছি আমি ওঁর হুকুম মত। উনি বলছেন, কোন অবস্থাতেই মেয়েটা যেন খোলা জায়গায় না যায়—বিশেষ করে ব্যালকনিতে যেন একেবারেই না যায়। কারণ, পিছনের পাহাড় থেকে নাকি ইচ্ছে করলেই যে-কোন লোক, যদি ভাল হাত হয়, লাগিয়ে দিতে পারবে গুলি।'

'কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। ভালই হলো, মনে করিয়ে দিলি। এক্ষুণি হাবিলদারের সাথে কথা বলছি আমি। পিছনের পাহাড়ে পাহারার ব্যবস্থা করতে বলব ওকে।'

'ঠিক আছে, তাই কর্। নতুন কিছু ঘটলে জানাবি। এখানে সবার অবস্থা বুঝতেই পারছিস। রাখলাম।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো রানা হাবিলদার শামসুদ্দিনের কোয়ার্টারে। ঢাকায় যে প্রতিপক্ষের কাউকে স্পট করা যাচ্ছে না, এবং হেড অফিস মনে করছে যে ওরা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে কক্সবাজারে, একথা জানিয়ে পিছনের পাহাড়ে পাহারার ব্যবস্থা করতে বলল রানা ওকে। হেসে উড়িয়ে দিল হাবিলদার কথাটা।

'ওসব নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না, স্যার। কোথা দিয়ে কে কি করতে পারে সব জানা আছে আমার। আমাদের চোখ এড়িয়ে ওই পাহাড়ে উঠবারই উপায় নেই। আপনি মেয়েটার দেখাশোনা করুন স্যার, গোলমাল দেখাশোনার জন্যে আমি আছি।'

বিরক্ত হলো রানা লোকটার উপর। কড়া গলায় বলল, 'অযথা তর্ক না করে আমি যা বলছি তাই করুন। পিছন দিক থেকে যদি পাহাড়ে ওঠে কেউ, কিভাবে নজর রাখছেন তার ওপর?'

'আমি অযথা তর্ক করছি না, স্যার। যা জানেন না তাই নিয়ে তর্ক আপনি করছেন। এই পাহাড়ের পিছনটা যেমন খাড়া, ওটারও ঠিক তাই—আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। কারও সাধ্য নেই ওদিক দিয়ে ওঠে।'

'দু'জন লোক চাই আমি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ওই পাহাড়ের ওপর।' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। একটু ভেবে যোগ করল, 'সেইসাথে একটা কুকুরও দেবেন। এটা অর্ডার।'

রেগে গেল হাবিলদার সিভিলিয়ানের মাতব্বরি দেখে। লাল হয়ে উঠল ওর মুখটা। কিন্তু বুঝতে পারল ভুল বলুক আর ঠিক বলুক, এই লোকের আদেশ মান্য করতে সে বাধ্য। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রাগ সামলে নিয়ে বলল : 'ঠিক আছে, যা চান তাই হবে। দু'জন লোক কমে যাচ্ছে এখানে, এই যা। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আমাদের ডিফেন্স।'

'আরও ছয়জন লোক পেয়ে যাচ্ছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। দু'জনকে পাঠিয়ে দিন। এক্ষুণি।'

•

দেশী বিদেশী পনেরো-বিশজন যাত্রী নামল ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান থেকে। টুরিস্টদের ভিড়ে মিশে প্লেন থেকে নেমে এল একজন গগল্‌স্ আঁটা সুন্দরী তরুণী, হাতে একটা বেহালার বাক্স। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে বসে মিনিট বিশেক চুইংগাম চিবোল মেয়েটা, তারপর ছোট্ট একটা সুটকেস উদ্ধার করে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

এত ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে বলে বিরক্ত ভঙ্গিতে মরিস মাইনরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মোহাম্মদ আলমগীর, মেয়েটিকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চাইতে দেখে এগিয়ে গেল সামনে। নেপালী নেপালী চেহারা মেয়েটির। আলমগীর বাংলা বলবে, না ইংরেজী ভেবে স্থির করবার আগেই পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'আপনি মিস্টার আলমগীর?'

'হ্যাঁ। এই যে, এই গাড়ি। এনেছেন ওটা?'

'এনেছি।'

'তাহলে উঠে পড়ুন।'

ভায়োলিন আর সুটকেস নিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসল মেয়েটি। গাড়ি ছেড়ে দিল আলমগীর। এয়ারপোর্ট থেকে কটেজ পর্যন্ত চুপচাপ চলে এল ওরা, কারও মুখে কোন কথা নেই। গাড়ি এসে পৌঁছুতেই কটেজের দরজা খুলে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল কবিতা মেয়েটিকে, কিন্তু মৃদু হেসে মাথা নাড়ল সে।

'ভিতরে যেতে পারব না, কবিতা দি। আমি ইন্ডিয়ান, বেড়াতে

এসেছি—হোটেলে সীট বুক করা আছে। তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। উনি দয়া করে একটা লিফট দিতে চাইলেন, তাই এলাম সাথে। বেহালাটা পছন্দ হলো কিনা জানাতে বলেছে গাঙ্গুলী দা।' আঙুল তুলে একটা দালানের দিকে দেখাল। 'ঐটেই তো হোটেল, তাই না? আচ্ছা, চলি, নমস্কার। চলি জামাইবাবু, নমস্কার।'

আলমগীরও দু'হাত জড়ো করে ঘাড় কাৎ করল। নিজামের বিদ্রূপাত্মক হাসি কানে যেতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে ভাবল: আরে, সত্যিই তো! আমি এদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করছি কেন!

বেহায়ার মত দেহের যত্রতত্র দৃষ্টি বুলিয়ে নেপালী চেহারার মেয়েটার শরীরটা শিরশিরিয়ে দিয়ে গাড়ির পিছনের সীট থেকে বেহালার বাক্স তুলে নিল নিজাম। সোজা গিয়ে ঢুকল আলমগীর-কবিতার বেডরুমে। পিছু পিছু ঢুকল ওরাও।

চমৎকার একটা পয়েন্ট টুটু রাইফেল বেহালার বাক্সে দুই টুকরো করে রাখা। পাশে একটা উইভার ভ্যারিয়েবল টেলিস্কোপিক সাইট, আর হাত খানেক লম্বা সাইলেন্সার। এক বাক্স ইলির হাই ভেলোসিটি লঙ রাইফেল গুলিও রয়েছে ছোট্ট খোপের মধ্যে। আর রয়েছে একটা সিঙ্গার-মেশিন মডেলের স্ক্রু ড্রাইভার।

দক্ষ হাতে দুই মিনিটের মধ্যে রেডি করে ফেলল নিজাম রাইফেলটা। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে জিনিসটাকে টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার ফিট করায়। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠল আলমগীরের। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নিজাম। দূরে দেখা যাচ্ছে, হোটেলের দিকে হাঁটছে মেয়েটা সুটকেস হাতে। রাইফেলটা কাঁধে তুলে মেয়েটির পিছন দিকে তাক করল নিজাম। স্কোপের ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ উপভোগ করল মেয়েটির চলার ছন্দ, নিতম্বের দুলুনি, তারপর ফিরল আলমগীরের দিকে, হাসল নোংরা দাঁত বের করে।

'ধইর‍্যা লন, বেহেস্তে গেছে গা—মায়ানী।'

পাঁচ

'কেমন ঘুম হলো?' ফোলা ফোলা চেহারা নিয়ে রাবেয়া মজুমদারকে নাস্তার টেবিলে এসে বসতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘুম হলো কোথায়! সারা রাত তো চিন্তায় জ্বলে মরলাম।'

'কিসের হিংসা? কার প্রতি?'

'ওই মেয়েটা,' চোখের ইশারায় হান্নার ঘর দেখাল রাবেয়া। হাসল। 'যাই হোক, রাতে উঠেছিল? আর কিছু জানা গেল ওর কাছে?'

'ঘুমের ঘোরে একবার বিড়বিড় করে এক রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল রোকেয়া হলে যাবে কিনা। তারপর পাশ ফিরে ঢলে পড়ল আবার গভীর ঘুমে। দেখি, সকালে উঠে হয়তো অবস্থার উন্নতি হতে পারে? ওঠেনি এখনও?'

'না। উঠব উঠব করছে। নাস্তা সেরেই যাচ্ছি আমি।'

কোন রকমে নাকে মুখে চারটে গুঁজে চা না খেয়েই ছুটল রাবেয়া ডিউটিতে। গোটা কয়েক পুরানো টাইম, নিউজউইক ঘেঁটে ঘণ্টা দুয়েক পার করল রানা। ঢাকায় ফোন করে গিলটি মিঞার সাথে কথা বলল মিনিট পাঁচেক, কয়েকটা কাজের ভার দিল ওকে। তারপর টোকা দিল হান্নার বেডরুমের দরজায়।

'এক মিনিট···খুলছি।' ভিতর থেকে রাবেয়া মজুমদারের গলা ভেসে এল।

ব্যালকনিতে একটা টেবিলের উপর গতকালকের দৈনিক সুপ্রভাত দেখে প্রথম পৃষ্ঠার হেডিংগুলোর উপর চোখ বুলাল রানা। বন্ধ দরজার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে শেষের পাতার হেডিং স্পোর্টস নিউজগুলো পড়ল। বিজ্ঞাপন-ঠাসা মাঝের পাতাগুলো উল্টে দেখে আবার যখন সে প্রথম পাতায় ফিরে এল, তখন খুট করে খুলে গেল দরজার ছিটকিনি। রাবেয়ার মুখ দেখা গেল দরজার ফাঁকে।

'কেমন আছে আপনার পেশেন্ট?' স্বামীসুলভ কপট উদ্বেগ প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

ভ্রূকুটি করল রাবেয়া, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ভাল। আসুন, ভেতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকে দেরির কারণ বুঝতে পারল রানা। কাপড় ছাড়ছিল হান্না। মেয়েদের এই একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারে না রানা, পুরুষের সামনে লজ্জায় যতই লাল হোক, যে-কোন মেয়ের সামনে দিব্যি ন্যাংটো হয়ে যেতে তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা করে না।

অপূর্ব সুন্দর একটা ভয়েলি শিফন পরেছে হান্না। মনে মনে রাবেয়ার পছন্দের প্রশংসা না করে পারল না রানা। গোলাপী রঙে চমৎকার মানিয়েছে হান্নাকে। ইন্টিমেটের গন্ধে ভুরভুর করছে ঘরের বাতাস। জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে মৃদু হাসল হান্না রানার দিকে চেয়ে।

'কেমন বোধ করছ, হান্না?' চোখের কোণে লক্ষ করল রানা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রাবেয়া।

'এই মেয়েটা কে?' জিজ্ঞেস করল হান্না। 'দেখতে কিন্তু ভারি মিষ্টি।'

'তোমার নার্স। কেমন আছ আজ?'

'খুব ভাল লাগছে।' জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চাইল। 'এটা কোন্ জায়গা?'

'কক্সবাজার।'

'সাগর দেখে বেড়াতে ইচ্ছে করছে খুব। যাবে?'

'সর্বনাশ!' ভুরুজোড়া কপালে তুলল রানা। 'কান ছিঁড়ে নেবে ডাক্তার! বেশি আলোতে যাওয়া একদম মানা। সেরে না উঠলে বেরোতে পারবে না ঘর থেকে।'

অবাক দৃষ্টি রাখল হান্না রানার মুখের উপর।

'কিন্তু আলো-বাতাস তো রোগ সারতে আরও সাহায্য করে।'

'সব রোগ নয়। তোমারটা স্পেশাল রোগ। ডাক্তার পই-পই করে বারণ করেছে। বলে দিয়েছে: যদি স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চান, ঘর থেকে বের হতে দেবেন না এক সপ্তাহ। কষ্ট হবে, বিরক্তি লাগবে, একঘেয়ে লাগবে—কিন্তু ক'টা দিন ওই চৌকাঠ ডিঙানো উচিত হবে না তোমার। যদি যাও, ডাক্তার বলেছে, হয়তো কোনদিনই ফিরবে না আর স্মৃতি। কড়া ওষুধ চলছে তো! দারুণ কড়া!'

'ও, আচ্ছা।' অকাট মিথ্যেটা সহজ ভাবেই মেনে নিল হান্না। মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড ভাবল, তারপর আবার চাইল রানার মুখের দিকে। 'আশ্চর্য লাগছে…শুধু আশ্চর্য নয় উদ্ভট মনে হচ্ছে আমার কাছে। বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে বিয়ে হয়েছে আমার। আচ্ছা, সত্যিই তুমি আমার স্বামী?'

'বিশ্বাস না হয় বিয়ের সার্টিফিকেট দেখো না? ওই ড্রয়ারেই রয়েছে পাসপোর্টের সাথে।' হালকা সুরে হেসে উঠল রানা, যেন বিশ্বাস না হওয়াটা সত্যিই খুব হাসির ও মজার ব্যাপার। 'সত্যিই, হান্না, সত্যিই বিয়ে হয়েছে আমাদের।'

'অথচ কিচ্ছু মনে আসছে না আমার।' রানার একটা হাত টেনে নিজের কোলের উপর রাখল। 'মনে হচ্ছে কোন দিন দেখিনি তোমাকে আগে। ড্রয়ার খুলে দেখেছি আমি ওগুলো। কেমন যেন স্বপ্নের মত লাগছে। কিন্তু আবার এটাও ঠিক, তোমার মতন লোকই আমার পছন্দ। আচ্ছা…আমাদের কি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল।'

'আশ্চর্য! কিচ্ছুই মনে নেই তোমার?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা।

'গভীর প্রেম! তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই প্রতিজ্ঞা, আজমির শরীফে মানত, নয়াদিল্লীর সেই হোটেল···কিচ্ছু মনে নেই?'

মাথাটা একপাশে কাৎ করে ভুরু কুঁচকে অতীতের ঘটনা মনে করবার চেষ্টা করল হান্না, তারপর ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল।

'কিচ্ছু না। মনে হচ্ছে সাদা একটা দেয়াল দেখতে পাচ্ছি সামনে। আচ্ছা, বিয়ে হয়েছে আমাদের কতদিন হলো?'

'তিন বছর।'

'ছেলে-মেয়ে নেই আমাদের?'

'না।'

'কেন?'

বিপদে পড়ল রানা। মাথার পিছনটা চুলকে বুদ্ধি বের করবার চেষ্টা করল।

'সংসার গুছিয়ে বসবারই তো সময় পেলাম না আমরা দৌড়াদৌড়ির ঠেলায়। বিয়ের পর পরই বিদেশ গেলাম, ফিরে এসে আজ এখানে, কাল ওখানে—ছুটোছুটির কি অন্ত আছে? ব্যবসা একটা দাঁড় করানো কি সোজা কথা? অথচ তুমি জেদ ধরে রইলে, নিজেদের একটা বাড়ি হলে তারপর ছেলেমেয়ের প্রশ্ন—তার আগে নয়।'

'হয়েছে বাড়ি?'

'প্রায়। রেজিস্ট্রি হয়নি এখনও···হয়ে যাবে কিছুদিনের···'

'কিসের ব্যবসা তোমার?'

'ইন্ডেন্টিং। বড়সড় একটা ডিলের ব্যাপারে এই বাড়িটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছি।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আনমনে কথা শুনছিল হান্না, রানা অনুভব করল একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল হান্নার শরীর। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'বিরাট কোন কেউকেটা লোক নাকি তুমি, রানা?'

'না, না। বিরাট কিছু না। মাঝারির চেয়ে একটু ওপরে বলা যায়···তার বেশি কিছু না। কেন?'

'আর্মি টহল দিয়ে ফিরছে কেন তাহলে? ওই ওপাশে ঝোপের আড়ালে একজন আবার শুয়ে আছে মেশিনগান নিয়ে।'

'ও, এরা? আমাকে পাহারা দিচ্ছে না এরা।' হালকা সুরে বলল রানা। 'বড়সড় একটা ডিল করতে যাচ্ছি বাংলাদেশ আর্মির সাথে। ওয়্যারলেস ইকুইপমেন্ট সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে। দু'একদিনের মধ্যেই একজন জেনারেল আসছেন এখানে—নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাঁর জন্যে।'

'ও।' রানার চোখের উপর স্থির হলো হান্নার আয়ত চোখের দৃষ্টি। 'এ

কথা জিজ্ঞেস করছি বলে রাগ করছ না তো? আসলে জানো, কিছু মনে নেই তো—তাই কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে সবকিছু, জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হচ্ছে সব।'

'তাতে রাগ করার কি আছে? এসব থেকেই হঠাৎ হয়তো দেখবে চট্ করে ফিরে এসেছে স্মৃতি।'

'সব ভুলে গেলে যে কেমন লাগে, বোঝাতে পারব না আমি তোমাকে। সেই অবস্থায় যদি জানা যায় তোমার মত হ্যান্ডসাম যুবক আমার স্বামী, যদি দেখা যায় এই রকম একটা সচ্ছল পরিবেশে আমাকে রাখবার যোগ্যতা আছে সে স্বামীর, তাহলে সন্দেহ দূর হতে চায় না কিছুতেই। বার বার গায়ে চিমটি কেটেও মনে হয় স্বপ্নের ঘোরেই রয়ে গেছি।'

অস্বস্তি বোধ করল রানা এসব কথায়। যখন সত্যি ঘটনা জানতে পারবে তখন হান্নার মনের অবস্থা কি হবে, ওর সম্পর্কে কি ধারণা হবে, কেমন ভাবে গ্রহণ করবে এসব মিথ্যাকে, কতখানি প্রতারিত বোধ করবে—ভাবতে গিয়ে মনটা ছোট হয়ে গেল ওর। হান্নার কোলের উপর থেকে হাতটা তুলে রাখল ওর কাঁধে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, হান্না। ক'দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'আচ্ছা, আমাদের ঝগড়া হয়নি কখনও?'

'কখনও, মানে? কোনদিন হয়নি তাই জিজ্ঞেস করো। এই ব্যাপারে তোমাকে তো পি.এইচ.ডি.ডিগ্রী দিয়ে দিয়েছি আমি তিন বছর আগেই।'

'তাই নাকি? আমি খুব ঝগড়াটে বুঝি?'

'খুব!' প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করল রানা। চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'নয়াদিল্লীর একটা কথাও মনে নেই তোমার, হান্না?'

নয়াদিল্লীর নাম শুনেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে চেয়ে রইল সাগরের দিকে।

'কিছু মনে পড়ছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'মনে হচ্ছে ভাল লাগেনি আমার নয়াদিল্লী। ওখানে বিপদ আছে।'

'কিসের বিপদ?'

'কি জানি,' বিরক্তি সূচক একটা ভঙ্গি করল মুখের। 'কি যেন অনুভব করছি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কি হয়েছিল আমার নয়াদিল্লীতে?'

'কই, কিছু না তো! ব্যবসার কাজে গিয়েছিলাম, ব্যস্ত ছিলাম আমি, তুমি একা একা সারাদিন ঘুরেছ টই টই করে। মনে পড়ছে?'

'এসব কথা এখন থাক, রানা। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার অপ্রীতিকর কিছু মনে পড়ে যাবে—এমন কিছু, যা আমি ভুলে থাকতে চাই।'

'অপ্রীতিকর!' সূত্রটা যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখতে চাইল রানা। 'আমি তো মনে করেছিলাম খুব মজা করে বেড়াচ্ছ তুমি সারাটা দিন! তেপ্পান্নটা শাড়ি কিনে আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছিলে, মনে নেই? শেষে বাজাপেয়ীর কাছ থেকে টাকা ধার করে...'

'বাজপেয়ী!' চট করে রানার দিকে ফিরল হান্না কাওসার। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, চোখ জোড়া একটু বিস্ফারিত। 'বাজপেয়ী! নামটা মনে আসছে! কিন্তু কি যেন একটা ব্যাপার...খুবই গুরুত্বপূর্ণ...ভুলে যাচ্ছি সেটা। মনে হচ্ছে খুন করবে ও আমাকে...কিছুতেই বর্ডার ক্রস করতে দেবে না। বর্ডার...বর্ডার...ট্রেনিং ক্যাম্প আছে ওখানে...মস্ত পরিকল্পনা আছে...ইশ্শ! মনে আসছে না কেন?' উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে রানার মুখে উত্তর খুঁজল হান্না। নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে চোখ দুটো।

'থাক, থাক,' নরম গলায় বলল রানা। 'অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আপনিই মনে আসবে সব। একটু হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু আসবে ঠিকই।' উঠে দাঁড়াল সে, সাথে সাথে দম দেয়া পুতুলের মত উঠল হান্না। ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'যা মনে আসতে চায়, আসতে দাও—স্মৃতিটা বিপজ্জনক বা অপ্রীতিকর বলে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ো না পিছনে। এখানে তোমার কোন বিপদ নেই, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি চলি, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। খানিক পর পর এসে দেখে যাব তোমাকে। বই পাঠিয়ে দেব কয়টা? পড়বে?'

'না। ভাবতে চাই আমি। মনে হচ্ছে যত বেশি ভাবব, ততই তাড়াতাড়ি মনে পড়বে সব।'

'ঠিক আছে, ভাব। তবে বেশি চাপ দিয়ো না নিজের ওপর। বেশি জোর খাটালে ভুলে যাওয়া কিছু সহজে মনে আসতে চায় না। নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওর সাথে গল্প করে সময় কাটাতে পারবে।'

'এখন না...খানিক পরে আমিই ডাকব ওকে। এই বোতামটা টিপলেই আসবে বলেছে।' সুইচবোর্ডের উপর একটা বোতাম দেখাল হান্না। তারপর রানার বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। 'কিন্তু তোমার অভাব তো ওকে দিয়ে পূরণ হবে না!' হাসল। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, টেনে নামিয়ে আনল রানার মুখটা নিজের ঠোঁটের কাছাকাছি। আধ মিনিট চুপচাপ। তারপর মুখটা সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো!'

ছয়

আলমগীরই প্রথম দেখতে পেল প্রহরীটাকে। পাহাড়ের মাথায়। কাঁধে স্লিং-এ ঝুলানো স্টেনগান, বাম হাতে শিকল। তার মানে কুকুর আছে সাথে। অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর। নিজামের কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে চোখের ইশারা করল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

খাকি পোশাক দেখে চমকে গেল নিজামও।

'মাহা মুসিবৎ দেকতাছি!' মরিসের ড্রাইভিং সীটে বসা কবিতার উদ্দেশে বলল, 'আগে বাইরা যান গা, এইহানে থামাইয়েন না গাড়ি।' আবার দেখল পায়চারিরত সোলজারকে। 'আরও কি মানু থাকবার পারে নিচে। বিসমিল্লাতেই খাট্টা কইরা দিল হালায় মিজাদটা!'

কবিতাও দেখল প্রহরীকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারাটা। 'এখন উপায়? সতর্ক হয়ে গেছে ওরা! ওঠাই যাবে না পাহাড়ে!'

'ক্যাঠা কইছে? পুরা পাহাড় তো আর গার্ড দিবার পারব না! উইঠা পরুম একদিক দিয়া। উই যে সামনে ডাইনা-মোড় দেহা যায়···মোড় ঘুইরা চারো চাক্কা জাম কইরা নামাইয়া দেন আমাগো।' সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা বের করল নিজাম। আলমগীরের কোলের উপর ছুঁড়ে দিল। 'এইটা রাখেন আপনে। আমার পসাৎ পিছে থাকবেন।'

থতমত খেয়ে গেল আলমগীর। চট্ করে কোমরে গুঁজে রাখল পিস্তলটা। সামনের বাঁক ঘুরেই ব্রেক চাপল কবিতা। বেহালার বাক্স খুলে রাইফেলটা জুড়ে তৈরি হয়ে নিল নিজাম। নেমে পড়ল ওরা দু'জন। ঠিক হলো, আগামী বিশ মিনিট এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবে কবিতা যতদূর যাওয়া যায়, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে একই স্পীডে ফিরে আসবে। ততক্ষণে নিজামকে জায়গামত পৌঁছে দিয়ে রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করবে আলমগীর। কটেজে ফিরে গিয়ে মালপত্র বেঁধেছেদে অপেক্ষা করবে ওরা দু'জন যতক্ষণ না কাজ সেরে ফিরে আসে নিজাম। নিজাম পৌঁছবামাত্রই রওনা হয়ে যাবে সবাই চট্টগ্রামের উদ্দেশে।

পাঞ্জাবী-পাজামার বদলে প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরেছে আজ মোহাম্মদ আলমগীর। ওর ধারণা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে সে এইভাবে—এই পোশাকে চিনতে পারবে না ওকে কেউ। তাছাড়া এই পোশাকে ঝোপ-ঝাড় আর পাহাড়ী কাঁটাগাছের মধ্যে দিয়ে যেতে সুবিধেও হবে অনেক।

চলে গেল গাড়িটা। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা দু'জন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আগে আগে চলল নিজাম রাইফেল হাতে, পিস্তল হাতে আলমগীর চলল ওর দশ হাত পিছনে। মনসুর লজের কিনার ঘেঁষে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বড় পাহাড়ের দিকে এগোল ওরা অতি সন্তর্পণে। কিছুদূর এগিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নিজাম, তারপর আবার পা বাড়ায় সামনে। এইভাবে পা বারো মিনিটের মধ্যেই পিছনের বড় পাহাড়ের গায়ে উঠে পড়ল ওরা। এবার প্রতিটা পদক্ষেপ অত্যন্ত সাবধানে ফেলছে নিজাম। আলমগীরের পায়ের নিচে একটা মরা ডাল সামান্য একটু মট্ করে উঠতেই এক লাফে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে ধরল নিজাম। জান উড়ে গেল আলমগীরের ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে। নিজাম যখন দেখল শব্দটা বিপজ্জনক কিছু নয় তখন রাইফেল নামিয়ে নিল বটে, কিন্তু নিঃশব্দে যেভাবে দাঁত-মুখ খিঁচাল তাতে কলজে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আলমগীরের।

আর কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল নিজাম আবার। ঝট্ করে রাইফেলটা তুলে নিয়েছে কাঁধে। এবার পিছন দিকে নয়—সামনের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছনে চেয়ে ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিল সে আলমগীরকে, তারপর কয়েক পা সরে গেল বাম দিকে, দাঁড়াল একটা গাছের আড়ালে।

এতক্ষণে শব্দটা কানে গেল আলমগীরের। ছড়ছড় পানি পড়ার মত শব্দ হচ্ছে বেশ কিছুটা দূরে। মনে হচ্ছে শুকনো পাতার উপর পড়ছে কলের পানি। পনেরো-বিশ সেকেন্ড একটানা পানি পড়ল, থেমে গেল দু'তিন সেকেন্ডের জন্যে, তারপর আবার পাঁচ সেকেন্ড শোনা গেল শব্দটা, থেমে গেল, চিড়িক চিড়িক দু'বার শব্দ—তারপর চুপ। নিজামকে আর দেখা যাচ্ছে না। সরে গেছে সে গাছের আড়াল থেকে।

শিউরে উঠল ল্যান্স নায়েক রিয়াজ। হাতে ধরা জিনিসটা একটু ঝেড়ে নিয়ে আন্ডারওয়্যারের ভিতর গুঁজে দিয়ে বোতাম লাগাতে শুরু করল সে ট্রাউজারের। সেই ফাঁকে বামহাতের কব্জিটা একটু কাত করে দেখে নিল হাতঘড়ির সময়। দশটা বাজে। বেলা তিনটের সময় ডিউটি অফ হবে ওর, নতুন লোক আসবে, তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে সে খান ভিলায়। আরও পাঁ-চ ঘণ্টা! কিভাবে কাটাবে সে সময়টা?

হাবিলদার মেজর বলেই দিয়েছে: ইচ্ছের বিরুদ্ধে পাঠাতে হচ্ছে তোমাদের, যাও, বেহুদা বেগার খেটে আসো। হঠাৎ কেন যে কেউ ওই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করবে আমার মাথায় ঢুকছে না, ঘুরে ফিরে দেখে আসো, হয়তো তোমাদের মাথায় ঢুকতে পারে।

এরকম একটা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করতে বাধ্য হওয়ায় প্রথমটায় খারাপ লেগেছিল ওর-ও, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক চড়াই-উৎরাই ভেঙে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে এই পাহাড়টায় পাহারা দেয়া সত্যিই দরকার ছিল। কারণ, পাহাড়ের একটা অংশ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় খান ভিলার ব্যালকনি। সকালবেলায় মাসুদ রানাকে খবরের কাগজ উল্টাতে দেখেছে সে ওইখানে উঠে। একজন স্নাইপারের পক্ষে ওখান থেকে ব্যালকনিতে বসা বা দাঁড়ানো যে-কোন লোককে খতম করে দেয়া পানির মত সহজ। ঘুরে ফিরে দেখেছে সে, পাহাড়ের ওই অংশটায় উঠতে হলে কোন্ পথটা ব্যবহার করতেই হবে আততায়ীকে। সেই পথের উপর নিজে দাঁড়িয়ে সঙ্গের ত্রিপাইটাকে কুকুরসহ পাঠিয়ে দিয়েছে সে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়। চূড়া থেকে যে নিচের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়, তা নয়; ও চেয়েছে, নিচে থেকে সবাই দেখুক চূড়ার প্রহরীকে, ধরে নিক আরও গার্ড রয়েছে পাহাড়ে, এবং মানে মানে কেটে পড়ুক। কারণ, স্নাইপার যদি আসে, খালিহাতে আসবে না।

কথাটা যে কতখানি সত্য টের পেল সে প্রস্রাব সেরে পিছন ফিরেই। ঠিক তিন হাত দূরে ওর বুকের দিকে তাক করে ধরা রয়েছে একটা রাইফেল। এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে গেল ল্যান্স নায়েক রিয়াজ, পরমুহূর্তে এক ঝটকায় কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলল সে স্টেনগানটা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। চোখের সামনে দেখল, নোংরা নখের একটা আঙুল নড়ে উঠল রাইফেলের ট্রিগারের কাছে। তারপর আর কিছুই দেখতে পেল না। মৃদু একটা 'দুপ' শব্দ কানে এল শুধু। মাথার ভিতর পলকের জন্যে দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল একটা সূর্য।

শব্দটা আলমগীরের কানেও গেল। পিছন ফিরে খিচে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে দমন করল সে। পিস্তলটা সামনে বাগিয়ে ধরে বিস্ফারিত নয়নে সামনে এগোল সে এক পা দু'পা করে। শব্দের উৎস আন্দাজ করে নিয়ে বিশ কদম এগিয়েই দেখতে পেল সে লাশটা। রক্তে লাল হয়ে আছে সবুজ ঘাস। একটা হাত ধরে ছেঁচড়ে টেনে সরিয়ে ফেলছে নিজাম লাশটাকে ঘন ঝোপের আড়ালে। কাঁপতে কাঁপতে পাশে এসে দাঁড়াল আলমগীর।

কাজ সেরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল নিজাম আলমগীরের শরীরে। হাতে ধরা পিস্তলটার কাঁপুনি দেখে বাঁকা হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা স্বরে বলল, 'অইছে, এইবার জান গা।' উপর দিকে চাইল। 'আপনেরে দিয়া সাইয্য অইবো না কুনো। উপরে উঠলে আবার নামবার পারবেন না। যান গা, আমি কাম সাইরা আইতাছি।'

ভয়ে ভয়ে একবার লাশ-লুকোনো ঝোপের দিকে, আর একবার ঘাসের

উপর ভাজা, আঠালু রক্তের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল আলমগীর, তারপর দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে পথে এসেছিল সেই পথে।

আধঘণ্টা জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াল নিজাম। যখন নিশ্চিত হলো চূড়ায় টহলরত প্রহরী ছাড়া আর কেউ নেই এ পাহাড়ে, তখন অতি সন্তর্পণে উঠে পড়ল সে গতরাতের সেই জায়গাটায়। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে একটা দেবদারু গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল সে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ব্যালকনিটা। কেউ নেই ব্যালকনিতে। অর্ধেকটাতে ঝলমলে রোদ পড়েছে, বাকি অর্ধেক ছায়া। রাইফেলটা কাঁধে তুলে টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে আর একবার দেখল সে ব্যালকনিটা। একলাফে একেবারে কাছে চলে এল তিনশো ফুট দূরের ব্যালকনি; মনে হচ্ছে এইতো সামনে, এখান থেকে থুথু ফেললে গিয়ে পড়বে রেলিং-এর গায়ে। ছায়ায় একটা টেবিলের উপর রাখা পত্রিকার নাম পড়ল সে—দৈনিক সুপ্রভাত। দেয়ালের গায়ে একসারি ব্যস্ত-সমস্ত কাঠ পিঁপড়ে দেখে চট্ করে স্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে চাইল নিজাম—তুফান আইতাছে নিকি?

আকাশ দেখে তেমন কিছুই বোঝা গেল না। রাইফেলটা কোলের উপর রেখে নড়েচড়ে আরাম করে বসল নিজাম। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে সেলোফেন পেপার মোড়া একডজন চিকেন স্যান্ডউইচ বের করে ছ'টা খেল, বাকি ছ'টা আবার সেলোফেন মুড়ে রেখে দিল ব্যাগে। ফ্লাস্ক থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিয়ে লম্বা করে দম ছাড়ল সে। এইবার প্রতীক্ষা।

সাত

নিচতলার স্টাডিরুমে একটা সোফায় শুয়ে অসকার শেফিল্ডের 'দা রেচ ফিল' পড়ছে রানা। সত্যি, মিথ্যে আর গুজবের একটা আশ্চর্য জগাখিচুড়ি। এই পার্বত্য চট্টগ্রামেরই ঘটনা। এখান থেকে আশি মাইল উত্তর-পূবে দুর্গম এক পাহাড়ের মধ্যে নাকি উপজাতীয়দের হাজার হাজার বছরের পুরানো এক রুবি মন্দির আছে। পবিত্র এই মন্দিরে বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বাইরের কারও কিছুই জানা ছিল না ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। বার্মা থেকে জাপানি বোমার ভয়ে পলায়নরত একদল শরণার্থী নাকি পথ ভুলে ওই পাহাড়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তাদের নাকি ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়া হয়েছিল সেই মন্দিরে। শুধু একজন কষ্টেসৃষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল

সেখান থেকে। সেই মর্গানের কাছ থেকে শোনা কাহিনী বর্ণনা করেছেন অলকার শেফিল্ড। তাও আবার নিজে শোনেননি, মর্গানের এক বন্ধুর বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছেন লেখক।

গুপ্তধন-টাইপের কাহিনী—কয়েকশো কোটি (এখনকার হিসেবে কয়েক হাজার কোটি) টাকার পিজিয়ন-ব্লাড রুবি দেখেছে নাকি মর্গান ওই মন্দিরে। ফিরে এসে লোক-লস্কর সংগ্রহ করে কয়েকবার হানা দেবার চেষ্টা করেছে সে ওই মন্দিরে, কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার সরু সেই পথটা খুঁজে পায়নি কিছুতেই। বার চারেক বিফল অভিযান চালাবার পর আর সঙ্গী খুঁজে পায়নি লোকটা, শেষবার রওনা হয়েছিল একাই—এবং ফেরেনি আর। রহস্যই রয়ে গেছে রহস্যটা।

গাঁজা!—মুচকি হেসে সিগারেট ধরাল রানা। জানালা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে।—তবে যেমনভাবে লিখেছে, পড়ে মনে হয় সত্যি হলেও হতে পারে। অনেক তথ্য মিলে যাবে কাঁটায় কাঁটায়। উপজাতীয়দের ভাষার ছিটে ফোঁটা যা লিখেছে, জঙ্গল ও পাহাড়ের যা বর্ণনা দিয়েছে, পথের যে নিশানা দিয়েছে—কোনটার মধ্যে ত্রুটি বের করতে পারল না রানা। মনে মনে স্বীকার করতে হলো, শুনেই লিখুক, আর দেখেই লিখুক, বিলেতে বসে আমাদের এখানকার এইসব তথ্য সংগ্রহ করতে প্রচুর খাটতে হয়েছে লেখককে।

কিন্তু এসব পড়ে আর কাঁহাতক সময় কাটানো যায়? ঘড়ি দেখল রানা—দশটা। সারাটা দিন পড়ে রয়েছে সামনে। গেয়েটার নতুন কিছু মনে পড়ল কিনা আর এক চক্কোর দেখে এলে মন্দ হয় না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল রানা। হাস্নার দরজায় দুটো টোকা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে আনমনে কি ভাবছিল হাস্না, ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে হাসল। রানা কাছে এসে দাঁড়াতেই ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

'কাজ শেষ হয়েছে তোমার?'

'একটা কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ভাবলাম, তোমাকে চট্ করে একবার দেখে গিয়েই সেরে ফেলব বাকিটুকু। কেমন আছ এখন? একা একা খারাপ লাগছে খুব?'

'নাহ্। ভাবছি।' কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমরা কি খুলনায় গিয়েছিলাম কিছুদিনের মধ্যে?'

'গিয়েছিলাম। খুলনা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কক্সবাজার এসেছি। কেন? একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আবছা আবছা অনেক কিছুই মনে পড়ছে, কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। হঠাৎ দু'একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে আসছে চকিতের জন্যে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি আমি। মাঝে মাঝে হালকা হয়ে আসছে মেঘ—তখন দেখতে পাচ্ছি আমি কোথায়। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'পারছি। খুলনার কোনও কথা মনে পড়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। খুলনার শাহীন হোটেল থেকে রওনা হলাম ঢাকার পথে। সাথে একটা সুটকেস ছিল। তুমি ছিলে না।'

'সুটকেসটা কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমার জামা-কাপড় সব ওর মধ্যে। ওটা কোথায় রেখেছ মনে পড়ছে?'

'না।' ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করল হাস্না। 'মনে পড়ছে···ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে একটা রিকশায় উঠেছিলাম আমি। সাথে সুটকেস ছিল না।'

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। 'তাহলে খুব সম্ভব এয়ারপোর্টের আনক্লেইমড় লাগেজ স্টোরে পাওয়া যাবে তোমার সুটকেস। আমি এখুনি একটা ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

'কিন্তু খুলনায় কি হয়েছিল? তুমি ছিলে না কেন সাথে?'

'একদিন আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম আমি ঢাকার পথে। তুমি রয়ে গেলে, কি-নাম যেন, সেই বিখ্যাত বাগান দেখবে বলে। মনে নেই?'

'নাতো!'

'পরদিন ঢাকায় আসবার কথা তোমার। নিজে ব্যস্ত ছিলাম বলে যেতে পারিনি, তবে এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে গাড়ি দিয়ে। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল সে।'

'আমি তো ওই প্লেনেই ঢাকায় এসেছি। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল কেন?'

'তোমাকে চিনত না সে। আমরা আশা করেছিলাম গাড়িটা দেখে তুমিই চিনে বের করে নেবে ওকে। খুব সম্ভব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ তুমি তখন, চিনতে পারোনি। তা রিকশায় চেপে কোথায় গেলে এয়ারপোর্ট থেকে?'

'রিকশায় ওঠা পর্যন্ত মনে আছে তারপর আর কিছুই মনে নেই। কোথায় পাওয়া গেল আমাকে? হাসপাতালেই বা গেলাম কি করে?'

'রমনা পার্কে পাওয়া গেছে তোমাকে। অজ্ঞান অবস্থায়। বাবরিচুরোট খেয়েছিলে তুমি।'

'কেন?' বিস্ময় ফুটে উঠল হাস্নার চোখে। 'ঝগড়া হয়েছিল তোমার সাথে?'

'উহুঁ! তুমি খেলে, নাকি আর কেউ তোমাকে খাওয়াল···কেনই বা খাওয়াল কিছু বোঝা যাচ্ছে না।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'তুমি দেখো চেষ্টা করে এসবের উত্তর খুঁজে পাও কিনা, আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে খবর নিচ্ছি তোমার সুটকেসের।'

পিছন ফিরতে গিয়ে বাধা পেল রানা। জামার হাতা খামচে ধরেছে হাস্না। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রয়েছে ওর চোখের দিকে। জিভ শুকিয়ে গেল রানার।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বুকের কাছে সেঁটে এল হাস্না। রানার প্রশস্ত বুকে কান পাতল। নিচুগলায় জানতে চাইল, 'তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন আমার কাছ থেকে?'

প্রমাদ গুনল রানা। 'কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি? কই?'

'বুক থেকে মাথা তুলে মুখটা উঁচু করল হাস্না। 'তাহলে দরজাটা লাগিয়ে দাও!'

'কেন?' প্রায় আঁৎকে উঠল রানা।

'স্বামী-স্ত্রীরা কীসব করে···আমরা—'

'কিন্তু তুমি তো অসুস্থ, হাস্না!' অনুনয়ের মত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'ডাক্তার বলেছে সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওসব বাদ। সত্যিই···শোনো—'

'বলুক। কিচ্ছু জানে না ওরা।' গলা জড়িয়ে ধরল সে রানার, ঠোঁটের কোণে হাসি। 'সকালে কাজের কথা বলে পালিয়ে গেলে, এখন টেলিফোনের নাম করে পালাতে চাইছ—কেন? থাক না জামা-কাপড় ঢাকা এয়ারপোর্টে। স্বামীর সামনে গায়ে জামা না থাকলেই বা কি? তোমার কাছে আমার লজ্জার কিছু আছে? বলো?'

'তা নেই। তবে ডাক্তার বার বার করে বারণ করে দিয়েছে—খবরদার, স্মৃতি ফিরে না আসা পর্যন্ত স্পর্শও করবেন না! বিশ্বাস না হয় নার্সকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। নইলে এভাবে দূরে দূরে থাকতে আমারই কি ভাল লাগছে? পাগলামি করে না, লক্ষ্মী! আমার সামান্য ভুলে যদি তোমার স্মৃতি কোনদিন ফিরে না আসে, তাহলে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না আমি।'

কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে চেয়ে রইল হাস্না রানার মুখের দিকে। তারপর হাসল। রানার চিবুকে ছোট্ট একটা চুমো খেয়ে ছেড়ে দিল গলা। 'ঠিক আছে, যাও। আজই যাতে সব স্মৃতি ফিরে আসে সেই চেষ্টায় লাগছি আমি এখন থেকে।'

'দ্যাটস গুড!'

হাস্নার পিঠে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

রাবেয়ার ঘরের দরজা দু'পাট খোলা। ঘরে কেউ নেই দেখে নেমে এল নিচে। স্টাডিরুমে ঢুকে দেখল শেলফের বই ঘাঁটছে রাবেয়া। রানাকে দেখে বিস্মিত হলো।

'কি ব্যাপার! এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে?'

'এত অবাক হচ্ছেন কেন? কোত্থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলাম?'

'হান্নার ঘর থেকে। আমি তো পালিয়ে চলে এলাম আপনাদের জ্বালায়।'

'আমাদের জ্বালায়?'

'হ্যাঁ। সব কথা শোনা যাচ্ছিল পাশের ঘর থেকে।'

হাসল রানা। 'কোন্ পর্যন্ত শুনেছেন?'

'স্বামী-স্ত্রীরা কীসব করে—পর্যন্ত শুনেই আমি দৌড়।'

'তবে আর শুনতে বাকি রেখেছেন কি? সবই তো শুনেছেন। দৌড়েছেন নিজের জ্বালায়—অযথা দোষ দিচ্ছেন আমাদের।' রাবেয়ার হাতের দিকে ইশারা করল। 'মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা আপনার খুব পছন্দ বুঝি?'

'খুব। কিন্তু কাটালেন কি করে, বলুন তো? 'কী সব' তো এত জলদির ব্যাপার নয়! আমি তো মনে করেছিলাম গেছেন এইবার, আর রক্ষে নেই। স্বামী সাজার সাধ গেছে এবার?'

মৃদু হাসল রানা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'খুব স্লো প্রোগ্রেস হচ্ছে। একটা-দুটো করে এইভাবে যদি ওর স্মৃতি ফিরে আসে, তাহলে একমাসের ধাক্কা। মারা পড়ব নির্ঘাত। স্মৃতিটা ওর তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার কোন কায়দা নেই? ঝামেলাতেই পড়ে গেলাম দেখছি! এ থেকে উদ্ধারের কোন রাস্তা জানা আছে আপনার?'

'আমার মনে হয় আপনি যত তাড়াতাড়ি আশা করছেন এভাবে অপেক্ষা করলে তত তাড়াতাড়ি স্মৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমি স্মৃতিভ্রষ্ট কেস আরও দেখেছি একটা-দুটো। হঠাৎ কোন শক্ পেলে চট্ করে ফিরে আসতে পারে সব স্মৃতি একবারে। হঠাৎ কোন আনন্দেও সেরে যেতে পারে। দেখুন না আরও একদিন দু'দিন। তখন তো আর সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকবে না ও আপনার কাছে। এতটা বাধো-বাধো ঠেকবে না। টিটকারি মারার বা হিংসে করার জন্যে আমিও থাকছি না কাছে-পিঠে। তখন বিসমিল্লাহ বলে দিন চালু করে 'কী সব'। বলা যায় না, ইমোশনাল রিলিজটা ওষুধের কাজও করতে পারে।'

'আপনার টিটকারি বা হিংসের থোড়াই কেয়ার করি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু থাকছি না মানে? ভাগবার মতলবে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। এখানে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। টিকেট হয়ে গেছে।

আবিদুর রহমানকে বলে রেখেছি, কাল খুব ভোরে পৌঁছে দেবে আমাকে এয়ারপোর্টে। চলে যাচ্ছি।'

রানাও জানে, এখানে রাবেয়া মজুমদারের আর কোন কাজ নেই। ওকে আটকে রাখবার আর কোন অর্থ হয় না। তবু মেয়েটাকে বিদায় দেয়ার কথা ভাবতে মনটা কেমন যেন খারাপ মত লাগল ওর। বেশ ভাল লাগছিল মেয়েটিকে ওর। বুঝতে পারল, ও চলে গেলে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে সে এই পাহাড়ী দুর্গে। তাছাড়া যাকে ভাল লাগে তার জন্যে কিছু করবার জন্যে মনের ভিতর কেমন যেন আকুলি বিকুলি করে ওর সব সময়। এই মেয়েটির জন্যে কিছু করতে পারেনি সে এখন পর্যন্ত। ছোট্ট কোন উপকার, কোন সাহায্য, বা কিছু, যাতে মেয়েটির মুখে হাসি ফোটে—করতেই হবে ওর।

'যাচ্ছেন, যান,' বলল সে, 'কিন্তু আপনাকে ভাল করে জানাই হলো না। বেশ জমে আসছিল বন্ধুত্বটা...যাকগে...আবার দেখা হবে তো?'

'সেটা কি আমি বলতে পারি?' হাসল রাবেয়া। 'আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে সেটা সম্পূর্ণভাবে। হাসপাতালটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। আমাকে খুঁজে বের করা কঠিন কিছুই...'

টেলিফোন এল। সোহেল।

'কিছু জানা গেল?'

'সুটকেসটা মনে হচ্ছে এয়ারপোর্টে খোঁজ করলে পেয়ে যাবি,' বলল রানা নির্বিকার কণ্ঠে।

'মুখ খুলেছে তাহলে!' উত্তেজিত সোহেলের কণ্ঠস্বর।

'শুধু মনে পড়েছে, খুলনার শাহীন হোটেল থেকে রওনা হয়েছিল ও ঢাকার উদ্দেশে। সাথে একটা সুটকেস ছিল। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে এসে যখন একটা রিকশায় ওঠে, তখন সুটকেসটা ছিল না ওর সাথে। খুব সম্ভব সুটকেসের জন্যে অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে চলে এসেছিল। তুই একটু খোঁজ নিয়ে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।'

'পাঠাচ্ছি আতিককে। কিন্তু তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তুই বলতে চাস্ ঢাকায় পৌঁছবার আগেই স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে ওর?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, হাঁদারাম,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'কখন স্মৃতি এসেছে বা গেছে, বা আদৌ গেছে বা এসেছে কিনা সেসব কিছুই বলছি না আমি। তোকে খোঁজ নিতে বলছি এয়ারপোর্টে। ব্যস।'

'আহা, চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি ভাবছি, স্মৃতিভ্রষ্ট অবস্থাতেই মেয়েটা দিল্লী থেকে রওনা দেয়নি তো?'

'তোর মাথা! শালা, তোকে আর মানুষ করা গেল না। তাহলে কলকাতায়

ডিপুটি হাই কমিশনারকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে কেন? শিরিন কাওসার নাম নিয়ে বর্ডার ক্রস করবে কেন?'

'তাইতো! প্রতিটা পদক্ষেপই দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক: মানে বুঝে-শুনে হুঁশিয়ার হয়ে ফেলেছে। বলা যায় না, ঢাকা এয়ারপোর্টে সুটকেস ক্লেইম না করাটাও হয়তো ইচ্ছেকৃত ব্যাপার।'

'এইবার লাইনে এসেছ, চাঁদ। সমস্ত ব্যাপারটাই ঘোলাটে। আমার তো মনে হচ্ছে, কেবল বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানই নয়, চতুর্থ আরও একটা পক্ষ রয়েছে এর পিছনে অতি সাবধানে, পর্দার অন্তরালে।'

'চতুর্থ পক্ষ! কি বলছিস তুই? কি বোঝাতে চাইছিস?' একেবারে সপ্তমে উঠে গেল সোহেলের গলা।

'চ্যাঁচাস না, উল্লুক...কানে তালা লেগে যাবে। ভাল করে কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে ফ্যাল্ দেখি ঝটপট? প্রথমত, খোঁজ নিবি কারা ওকে রমনা পার্কে পেল, কি তাদের পরিচয়। দ্বিতীয়ত, মেডিকেল কলেজ থেকে কি কারণে ওকে সরিয়ে পি.জি.তে নেয়া হলো, কার হাত রয়েছে এ ব্যাপারে। তৃতীয়ত, সাপ্তাহিক স্যাটারডে ঠিক কার কাছ থেকে পেল ছবি ও নিউজ।'

'তুই ভাবছিস, এর পিছনে চতুর্থ কোন পক্ষের হাত আছে?'

'তা নইলে তুই-ই বল্, ঢাকায় পৌঁছুবার পর একটা রাত্রি এবং একটা দিন কোথায় ছিল ও? রেপ্ করা হয়নি—পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে ডাক্তার—যে বলবি হয়তো খারাপ কোন লোকের পাল্লায় পড়েছিল। বল্ তুই, সুশিক্ষিত একটা মেয়ে, যার সাথে একটা হ্যান্ডব্যাগ পর্যন্ত নেই, বারবিচুরেট পেল কোথায়, রমনা পার্কে গেল কি করে?—মাথায় ঢুকছে কিছু?'

'ঢুকছে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল সোহেল, তারপর বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তা এতক্ষণে এসব কথা বের করছিস কেন পেট থেকে? আগে বলতে কি হয়েছিল?'

'মেয়েমানুষের লাগে দশ মাস দশদিন, আমাকে দুটো দিন তো টাইম দিবি...নাকি তাও দিবি না? যাইহোক, এবার রাজধানীর খবর শোনা। এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে আর ভাল্লাগছে না।'

'আঙুল চুষছিস? কেন? আর কিছু পাচ্ছিস না? তুই বলতে চাস দুটোর একটাকেও ভজাতে পারিসনি এখনও? নাকি দুইদিকে ডিউটি দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছিস, নারী-সংসর্গ থেকে মন উঠে গেছে? যাইহোক, তোর দোস্তো জামান তো এখন কক্সবাজারে, ছুটিতে, ওকে ফোন করলেই কোম্পানি দেবে।'

'কোন জামান? ডি.আই.জি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আখতারুজ্জামান। বাড়ি গেছে ছুটিতে। রামুর মাইল দশেকের মধ্যেই বাড়ি···ফোন আছে···ফোন করে দ্যাখ্ না, তোকে পেলে দারুণ খুশি হবে। নাম্বারটা দেব?'

'গাইড খুঁজলেই পাওয়া যাবে। ভালই করেছিস ওর কথা জানিয়ে। নিশ্চয়ই বাঘ মারতে এসেছে ব্যাটা···এই সুযোগে আমিও হয়তো একটা চান্স পেয়ে যাব বাঘ শিকারের। গুড্!'

'ঢাকার খবর আর নতুন কিছু নেই। কাল বিকেলে তোর অফিসে প্রক্সি দিয়ে এসেছি, আজও যাব ছুটির পর। তোর সেক্রেটারিটি কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং!'

'ভাগাবার মতলব থাকলে ছেড়ে দাও, চাঁদ! চাঁদি ফাটিয়ে দেব গাঁট্টা মেরে। এবার তোমার অফিসের খবর শোনাও। অধ্যাপক সাহেবের পেট থেকে বেরুল কিছু? ও জড়াল কি করে এর মধ্যে?'

'কিছুই জানা যায়নি। লোক পাঠানো হয়েছিল মুক্তাগাছায়। লাশ নিয়ে এসেছে ওর।'

'জবর ফাইট দিয়েছে মনে হয়?'

'না। পায়খানায় গিয়ে লুকিয়েছিল। ওখান থেকে টেনে বের করে উঠানে নামাতেই কোথা থেকে যেন একটা গুলি এসে লাগল ওর পিঠে। ঢাকায় আনতে আনতে পথেই শেষ।'

'কোন মহলের আর কোন তৎপরতার নমুনা পাওয়া যায়নি?'

'না। একেবারে গভীর পানিতে চলে গেছে সব। কক্সবাজার পুলিসকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি আমরা, চেহারার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে ওদের সবার। এখনও কোন খবর আসেনি ওখান থেকে।'

'ভাল কথা, এই হাস্না কাওসার সম্পর্কে গোটা কয়েক তথ্য আমার দরকার। একে পি.সি.আই. লাগিয়েছিল বলছিস বাজপেয়ীর পিছনে। কিভাবে?'

'কিভাবে মানে?'

'মানে আমি গোড়ার ইতিহাসটা জানতে চাই। কে মেয়েটা, কোথায় ছিল, কিভাবে নিয়োগ করা হলো?'

'কলকাতায় ছিল। পড়ছিল কলেজে। এমনি সময়ে সিরিয়াস কোন কলহ বাধায় ওর বাপ-মার সেপারেশন হয়ে যায়। বাপ চলে আসে ঢাকায়, মা চলে যায় লাহোর। মেয়েটা থেকে যায় ওর এক ফুফুর কাছে, কলকাতাতেই, ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসেবে। ওখানেই আমাদের এক এজেন্টের সাথে ওর ভাব হয়, এবং তারই অনুপ্রেরণায় যোগ দেয় ও পাকিস্তান কাউন্টার

ইন্টেলিজেন্সে। কাজের ভার নিয়ে চলে যায় নয়াদিল্লী।'

'ঢাকা থেকে, না সরাসরি কলকাতা থেকে?'

'ঢাকায় আনা হয়নি ওকে, ট্রেনিং দেয়া হয়েছে কলকাতায় রেখেই, ওখান থেকেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কাজে। যাতে কারও কোন রকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে।'

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, দোস্ত, রাখি এখন। কোন ডেভেলপমেন্ট হলে জানাস্।'

আট

বেলা নয়টায় ঘুম থেকে উঠল জাফর। পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল বেঘোরে ঘুমাচ্ছে পাশাপাশি দুটো খাটে সিকান্দার বিল্লাহ ও চিশতি হারুন। বারোটার সময় তাদের নাস্তা এবং ইনফরমেশন চাই। ধীরে সুস্থে নাস্তা সেরে দশটার দিকে বেরোলেই চলবে। ফস্ করে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল একটা।

ইনফরমেশন আবার কি?—ভাবল জাফর। বিনকিউলার নিয়ে পিছনের পাহাড়ে উঠে ভিতরটায় একনজর চোখ বুলিয়ে চলে আসবে। ভিতরে কোথায় কোথায় পাহারা বসানো হয়েছে, প্রতিরক্ষার ঠিক কি ব্যবস্থা, দুর্বলতা আছে কিনা কোথাও—দশমিনিট দেখলেই টের পাওয়া যাবে সব।

সকালেই পৌঁছে গেছে ঢাকার পেপার। সেটা বগলদাবা করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল জাফর। ঝাড়া বিশ মিনিট পর একেবারে স্নান সেরে বেরিয়ে এল সে গুনগুন করে মেহেদি হাসানের একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে। মনটা আজ বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগছে কেন জানি।

সংক্ষেপেই সারল সে আজকের নাস্তা: দুটো বাটার টোস্ট, দুটো ডিমভাজি, একটা কলা, একটুকরো পনির, আর এক কাপ চা। পাহাড়ে উঠতে হবে যখন, হালকা খাওয়াই ভাল—বেশি খেলে খিল ধরে যাবে পেটে। চা শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে আবার গুনগুনিয়ে উঠল সে: গুলোঁমে রাঙ্গ ভারে···

ঠিক দশটার সময় কাঁধে বিনকিউলার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল জাফর ওর ভেসপা নিয়ে।

শান ভিলাটা পেরিয়েই পাহাড়ের মাথায় দেখতে পেল জাফর প্রহরীটাকে। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। ব্যাপার কি! ওই পাহাড়ের

মাথায় পাহারা কেন? পাহারা বসানো হয়েছে, নাকি কোন···বিশেষ কারণে উঠেছে উপরে, নেমে যাবে এক্ষুণি? লোকটা একা, না আরও লোক আছে?

বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়ে প্রহরীর দৃষ্টির আড়াল হয়েই থেমে দাঁড়াল জাফর। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেল ভেসপাটা। পছন্দসই একটা জায়গায় ওটাকে লুকিয়ে রেখে সাবধানে এগোল সে উঁচু পাহাড়টার দিকে। শ'দুয়েক গজ এগিয়ে আবার দেখতে পেল সে প্রহরীটাকে। হেঁটে বেড়াচ্ছে, হাতে ধরা রয়েছে কুকুরের চেন। রুমাল বিছিয়ে বসে পড়ল জাফর মাটিতে। প্রথমে এই ব্যাটার ভাবভঙ্গিটা একটু বুঝে নিতে হবে।

আধঘণ্টা ঠায় বসে থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারল জাফর, পাহারাই দিচ্ছে লোকটা, নেমে যাওয়ার কোন লক্ষণই নেই ওর মধ্যে। আন্দাজ করে নিল, নিচে আরও লোক থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে জানাবে ব্যাপারটা বিল্লাকে। পাহারাদার রয়েছে, এটাই তো একটা বড় তথ্য। কিন্তু তাহলে অসন্তুষ্ট হবে লোকটা। খান ভিলার অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষার ঠিক কি অবস্থা জানতে চায় আসলে বিল্লাহ, কিভাবে কি করলে সহজে উদ্ধার করা যায় হান্না কাওসারকে, বর্তমান অবস্থায় কোন্ স্ট্র্যাটেজি নেয়া দরকার বুঝতে চায়। ফিরে গিয়ে পাহারাদার রয়েছে বলে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি বলা ঠিক হবে না।

ভেবেচিন্তে সাবধানে সামনে এগোনোই স্থির করল জাফর। এতবড় জঙ্গল ছাওয়া পাহাড়কে দশজন প্রহরীর পক্ষেও গার্ড দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ওদের আছেই তো মোট ছয়জন সেপাই। এর মধ্যে থেকে একজন, কি বড় জোর দু'জনকে ছাড়তে পারবে ওরা পিছনের পাহাড়ে গার্ড দেয়ার জন্যে। একজন তো দেখাই যাচ্ছে, অপরজনকেও খুঁজে বের করে নেওয়া কঠিন হবে না, যদি থাকে। তার চোখে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করে ফিরে যাওয়াও কিছু কঠিন হবে না।

মনে মনে হিসেব করে দেখল জাফর, খান ভিলায় কি চলছে দেখতে হলে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার কোন দরকারই নেই। চূড়া থেকে গজ তিরিশেক নিচে পৌঁছুতে পারলেই যথেষ্ট। ওখান থেকে কাজ সেরে ফিরে আসতে হলে কোন্ পথে পাহাড় বেয়ে ওঠা সবচেয়ে সহজ হবে বুঝে নিল সে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে। চারিটা পাশ দেখে নিল যতদূর দেখা যায়। তারপর পিস্তল হাতে অতি সন্তর্পণে এক পা দু'পা করে এগোতে শুরু করল চোখ-কান সজাগ রেখে। কিছুদূর যায়, থামে, ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ লক্ষ করে, নিশ্চিন্ত হয়ে আবার এগোয় কয়েক পা।

সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল

জাফর। কয়েক হাত সামনে ঘাসের উপর তাজা রক্ত চোখে পড়েছে ওর। এখানে রক্ত কিসের! প্রথমেই বাঘের কথা মনে এল ওর। বাঘে খেলো কাউকে? এখুনি ওর ঘাড়ের উপরও লাফিয়ে পড়বে না তো! চিকন ঘাম বেরিয়ে এল কপালে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাত-পা। আধ মিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে সাহস সঞ্চয় করল জাফর। রক্তের আশপাশে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন না দেখে পায়ে পায়ে এগোল সামনে, লক্ষ করল কিছু একটা জিনিস এখান থেকে হেঁচড়ে টেনে উপরে তোলা হয়েছে। আরও ভাল করে খেয়াল করতেই ছিটেফোঁটা রক্তও চোখে পড়ল ওর।

বেশিদূর যেতে হলো না, দাগ ধরে সাত-আট গজ এগিয়েই আবিষ্কার করল সে লাশটা। মিলিটারি গার্ড। পিঠে বাঁধা ওয়াকি-টকি ওয়্যারলেস সেট। এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল, বাঘ নয় কাজটা বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাণী—মানুষের। ইউনিফর্ম ভেদ করে সোজা হৃৎপিণ্ডে ঢুকেছে গুলিটা, বেরিয়ে গেছে পিঠ ভেদ করে। রিগর মর্টিস শুরু হয়নি এখনও—অর্থাৎ, বেশি আগের ঘটনা নয়।

ব্যাপারটার হাত-মাথা কিছুই বুঝতে পারল না জাফর। কে মারল একে? কেন? গুলি করে মারা হলো একজন প্রহরীকে অথচ আরেকজন টেরও পেল না, নিশ্চিন্তে পাহারা দিচ্ছে পাহাড়ের মাথায়—এটা কি রকম ব্যাপার? তাহলে কি সাইলেন্সার ব্যবহার করছে আততায়ী? হত্যার মোটিভটা কি? নিজেদের ভিতরের কোন কলহ? হত্যাকারী কোথায়? কাজ সেরে চলে গেছে নাকি ঘাপটি মেরে রয়েছে আশেপাশেই?

এখান থেকেই ফেরত যাবে কিনা ভাবল জাফর একবার। কাজটা যে ক্রমেই জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে সিকান্দার মির্জাকে বুঝ দেয়ার জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট বলে মনে হলো ওর কাছে, কিন্তু সন্তুষ্ট করা যাবে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাফর সিদ্ধান্ত নিল, হাতে সময় আছে, যে কাজে এসেছে সেটা না সেরে ফিরবে না। অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল সে পাহাড়ের গা বেয়ে। কাঠবেড়ালীর মত তরতর করে উঠে যাচ্ছে সে নিজাম যে দেবদারু গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সেই গাছ লক্ষ্য করে।

মাথাটা ডান পাশে কাৎ করল নিজাম। আনলোড়ে রাইফেলটা কোলের উপর থেকে নামিয়ে রাখল মাটিতে। অতি সন্তর্পণে উঠে আসছে কেউ—শব্দ শুনেছে সে। এইদিকেই আসছে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। রাইফেল আর ক্যানভাসের ব্যাগটা রেখে নিঃশব্দে সরে গেল সে। আত্মগোপন করল বুক সমান উঁচু কাঁটা ঝোপের ওপাশে।

দেবদারু গাছটার পাশ দিয়ে আরও খানিকটা উপরে ওঠার ইচ্ছে ছিল জাফরের, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে আবার। রাইফেল আর ব্যাগ পড়ে রয়েছে কেন এখানে! এখানেও কি খুন হয়েছে আরও কোন প্রহরী? আশেপাশের মাটিতে রক্ত খুঁজল সে। কিছু না পেয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে হাতে নিল সে রাইফেলটা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাইল জাফর। কেন যেন মনে হলো মারাত্মক বিপদ আসছে ওর পিছন থেকে।

যা দেখল তাতে কেঁপে উঠল ওর অন্তরাত্মা। ঠিক দুই হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকায় নোংরা দুই সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। ধক-ধক জ্বলছে চোখ জোড়া। হাতে ছয় ইঞ্চি ব্লেডের একটা ছুরি।

মুহূর্তে বুঝতে পারল জাফর, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে ওর, হাতে ধরা রাইফেল বা পিস্তলে কাজ হবে না—কিছুতেই রক্ষা নেই ওর এই লোকটার হাত থেকে। অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পিঠের উপর, হৃৎপিণ্ডের কাছটায় পিন ফোটানোর মত ব্যথা লাগল, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীরটা।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে নিজামের চোখ-মুখ আর শার্ট লাল করে দিল। জাফরের পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেলল সে চট্ করে—মাটিতে আছড়ে পড়লে টের পেয়ে যেতে পারে উপরের সেপাই—পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে নিয়ে আস্তে নামিয়ে দিল কয়েক হাত তফাতে ঝোপের আড়ালে। গলার ঘড় ঘড় আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেছে।

টিক্ টিক্ চলছে শুধু জাফরের নির্লিপ্ত হাতঘড়িটা।

নয়

টেলিফোন ডায়রেক্টরী ঘেঁটে পাওয়া গেল আখতারুজ্জামানের নাম্বার। রিং করতে যাবে রানা, এমন সময় পিলটি মিএার ফোন এল ঢাকা থেকে। মিনিট তিনেক চুপচাপ শুনে গেল রানা, তারপর, 'আচ্ছা, ঠিক আছে' বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

চিন্তামগ্ন রানার কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল রাবেয়া মজুমদার, 'কি হলো? খারাপ সংবাদ?'

'খারাপই শুধু নয়—ঘোলাটে।' চোখের ইশারায় ঘরের সিলিং দেখাল রানা—অর্থাৎ, হান্না কাওসার সম্পর্কে বলছে। 'মেয়েটা ক্রমেই আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠছে।'

'খারাপ হতে যাবে কেন, এটা তো সুসংবাদ!' হাসল রাবেয়া। 'শুনেছি, মেয়েরা যে যত বেশি রহস্যময়ী হতে পারে, সে ততই বেশি আকর্ষণ করতে পারে পুরুষকে।'

'লিমিট আছে। অতিরিক্ত রহস্যময়ী হয়ে পড়লে আবার ভূত বা পেত্নী মনে করে ভয় পাবে পুরুষ। লিমিট ক্রস করে কয়েকশো মাইল চলে গেছে হান্না কাওসার।'

মুড অফ হয়ে গেছে রানার। জামানকে রিং করবে কিনা তাই নিয়ে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে রিসিভারটা তুলে নিল সে। এখন গল্প জমবে না বুঝতে পেরে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা স্কুল ছাত্রীর মত বুকে চেপে ধরে চলে গেল রাবেয়া মজুমদার।

বাড়িতেই পাওয়া গেল আখতারুজ্জামানকে। ওর বাড়ির এত কাছে রানা রয়েছে জানতে পেরে উল্লসিত হয়ে উঠল সে। একেবারে হৈ-চৈ শুরু করে দিল, কোন কথাই শুনবে না, এক্ষুণি জীপ পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাজের কথা শুনে উল্লাসের ব্রেক চেপে আশ্রয় নিল প্রলোভনের। বাঘের সংবাদ পেয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে সে, সঙ্গে সেই শিকারী আসফ খানও রয়েছে—রানার মনে নেই, সেই যে যার পাসপোর্ট নিয়ে ছদ্মবেশে ব্ল্যাক স্পাইডার ধরতে গিয়েছিল সে বোম্বে?' দারুণ অমায়িক ভদ্রলোক। রানাকে পেলে দারুণ জমবে এবারের শিকার। ভুয়ো খবর নয়, সত্যিই বাঘ এসেছে এবার। কসম খোদার!

জমজমাট লোক জামান। গোটা ফ্যামিলি ঢাকায়, কিন্তু কিছু দিন পর পরই দেশের টানে চলে আসে সে এই জঙ্গলে। একা থাকতে পারে না, তাই যখনই বাড়ির দিকে মন টানে তখনই বাঘের লোভ দেখায় সে বন্ধু-বান্ধবকে। সত্য-মিথ্যা গল্প বানিয়ে এমন বর্ণনা দেয় যে মেডিকেল লীভের দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে কক্সবাজার রওনা না হয়ে উপায় থাকে না কারও, ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের হঠাৎ বউকে জানাতে হয় ভীষণ জরুরী ব্যবসায়িক কাজে যেতে হচ্ছে তাকে কক্সবাজার, ট্যুরে। সাথে বন্দুক কেন? আজকাল দেশের যা অবস্থা...পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে ডাকাত-টাকাত...ব্যস, আর কৈফিয়ৎ চাইবে না কেউ।

জামানের গুলপট্টির কথা সবাই জানে, কিন্তু ওর সঙ্গটাই এমন প্রীতিকর, সর্বক্ষণ এমনই জমিয়ে রাখে যে কিছুদিন জঙ্গলে শিকার-শিকার খেলে থা-

হ্যাতে ফিরে এসেও ক্ষোভ থাকে না কারও। নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে বিকেলের দিকে সময় করে আসফ খানকে নিয়ে একবার এদিক থেকে বেড়িয়ে যেতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করল রানা, রাজি হয়ে গেল জামান।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার কিছুক্ষণের জন্যে রুবি-মন্দিরের উপাখ্যানে ডুবে গেল রানা। গোটা পঞ্চাশেক পাতা যাচ্ছে আর শেষ হচ্ছে।

পায়চারি থামিয়ে চিশতি হারুনের দিকে ফিরল সিকান্দার বিল্লাহ। কুঁচকে রয়েছে ভুরুজোড়া।

'হলো কি ছোঁড়ার?' ঘড়ি দেখল কব্জি উল্টে। 'একটা বাজে! তিন ঘন্টায়ও ফিরে আসতে পারল না কাজ সেরে? করছে কি ওখানে?'

জানালা দিয়ে সমুদ্র স্নানরতা দুই বিকিনি পরা বিদেশিনীকে লক্ষ করছিল চিশতি, বহুকষ্টে চোখ ফিরাল সিকান্দারের দিকে।

'রাস্তাটা ভাল না। হয়তো স্পার্ক প্লাগ পরিষ্কার করছে, নয়তো লিক হয়ে গেছে চাকা—বদলাচ্ছে। অধৈর্য হওয়ার কিছুই নেই বস্। নাস্তার ব্যবস্থা তো করেই গেছে, না খেয়ে নেই আমরা।' সমুদ্রের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ফিগার, বটে মেয়েটার। ওই যে···বাম পাশেরটা। দেখুন, ওস্তাদ···দর্শনেও অর্ধ-ভোজন। এমন জিনিস যদি···'

'শাট আপ!' ধমকে উঠল সিকান্দার বিল্লাহ। এত জোরে ধমক দিল যে চমকে ঘাড় ফিরাল চিশতি হারুন। 'ইয়ার্কি রাখো এখন, চিশতি! একটা স্কুটার ভাড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ওই পাহাড়ে গিয়ে দেখে এসো কি করছে হারামজাদা।'

মুহূর্তে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে চলে এল চিশতি। বিল্লার উদ্বেগ সংক্রমিত হলো ওর মধ্যেও। সত্যিই তো? গেল কোথায় ব্যাটা? ধরা যদি পড়ে থাকে তাহলে ওদেরকেও বিপদে ফেলে দিতে কতক্ষণ? তার চেয়ে নিজে গিয়ে দেখে আসা অনেক ভাল। কোন কথা না বলে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

জানালার ধারে খালি চেয়ারটায় এসে বসল বিল্লাহ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বামদিকের যুবতী ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে নাচাতে শুরু করল সে প্রবল বেগে। চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে মেয়েটির উপর।

বিশাল খড় নিয়ে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের কামরায় প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ। হাতে একটা চামড়ার সুটকেস।

'এই যে স্যার,' বলল সে। 'এয়ারপোর্টেই পড়ে ছিল। আনক্লেইমড।'

'কি আছে এর ভেতর?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহেলের চোখ মুখ। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'জামা-কাপড়, স্যার। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তন্ন তন্ন করে। শুধুই কাপড়—দামী, কমদামী, সব রকমই আছে. কিন্তু আর কিছুই নেই। আমরা যা আশা করছি, সেসব কিছু না।' পুরু কার্পেটের উপর নামিয়ে রাখল ক্যাপ্টেন সুটকেসটা।

'পাসপোর্টটা?' বসে পড়ল সোহেল।

'ওটাও পাওয়া যায়নি, স্যার।'

চিন্তান্বিত সোহেল চুপ করে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'হয়তো হ্যান্ডব্যাগে ছিল। স্মৃতি যদি সত্যিই হারিয়ে থাকে, মনে হচ্ছে, ঢাকায় পৌঁছবার আগেই হারিয়েছে। ঠিক আছে, এটাকে কক্সবাজার রওনা করে দাও। কাল সকালেই যেন পায়। পরিচিত জিনিস কাছে পেলে স্মৃতি ফিরতে সাহায্য হতে পারে মেয়েটার।'

'স্মৃতি সত্যি সত্যিই হারিয়েছে কিনা তাতেই তো সন্দেহ আসতে শুরু করেছে এখন, স্যার।'

'হুম! তোমাকে যা যা খোঁজ নিতে বলেছিলাম, নিয়েছ?'

'জ্বি, স্যার। রমনা পার্কে ওকে প্রথম দেখেছিল একজন মালী। তার হাঁকডাকেই আর্ট কলেজের দু'জন ছাত্র আরও লোকজনের সাহায্যে ওকে মেডিকেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। বদরুল আর হালিমের সাথে কথা বলে কোন লাভ হয়নি। মনে হয় না ওরা এর সাথে কোন ভাবে জড়িত।'

'আরও লোকজন?'

'তাদের মধ্যে একজন নাকি খুব অ্যাকটিভ ছিল, কিন্তু তার পরিচয় বলতে পারল না কেউ। আর সাপ্তাহিক স্যাটারডে প্রথমটায় কিছুতেই বলতে রাজি হচ্ছিল না খবরটা কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে সে সম্পর্কে। চাপ দেয়ায় এখন বলছে আসলে ওরা সংগ্রহ করেনি, ছবি আর নিউজ পৌঁছে দিয়ে গেছে কেউ। কে দিয়ে গেছে বলতে পারে না।'

'অর্থাৎ কোনদিক থেকেই কোন অগ্রগতি হয়নি। ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে, রানার সন্দেহ অনুযায়ী সত্যিই যদি চতুর্থ কোন পক্ষ থাকে, সে বা তারা।'

'লোক ধরতে পারিনি, স্যার। তবে ছবি ধরেছি একটা।'

'অর্থাৎ?'

'আই. বি-র সেই হ্যান্ড আউটের সাথে মেয়েটার একটা ছবিও ছিল

স্যার।' এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করলাম স্যাটারডে-তে ছাপা ছবির সাথে এ ছবির তফাৎ আছে। একই জনের ছবি, কিন্তু এক ছবি নয়।'

সোজা হয়ে বসল সোহেল কথা শুনে।

'বলো কি?'

'জ্বি, স্যার। দুটো ছবি আলাদা।'

'তাহলে তো মনে হচ্ছে রানার সন্দেহই ঠিক!' বিচলিত হয়ে পড়ল সোহেল। ঘোরতর কোন প্যাঁচ রয়ে গেছে এর মধ্যে! এখুনি জানাতে হয় রানাকে!' হাতের ইশারায় বিদায় করে দিল সে ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাকে। 'তুমি সুটকেসটা পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আর মেডিকেল কলেজ থেকে পি.জি-তে কেন সরানো হলো ওকে, সেই ব্যাপারটা খোঁজ নাও।'

বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ।

দশ মিনিটের মধ্যে খান ভিলার লাইন দিল অপারেটর। ছবির ব্যাপারটা জানাল সোহেল রানাকে। সুটকেসটা কাল সকালের ফ্লাইটে পৌঁছে যাবে কক্সবাজার, জানাল। ওদিকের আর কোন নতুন খবর নেই জেনে নামিয়ে রাখল রিসিভার, মন দিল IN লেখা ট্রের উপর সাজানো স্তূপীকৃত ফাইলের প্রথমটায়।

অসকার শেফিল্ডের 'দা রেড হিল' শেষ করে আড়মোড়া ভাঙল রানা। ঘড়ি দেখল—দেড়টা বাজে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই জানিয়ে গেছে ওহিদোরঅন, খাবার রেডি, হুকুম করলেই টেবিল সাজাবে। ওকে খাবার দিতে বলে রাবেয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। খাটের উপর বালিশ বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে গোগ্রাসে গিলছে পুতুল নাচের ইতিকথা। মৃদু হাসল রানা।

'খিদে ভুলে গেছেন নিশ্চয়ই?'

'ভুলে গেছি মানে? চিড়বিড় করে জ্বলছে পেটের ভিতর।' উঠে পড়ল রাবেয়া। 'দিয়েছে খাবার?'

'দিচ্ছে। পাঁচ মিনিট—গোসলটা সেরে আসছি আমি।'

হান্না কাওসারের ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। ব্যালকনির ছায়াটা টানল রাবেয়াকে। হাওয়ায় দুলছে রেলিঙের ধার ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা টবে পাতাবাহারের রঙচঙে পাতাগুলো। দুটো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে এ পাতা থেকে ও পাতা। বইটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল সে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে।

রক্তের কেমন একটা আঁশটে গন্ধ আসছে নিজামের নাকে। রক্তে ভেজা শার্টটা খুলে ফেলেছে সে, শুকনো অংশ দিয়ে মুখ আর হাত মুছে ফেলেছে,

কিন্তু তবু চট্‌চাটে ভাবটা যাচ্ছে না। ডান হাতটা মুঠো করলে আঙুলগুলো সেঁটে যাচ্ছে পরস্পরের সাথে। কোথেকে গোটা কয়েক মাছি এসে জুটে গেছে, ভনভন করে বিরক্তি উৎপাদন করছে—বারবার উড়ে এসে বসছে হাতে মুখে, নাকে।

ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা পানি ডানহাতের তালুতে আঁজলা করে নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলল নিজাম। সূর্যের অবস্থান দেখে বেলা কত হলো বোঝার চেষ্টা করল। এখানে এসে বসে আছে, তা দু'তিন ঘণ্টা তো হবেই—ব্যালকনিতে মেয়েটার ছায়াও দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত। একবার মাসুদ রানাকে শুধু কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেয়েছে সে। রেলিঙের ধারে এসে সুখ-টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ফেলেই ফিরে গেছে ভিতরে।

খিদে খিদে একটা ভাব হতেই বাকি ছ'টা স্যান্ডউইচ খেয়ে নিল নিজাম। বিনা কাজে বসে থাকলে খালি খালি খিদে পায় ওর। ফ্লাস্ক থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে তিন ঢোক পানি খেয়েই হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর। চট করে মাটিতে নামিয়ে রাখতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল ফ্লাস্কটা। পানি সব পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চট্ করে কোলের উপর রাখা রাইফেলটা তুলল সে কাঁধে।

এই যে—মারানী!

নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ল নিজামের। কাঁধ পর্যন্ত বব্-ছাঁটা চুল, ফুটফুটে সুন্দর একটা মেয়ে এসেছে ব্যালকনিতে। হাতে বই। একটা ফোল্ডিং চেয়ারে থকে বসে পড়তে দেখে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত হলো নিজামের।

টেলিস্কোপিক সাইটের মধ্যে দিয়ে একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। ছবি দেখেছে নিজাম এর। যদিও অস্পষ্ট ছিল, খবরের কাগজে ছাপা ছবিটার চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে হুবহু। নার্সটার চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা…এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, নিজ চোখে দেখেছে সে পিছন থেকে পি.জি. হাসপাতালের চারতলায়। কাজেই বব-ছাঁটা চুলের এই মেয়েটাই হান্না কাওসার।

কয়েক সেকেন্ড সাগরের দিকে চেয়ে থেকে কোলের উপর রাখা খোলা বইয়ে চোখ নামাল মেয়েটা। চোখ দুটো সামান্য নড়ছে বই পড়তে গিয়ে, কিন্তু মুখটা স্থির হয়ে রয়েছে। পড়তে পড়তেই কি এক হাসির কথায় মৃদু হাসি ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, বুঝল নিজাম। ক্রস হেয়ারের কেন্দ্র-বিন্দু এসে স্থির হলো মেয়েটির কপালে। দম বন্ধ রেখে ধীরে চাপ দিল সে ট্রিগারে।

দশ

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্নান সেরে বেরিয়ে এল রানা বাথরুম থেকে।

আয়নায় নিজেকে দেখছিল, ঘাড় কাত করে রানার দিকে চাইল হান্না, হাসল। রানাকে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। টুল ছেড়ে চলে গেল জানালার পাশে।

'আর কিছু মনে পড়ল?' চুলে চিরুনি বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়াল হান্না।

'কয়েকটা ব্যাপারকে ভয় পাচ্ছ তুমি, হান্না। নয়াদিল্লীতে কি ঘটেছিল সেটা কিছুতেই মনে আসতে দিতে চাইছ না। মনে হচ্ছে, সেইজন্যেই আটকে রয়েছে সব। এই জায়গায় যদি মনটা একটু ঢিল দিতে পারতে, আমার মনে হয় হুড়মুড় করে আর সব স্মৃতিও চলে আসত। ওখানে হয়তো সত্যিই বিপদ ছিল কিন্তু এখন তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় রয়েছ; আমি আছি পাশে···এখানে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না বাজপেয়ী।'

ভুরুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে রয়েছে হান্নার। মনে করবার চেষ্টা করছে।

'কেন যেন মনে হচ্ছে, টের পেয়ে গেলেই খুন করবে লোকটা আমাকে।'

'একথা তুমি আগেও বলেছ। বলেছ, বর্ডার ক্রস করতে দেবে না। কিন্তু বর্ডার ক্রস করে চলে এসেছ তুমি। এখন তো কোন ভয় থাকা উচিত না। এটা বাংলাদেশ—এখানে বাজপেয়ীর সাধ্য নেই তোমার কোন ক্ষতি করে।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল হান্না কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না।

'আচ্ছা, শিরিন কাওসারকে তোমার মনে পড়ে?' এবার আরেকদিক থেকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করল রানা।

'কে সে? নামটা চেনা চেনা লাগছে। চিনি আমি ওকে? আমার কেউ হয়?'

চেষ্টা সত্ত্বেও যে হান্না কিছু মনে আনতে পারছে না, এবং চেষ্টা যে সত্যিই করছে, টের পেল রানা ওর চোখ-মুখের ভাব দেখে। অভিনয় যে নয়, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীরের ওপাশে আটকা পড়েছে ওর সব স্মৃতি, কিছুতেই রাস্তা পাচ্ছে না সে ওপাশে যাওয়ার।

'খাওয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আধঘণ্টা আগে। খিদে ছিল না, তবুও জোর করে খাইয়ে গেল রাবেয়া।

মেয়েটি কিন্তু ভারি মিষ্টি। একে কি ঢাকা থেকেই নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।' ঢাকার কথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়। খাটের পাশে বসে ডাকল হান্নাকে। 'বসো এখানে।'

হান্না পাশে এসে বসতেই ওর পিঠ জড়িয়ে ধরে বাম বাহুটা চেপে ধরল রানা কাঁধের কাছে, আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে।

'আমার কাছে কিছু গোপন করতে চাও তুমি, হান্না?'

'না। কিছু গোপন করতে চাই না।'

'আমাকে বিশ্বাস করো?'

'নিশ্চয়ই। স্বামীর ওপর বিশ্বাস না থাকলে তিন বছর তার ঘর করা যায় বুঝি?'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। অনেকটা খেলার মত। তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি কয়েকটা শব্দ বলব। সাথে সাথেই, বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে, তোমার মনে প্রথম যে কথা আসবে সেটা বলে ফেলবে—কেমন? এই যেমন মানব বললে দানবের কথা মনে আসতে পারে, নদী বললে মনে হতে পারে নালার কথা। বুঝতে পেরেছ? চিন্তার দরকার নেই, যা মাথায় আসবে, বলে ফেলবে চট্ করে। পারবে না?'

'পারব।'

'গুড! চোখ বন্ধ করো। আমি বলছি—কুমীর।'

'কুমীর কুমীর জলে নেমেছি।' বলল হান্না চোখ বুজে।

'বেশ। এবার বলছি—চানখার পুল।'

'চানখার পুলে প্যাডেল মেরে পৌঁছে বাড়ি।'

'এবার—শাহবাগ।'

'হোটেল।'

'আচ্ছা—বর্ডার।'

'বর্ডার...বর্ডার ট্রেনিং ক্যাম্প...পরিকল্পনা...' দুই হাত মুঠি পাকিয়ে ফেলেছে হান্না।

'মতিঝিল।'

'কমার্শিয়াল এরিয়া।'

'ভাত দে হারামজাদা।'

'নইলে...মানচিত্র খাব।'

'সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ী।'

'মেরে ফেলবে!' চট্ করে চোখ মেলল হান্না। 'সাইক্লোফিল্ম...' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে। 'ভয় লাগছে...রানা!'

'কোন ভয় নেই। আমি আছি পাশে। থাক এখন এসব, তোমার ওপর চাপ পড়ছে। আমি খেয়ে আসছি। যদি কিছু মনে পড়ে বোলো তখন।'

জানালার ধারে চলে গেল হাম্না। বাইরের দিকে চেয়ে বলল, 'কী সুন্দর রোদ। বাইরে যেতে খুব ইচ্ছে করছে। ব্যালকনিতে গিয়ে বসি না কিছুক্ষণ? কিংবা নিচের ওই সুন্দর লনে?'

'উঁহু। ডাক্তারের বারণ।'

রানা লক্ষ করল মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরে চেয়েছিল, মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে ব্যালকনির দিকে চাইল হাম্না। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বশরীর। সামনে ঝুঁকে কি যেন ভাল করে ঠাহর করে দেখল। পরমুহূর্তে দুইহাতে নিজের গালের দু'পাশ চেপে ধরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। আকস্মিক চিৎকারে একেবারে হকচকিয়ে গেল রানা। অজানা আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা।

পাঁই করে ঘুরল হাম্না। দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

'কি-কি হয়েছে ওর! অমন করে রয়েছে কেন!'

দুই লাফে জানালার ধারে পৌঁছে গেল রানা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ব্যালকনির একাংশ। বসে আছে রাবেয়া মজুমদার। ধড়াস্ করে উঠল রানার কলজেটা।

অস্বাভাবিক একটা ভঙ্গিতে বসে রয়েছে রাবেয়া। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে, কাত হয়ে আছে একপাশে। কপালের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা লাল গর্ত দেখতে পেল রানা। টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরে পড়ছে বাসন্তী রঙের শাড়িতে।

ঘুরেই দৌড় দিল রানা দরজার দিকে। শুনতে পেল ককিয়ে উঠল হাম্না কাওসার, দম নিল ফোঁপানো ভঙ্গিতে, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে।

পাহাড়ের মাথায় টহলরত জহিরুদ্দিন রেগে ভূত হয়ে আছে ল্যান্স নায়েক রিয়াজের উপর। ওর স্থির বিশ্বাস, রোদে পোড়ার কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই তাকে পাঠিয়েছে ব্যাটা পাহাড়ের মাথায়। নিজে আরাম করে ঘুম মারবে নিচে গাছের ছায়ায় শুয়ে। সেই জন্যে কুত্তাটাকেও চাপিয়েছে ওর ঘাড়ে। এটাকে সামলানোও কম কথা না—এই কষ্টটাও স্বীকার করতে রাজি না রিয়াজ। ঠিক আছে, বাবা, তুমি ল্যান্স নায়েক, তোমার কথা না শুনে উপায় নেই আমার। আমারও দিন দেবে খোদাতালা।

দু'ঘণ্টা পর পর ওয়াকি-টকির মাধ্যমে যোগাযোগ করবার কথা রিয়াজের।

প্রথম দু'ঘন্টা পর ঠিকই যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন সাড়াশব্দ নেই। কয় দু'ঘন্টা পার হয়ে গেছে আল্লাই মালুম। ঘড়ি নেই সাথে, কিন্তু সূর্য দেখেই আঁচ করা যাচ্ছে, অন্তত চারটে ঘন্টা পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ঘুমাও—আল্লাই তোমার দিন দিয়েছে, ঘুমিয়ে নাও যত পারো।

দরদর ঘামছে জহিরুদ্দিন, মাঝে মাঝে ক্যাপটা খুলে চাঁদি ঠাণ্ডা করে নিচ্ছে। বাতাস আছে, কিন্তু প্রচণ্ড রোদের তাপে গরম হয়ে উঠেছে বাতাসও। কুকুরটা হাঁপাচ্ছে জিভ বের করে। ছায়া চায়। স্টেনগানের নলটা তেতে আগুন হয়ে আছে।

খান ভিলার অভ্যন্তরে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে জহিরুদ্দিন। এত দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কোন্ জায়গায় কাকে কোন পজিশনে পাহারায় বসানো হয়েছে জানা আছে ওর। ওই ওপাশের একটা ঝোপের কাছে ধোঁয়া দেখে টের পেল সিগারেট টানছে তালিম হোসেন। পাঁচ প্যাকেট সিগারেট খায় ব্যাটা রোজ। নিজে ধূমপায়ী নয়, তাই ধূমপানকে জহিরুদ্দিনের মনে হয় অর্থহীন পয়সা নষ্ট।

ব্যালকনির উপর এসেই চোখ জোড়া আঠার মত সেঁটে গেল ওর। মেয়েলোক! মেয়ে মানুষের কোথায় কি আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল সে। কিন্তু জ্ঞানটা সম্পূর্ণ থিয়োরিটিক্যাল—পর্নো-সাহিত্য আর যৌন পত্র-পত্রিকা থেকে আহরণ করা—প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নেই। অবিবাহিত। তাই মেয়েদের ব্যাপারে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। ব্যালকনির একটা চেয়ারে বসে মেয়েটিকে একটা বই খুলতে দেখে সব বিরক্তি দূর হয়ে গেল জহিরুদ্দিনের। হাসি ফুটে উঠল রোদ-পোড়া মুখে। ব্যস, সময় কাটানো আর কোন সমস্যা নয় তার কাছে। অনর্থক ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জহিরুদ্দিন।

কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই আঁৎকে উঠতে হলো ওকে: কি হলো! হঠাৎ এরকম ঝুঁকে পড়ল কেন মাথাটা? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জহিরুদ্দিনের চোখ জোড়া। এতদূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে কয়েক সেকেন্ড পরই বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ। রক্ত! বুকের কাছে শাড়ির একটা অংশ রঙ পাল্টে লাল হয়ে যাচ্ছে!

প্রথমেই ন্যান্স-নায়েক রিয়াজকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করল জহিরুদ্দিন, ওদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সরাসরি যোগাযোগ করল হাবিলদার শামসুদ্দিনের সাথে।

'তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো,' সব শুনে হাঁক ছাড়ল শামসুদ্দিন।

ট্র্যাপ হতে পারে। নড়বে না পজিশন ছেড়ে আমি দেখছি কি করা যায়। গুলি কোথায় লেগেছে? বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

'এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না, স্যার।'

'ঠিক আছে। তুমি আবার রিয়াজকে কন্ট্যাক্ট করবার চেষ্টা করো। চোখ কান খোলা রাখো চারদিকে। ওভার।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বিপদসঙ্কেত দিল হাবিলদার প্রত্যেক পোস্টে, তারপর পড়িমরি করে ছুটল ভিলার দিকে। বিস্মিত ওহিদোরঙ্গনকে একহাতে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল দোতলায়। ব্যালকনির দিকে চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছে সে, মারা গেছে মেয়েটা। সামনে এগোল সে। ঠিক এমনি সময়ে ঝটাং করে খুলে গেল হাসনা কাওসারের কামরার দরজা। ঝড়ের বেগে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

চট্ করে চোখ গেল রানার পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে রাবেয়া মজুমদারের কপালে গুলি লাগানো সম্ভব বুঝে নিতে দেরি হলো না ওর এক সেকেন্ডও। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো প্রহরীকে দেখতে পেল সে।

'আরেকজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা হাবিলদারকে।

'রিয়াজ ছিল নিচে। ওকে কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছে না, স্যার।'

রানা বুঝে নিল, আর কোনদিন যাবেও না। আর একবার চাইল সে দেবদারু গাছ আর তার আশেপাশের ঝোপের দিকে। ও জানে, হয়তো এই মুহূর্তে টেলিস্কোপিক সাইটের ক্রস হেয়ার ক্রসচিহ্ন এঁকেছে ওর বুকে, হয়তো ঠিক দু'সেকেন্ড পরেই গুলিটা এসে প্রবেশ করবে ওর হৃৎপিণ্ডের ভিতর—কিন্তু কিছুই কেয়ার করবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। ওকে যে হাসনা কাওসার মনে করে হত্যা করা হয়েছে বুঝতে পেরে ধিক্কার আসছে নিজের ভিতর। আগেই সাবধান করেনি কেন সে? বুকের ভিতরটা কেমন যেন হু-হু করছে রানার। মনে পড়ছে পরিষ্কার সুরেলা কণ্ঠস্বর—ভুলে গেছি মানে? চিড়বিড় করে জ্বলছে পেটের ভিতর।—চিরদিনের জন্যে মিটে গেছে ওর খিদে। কোন জ্বালা আর স্পর্শ করতে পারবে না এই মেয়েটিকে।

ধীরে ধীরে ফিরল রানা হাবিলদারের দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ওর।

'পাহাড়টা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। এক্ষুণি। সব কয়জনকে নিয়ে চলে যান ওই পাহাড়ে। এখানে আর পাহারা দেবার দরকার নেই।'

'এক-আধজনকে রেখে...'

'কাউকে রাখতে হবে না।'

'খুঁজে বের করব লোকটাকে?'

'না। শুধু ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করতে পারেন, কিন্তু তার আগে নয়। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন আপনারা। যান, কুইক!'

ছুটে চলে গেল হাবিলদার শামসুদ্দিন।

এগারো

টেলিফোন বেজে উঠতেই চমকে উঠল সিকান্দার বিল্লাহ। ভুলেই গিয়েছিল সে যে এই ঘরে একটা টেলিফোন আছে। চিশতি হারুনকে জাফরের খোঁজে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে করতে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। অশুভ চিন্তা উঁকিঝুঁকি মারছে ওর মনের মধ্যে। এক ঝটকায় কানে তুলে নিল রিসিভার।

'এলাহি কারবার হয়ে গেছে এদিকে, ওস্তাদ!' চিশতি হারুনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'মারা গেছে মেয়েটা। খুন হয়ে গেছে জাফর। পুলিস খুঁজছে আমাদের। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেখানে আছেন সেইখানেই বসে থাকেন চুপচাপ।' লাইন কেটে দিল চিশতি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি শুরু করল সিকান্দার বিল্লাহ ছোট্ট কামরার মধ্যে। অসংখ্য ভাঁজ ভর্তি নিষ্ঠুর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কপালের কয়েকটা শিরা ফুলে উঠেছে। ঘামতে শুরু করেছে শরীরটা। উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে সিগারেট ধরাল সে একটা।

আধঘণ্টা অপেক্ষার পর ঘরে ঢুকল চিশতি হারুন। ছদ্মবেশে।

'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল বিল্লাহ।

'খতরনাক হয়ে গেছে, ওস্তাদ। আগে থেকেই পাহাড়ে উঠে বসে ছিল কেউ রাইফেল নিয়ে। নিচে ঝোপের আড়ালে একজন ল্যান্স নায়েকের লাশ দেখলাম—কার গুলিতে মারা পড়ল সে, জাফর না আর কেউ, ঠিক বোঝা গেল না। আরও ওপরে, পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে পাওয়া গেল জাফরের লাশ। ছুরি। ওখান থেকে খান ভিলার ব্যালকনির দিকে চেয়েই দেখতে পেলাম হান্না কাওসারের লাশ। স্নাইপার। মনে হয় ইন্ডিয়ানদের কাজ।'

'তুমি শিওর, মেয়েটা হান্না কাওসার?'

মুচকি হাসল চিশতি। 'শাড়ি ছিল পরনে—পাছার দাগ দেখতে পাইনি।

তাছাড়া এত দূর থেকে সেটা দেখা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু বব-ছাঁটা চুল ঠিকই দেখেছি। নার্সটার চুল লম্বা—কোমর পর্যন্ত। কাজেই হান্না কাওসার না হয়ে উপায় নেই ওর। বেশি কিছু দেখবার সুযোগ পাইনি। মাসুদ রানাকে দেখলাম ব্যালকনিতে। খান ভিলার ভেতর অস্বাভাবিক আর্মি তৎপরতা দেখে টের পেলাম আমি রাস্তা পর্যন্ত পৌছবার আগেই পৌছে যাবে ওরা ওই পাহাড়ে। কাজেই কেটে পড়লাম।'

'কিসে করে গিয়েছিলে?'

'বেবি। ভাগ্যিস ঝোপের মধ্যে জাফরের ভেসপাটা পেয়ে আগেই বিদায় করে দিয়েছিলাম ড্রাইভারকে, নইলে ওর সূত্র ধরে এতক্ষণে এখানে পৌছে যেত পুলিস বা আর্মি। ওদের অ্যাকটিভিটি দেখেই আছড়ে-পাছড়ে নেমে এসেছি আমি নিচে। ভেসপা নিয়ে ছুট দিয়েছি উল্টো রাস্তা ধরে। বহুত ঘুরে রামু হয়ে ফিরে এসেছি আবার এখানে। রি-অ্যাকশন বুঝে নেয়ার জন্যে বাবরকে ফোন করেছিলাম হোটেল থেকে—ওর কাছেই শুনলাম পুলিস খুঁজছে আমাদের। এক্ষুণি কেটে না পড়লে বিপদ হতে পারে। জাফরের লাশ পাওয়া যাবে, ওর সূত্র ধরে এখানে এসে হাজির হতে পারে ওরা যে কোন সময়।'

'কিন্তু...' মাথার পিছনটা চুলকাল সিকান্দার বিল্লাহ। 'একেবারে শিওর না হয়ে যাই কি করে? ডেফিনিট নিউজ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?'

'আছে, ওস্তাদ।' কান পর্যন্ত হাসল চিশতি। 'বাবরের লোক আছে। নিউজ পেপারের করেসপন্ডেন্ট। ওর ডাক পড়েছে শুনলাম। একয্যাক্ট নিউজ পেয়ে যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

কোনমতে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে নিয়ে কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিল সিকান্দার বিল্লাহ ও চিশতি হারুন। ছদ্মবেশ ধারণ করেছে দু'জনই—চেহারার বর্ণনা শুনে বা পড়ে কারও সাধ্য নেই চিনে ফেলে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর টেলিফোন এল বাবরের। রিসিভার কানে ধরে দু'মিনিট চুপচাপ শুনল চিশতি, 'অলরাইট,' বলে নামিয়ে রাখল ওটা ক্রেডলে, ফিরল বিল্লার দিকে।

'চলুন, ওস্তাদ। সাংবাদিকদের একজনকে দেখানো হয়েছে লাশটা। কোন সন্দেহ নেই আর। মারা গেছে হান্না কাওসার।'

'বদরুদ্দিনকে জানানো...'

'বাবর জানাচ্ছে এখন তাকে সব ঘটনা। চলুন, কেটে পড়া যাক।'

খবর পেয়েই চলে এসেছে সোহেল আহমেদ। ঢাকা থেকে পতেঙ্গা এয়ারফোর্সের জেটে, পতেঙ্গা থেকে কক্সবাজার হেলিকপ্টারে, রানার নির্দেশে সাথে এনেছে ওস্তাদকে।

গুণ্ডা হচ্ছে রানার পোষা ব্লাড হাউন্ড। লায়লার স্মৃতি হিসেবে উপহার পেয়েছিল রানা এটাকে কয়েক বছর আগে। সেই যখন পাকিস্তান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে।[1]

অনেক বড় হয়েছে এখন গুণ্ডা, কিন্তু ছেলেমানুষী যায়নি। রানাকে দেখেই এক ঝটকায় সোহেলের হাত থেকে চেনটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে এল সে রানার সামনে, লাফিয়ে উঠে কোলাকুলি করল, প্রবল বেগে আন্দোলিত হচ্ছে লেজ। নিচু হয়ে ঝুঁকে আদর করল রানা ওকে, তারপর নরম গলায় একটা নির্দেশ দিতেই শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গুণ্ডা, বাঘের নজরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে চারপাশে।

সোহেলকে নিয়ে রাবেয়ার কামরায় প্রবেশ করল রানা।

'হঠাৎ এ কী হয়ে গেল, দোস্ত?'

সমস্ত ঘটনা বলল রানা ওকে। ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। রানার শুকনো মুখের দিকে চাইল।

'খেয়েছিস?'

'না। প্রতিশোধ না নিয়ে খাব না।'

আবার মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'গুণ্ডাকে আনিয়েছিস···কিছু প্ল্যান আছে নিশ্চয়ই তোর। কিন্তু শুধু পাহাড়টা ঘিরে রাখতে বলেছিস কেন, সার্চ করতে কি দোষ ছিল?'

'নিজে হাতে সারব আমি কাজটা। আমি সরিয়ে দেব সন্ধ্যার দিকে।'

'আর চুল? পরচুলা আনতে বলেছিস কেন?'

'হাস্নাকে সাজাব রাবেয়া মজুমদার। কয়েকজন করেসপণ্ডেন্টকে ডাকিয়েছিলাম। প্রচার করে দিয়েছি, মারা পড়েছে হাস্না কাওসার। লাশ দেখিয়ে বলেছি এই সেই মিস্টিরিয়াস মহিলা, যার গায়ে টাট্টু মার্ক আছে, স্মৃতিভ্রষ্ট অবস্থায় যাকে পাওয়া গিয়েছিল ঢাকার রমনা পার্কে।'

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে মুখটা ছুঁচাল করে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল।

'আশা করছিস যে এর ফলে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের প্রেশার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? গুড! কিন্তু তোর গল্প বিশ্বাস করবে ওরা?'

'কারা? এরা তো মজাদার স্টোরি পেয়েই খুশি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই তোলেনি। আর ওদের স্টোরির সাথে আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা আসল হাস্না কাওসারের ছবি যাচ্ছে—আশা করছি যে পড়বে, সেই বিশ্বাস করবে ওদের গল্প। রাবেয়ার লাশ নিয়ে চলে যাচ্ছিস তোরা আজই, সিপাই

---

[1] বিপদজনক দ্রষ্টব্য।

তুলে নেয়া হচ্ছে—খান ভিলা পাহারার আর কোন দরকার নেই; এসব দেখে আজই ওরা বুঝে যাবে মারা গেছে হাস্না কাওসার, কাল কনফার্মড হবে কাগজ দেখে।'

'তারপর?'

'নার্সের পোশাক পরিয়ে ওকে নিয়ে আমি চলে যাব কাল আখতারুজ্জামানের ওখানে। যে কয়দিন স্মৃতি ফিরে না আসে শিকারের ছলে থেকে যাব ওর ওখানেই।'

'ওকে জানিয়েছিস?'

'সব।'

'মেয়েটার অবস্থা কি এখন? নতুন কিছু মনে এসেছে ওর?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। রাবেয়ার লাশ দেখে ভয়ানক শক খেয়েছে। জ্ঞান ফিরেছে এখন, শুয়ে আছে বিছানায়—কথা বলছে না কারও সঙ্গে।'

'কিন্তু এই মেয়েটা, মানে রাবেয়া মজুমদারকে তো আর হাস্না কাওসার বলে কবর দেয়া যাবে না। ওর আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে...অনেক কমপ্লিকেসি...'

'তিনটে দিন ডিলে করবার ব্যবস্থা করবি তুই। ইনভেস্টিগেশনের নাম করে রেখে দে লাশটা মর্গের ফ্রিজিং কম্পার্টমেন্টে। তিন দিনে যদি ওর স্মৃতি ফিরে না আসে, আমার মনে হয় তা হলে আর কোনদিনই আসবে না।'

'ঠিক আছে। আমার কোন আপত্তি নেই। যা ভাল বুঝিস কর। কিন্তু চারটে খেয়ে নিতে অসুবিধে কি?'

'বলেছি তাকে।'

রানাকে আর ঘাঁটাতে সাহস পেল না সোহেল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কফিন-টফিন ইত্যাদি নানান ব্যবস্থা করতে হবে এখন। অনেক কাজ।

কটেজের সামনে ছোট্ট লনে একটা চেয়ারে বসে আছে মোহাম্মদ আলমগীর। পাশের চেয়ারটা খালি। এইমাত্র উঠে গেল কবিতা চা করে আনবে বলে। টের পেয়ে গেছে কবিতা?

সামনে কিছুদূর সী-বীচ, তারপর যতদূর দেখা যায় জল আর জল। বেশ জোরে বইছে বাতাস। সন্ধে হবে আর খানিক বাদেই। বীচে লোকজনের মেলা বসে গেছে। সাগরের কল্লোল ছাপিয়ে দু'একটা কণ্ঠের শোনা যাচ্ছে

পাশেই ছিল কবিতা, সামনে সী-বীচ এবং লোক, কিন্তু আলমগীরের

মনের ভেতর আশ্চর্য এক শূন্যতা বিরাজ করছে। অদ্ভুত একটা একাকীত্ববোধ বিরস, নিষ্প্রভ করে দিয়েছে ওকে। গত রাতের ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে, অনেক ভাবে উল্টে পাল্টে, উপায় ছিল না, ইত্যাদি ভেবে দোষ স্খালনের চেষ্টা করেছে সে কবিতার—কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারেনি কালিমা। ঠকানো হয়েছে ওকে, নিষ্ঠুরভাবে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে ওর আন্তরিক দুর্বলতা নিয়ে—এই উপলব্ধিটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে ওর নিজেরই উপর। কাল থেকে মন খুলে আর কথা বলতে পারছে না সে কবিতার সাথে—কারও সাথেই। মনটা বিরূপ হয়ে গেছে দুনিয়ার সবার উপর। বুঝতে পারছে, এদের সাথে জড়িয়ে একেবারে লেজে-গোবরে অবস্থা হয়ে গেছে ওর—ইচ্ছে হলেই যে নাগপাশ কেটে বেরিয়ে যাবে, তার উপায় নেই। তবু উপায় খুঁজছে ওর অবুঝ মন, ভাবছে কিভাবে কাটবে শিকল।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্বেগ। সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটাকে পাহাড়ের কিছুদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছে সে সেই সকাল দশটায়। তারপর থেকে শুরু হয়েছে প্রতীক্ষা। জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে তৈরি হয়ে বসে রয়েছে ওরা, ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে উৎকণ্ঠা, স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসতে চাইছে উত্তেজনার চাপ আর সহ্য করতে না পেরে—কিন্তু কোথায়, ফিরবার নাম নেই নিজামের। কি করছে লোকটা? কি ঘটছে ওখানে? সবকিছু ঠিক আছে তো?—কিছুই বুঝবার উপায় নেই। এই অনিশ্চয়তার অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।

দুপুরে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর হোটেলে গিয়ে সকালের সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করেছে কবিতা। ফিরে আসবার পর বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে ওর কবিতাকে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার রুচি হয়নি, কবিতাও বলেনি কিছু। কোন বিপদের আভাস পেল কবিতা? নইলে অমন ছটফট করছে কেন? নাকি ওই জানোয়ারটার নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় অমন করছে? ফিরে এসেই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেছে সে যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর সঙ্গে। দু'একটা টুকরো কথা কানে গেছে আলমগীরের। কবিতা বলছিল—ওকে ফেলে এভাবে সরে পড়া কি উচিত হবে? খুব সম্ভব কোন বিপদের কথা জানিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার কথা বলেছিল গাঙ্গুলী, কিন্তু নিজামকে ফেলে পালাতে মন চাইছে না কবিতার। বাঁকা হাসি খেলে গিয়েছিল আলমগীরের ঠোঁটে। গোটা ব্যাপারটার উপরে এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল মনটা যে নিরাপত্তার কথাও ভাববার প্রবৃত্তি হয়নি ওর। মনে হয়েছে, ঠিক আছে, হো[illegible] মস্ত কোন বিপদ এসে লণ্ডভণ্ড করে দিক সবকিছু—সে-ই ভাল।

হঠাৎ তীক্ষ্ন একটা চিৎকার ভেসে এল ঘরের ভিতর থেকে। ঝনঝন ক[illegible]

মেঝেয় পড়ে কাপ-তস্তরী ভাঙার শব্দ হলো। দ্বিতীয়বার চিৎকার করে উঠল কবিতা, কিন্তু মাঝখানেই থেমে গেল আওয়াজ। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা।

পকেট থেকে নিজামের দেয়া পিস্তলটা বের করে ফেলল আলমগীর। এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

'পিস্তল ফেলে দাও!' গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল জানালার ওপার থেকে।

পাঁই করে ঘুরল আলমগীর সেইদিকে। খাকি পোশাক দেখে মুহূর্তে বুঝে নিল সব শেষ হয়ে গেছে। পিস্তলটা জানালার দিকে তাক করে অন্ধের মত গুলি করল আলমগীর। গুলি করেই দৌড় দিল গাড়ির দিকে। রাইফেলের তীক্ষ্ণ 'টাশশ!' শব্দ এল ওর কানে, পরমুহূর্তে মনে হলো কেউ যেন কামারের লোহা-পেটানো হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত করল ওর পিঠে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল আলমগীর লনের উপর। শুকনো, খরখরে ঘাসের স্পর্শ পেল সে গালে। পাশ ফিরে পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু করবার চেষ্টা করল আলমগীর, কিন্তু শক্তি পেল না, হাত থেকে খসে পড়ে গেল পিস্তলটা। দেখতে পেল, দুই হাত ধরে কবিতাকে দরজা দিয়ে হেঁচড়ে টেনে বাইরে বের করে আনছে দু'জন খাকি পোশাক পরা লোক। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে কবিতার মুখ। আরও একটু বিস্ফারিত হলো ওর চোখ জোড়া আলমগীরের অবস্থা দেখে।

খুব দ্রুত আউট-অব-ফোকাস হয়ে যাচ্ছে কবিতার মুখটা, ঝাপসা দেখাচ্ছে এখন। আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে আলমগীরের দৃষ্টি শক্তি। কবিতাকে দেখা যাচ্ছে না। আশে পাশে সবুজ ঘাস ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে আর। নিভে যাচ্ছে ওর চোখের জ্যোতি। আঁধার হয়ে আসছে সব। ঘাসের উপর ওর শরীরের খুব কাছে এসে দাঁড়াল একজোড়া চকচকে পালিশ করা বুট। দৃষ্টির পরিধি ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল বুট জোড়াও। কাঁপুনি অনুভব করল আলমগীর দড়াম করে একটা বুট এসে পাঁজরে আঘাত করল যখন। ব্যথা পেল না। শুধু টের পেল, লাথি মারা হলো ওকে।

ওটাই ওর জীবনের শেষ অনুভূতি।

বারো

ওলিটা করেই সরে গিয়েছিল নিজাম, [illegible] ফিরে যেতে হবে। কেউ টের পেলে বাধার [illegible] দেয়াল দাঁড়ানো প্রহরীর গলার আওয়াজ [illegible]

মাধ্যমে কথা বলছে লোকটা ইন-চার্জের সাথে।

কি বলছে শোনা দরকার। আরও কয়েক হাত উপরে উঠে কান পাতল নিজাম। এখান থেকে দুই পক্ষের কথাই শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

হাসনা কাওসারের মৃত্যুসংবাদ দিল লোকটা খান ডিনার হাবিলদার সাহেবকে। নামতে যাবে, এমন সময় নড়াচড়ার আভাস পেল সে নিচে। রাইফেলটা তাক করল সেই দিকে। দেবদারু গাছের নিচে উঠে এল চিশতি হারুন। এক নজরেই চিনতে পারল নিজাম। এই লোককেই দেখেছে সে পি. জি. হাসপাতালে। বাংলাদেশ-আর্মির ড্রেস ছিল তখন, হাতে স্টেন ছিল। এখন পরনে রয়েছে জিনসের নীল প্যান্ট আর সবুজ হাফ-হাতা হাওয়াই শার্ট। হাতে পিস্তল।

অবাক হলো নিজাম। আর্মির লোকই যদি হবে, তাহলে ইউনিফর্ম পরা নেই কেন? আর এমন চোরের মতই বা অতি সন্তর্পণে উঠে আসছে কেন এ পাহাড়ে? ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক্ষুণি গুলি না করে এর হাবভাব দেখে একটু বুঝে নেয়া দরকার মতলবটা। এ কি আগের সেই লোকটাকে খুঁজতে এসেছে? তাই মনে হচ্ছে হাবভাব দেখে, কিন্তু এত সংগোপনে কেন?

রক্ত দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চাইল এপাশ ওপাশ। রক্তের দাগ ধরে এগোল পায়ে পায়ে। লাশটা খুঁজে বের করতে ওর কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না। মুখের চেহারা দেখে স্বল্পবুদ্ধি নিজামও পরিষ্কার বুঝতে পারল লোকটার পরিচিত কারও লাশ ওটা। আরও বোঝা গেল ভয় বা দুঃখের চেয়ে নিরাপত্তাবোধই অনেক অনেক বেশি জোরাল ভাবে কাজ করছে লোকটার মধ্যে। অর্থাৎ, চেনা লোক, কিন্তু ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু বা আত্মীয় নয়। চট করে ঝুঁকে লাশের পকেট সার্চ করে কাগজ-পত্র, টাকা সবকিছু বের করে নিয়ে নিজের পকেটে ভরল লোকটা। মরা আড়ষ্ট হাতে আঁকড়ে ধরে রাখা পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বহু নিচের ঝর্ণায়। তারপর দেবদারু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল ব্যালকনির দিকে।

কি দেখছে ব্যাটা? আলগোছে সরে এল নিজাম কয়েক পা। দেখল ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা এবং একজন হাবিলদার। কথা বলছে। হঠাৎ ঘুরেই দৌড় মারল হাবিলদার। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল মাসুদ রানা।

আবার কয়েক পা সরে এসে দেবদারু গাছের নিচে চিশতি হারুনকে দেখতে পেল না নিজাম। কোথায় গেল লোকটা? উঠে আসবে না তো আবার? চট করে বসে পড়ল সে একটা ঝোপের আড়ালে। ওকে দেখা মাত্রই

যে লোকটা গুলি করবে তাতে কোন সন্দেহই নেই নিজামের।

বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল, তবু কোন সাড়াশব্দ নেই লোকটার। ঘাপটি মেরে রয়েছে? বুঝতে পারছে নিজাম, এখন এই পাহাড় থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই নতুন আগন্তুকের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এক পা এদিক ওদিক যাওয়া যে মস্তবড় বোকামি হবে, সেটা বুঝতে পারছে আরও পরিষ্কার ভাবে।

এমনি সময়ে আবার কথাবার্তার শব্দে কান খাড়া করল নিজাম। হাবিলদারের নির্দেশ পরিষ্কার শুনতে পেল সে: তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো, জহির, খুনী ওই পাহাড়েই আছে। আমি তিন মিনিটের মধ্যে ঘিরে ফেলছি পাহাড়টা।

নিজামের বুকের ভিতর তড়াক করে লাফ দিল কলজেটা। তিন মিনিট! তিন মিনিট কেন, দশ মিনিটের মধ্যেও এখান থেকে নেমে পালাতে পারবে না সে! আটকা পড়ে যাচ্ছে! নিচের ওই নতুন লোকটা না থাকলে তবু চেষ্টা করে দেখা যেত। কিন্তু…

হঠাৎ পলকের জন্যে দেখতে পেল নিজাম চিশতি হারুনকে। অনেক নিচে। সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে। আড়াল হয়ে গেল দৃষ্টি-পথ থেকে।

নামতে শুরু করল নিজামও। অর্ধেকটা পথ নেমেই দেখতে পেল সে আর্মি জীপ। তিনটে জীপ থেকে তড়াক তড়াক লাফিয়ে নামছে অটোমেটিক রাইফেল আর স্টেনগান হাতে মৃত্যুদূতের মত বাংলাদেশ আর্মির জোয়ানরা। ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের চারপাশে। দ্রুত।

প্রমাদ গুনল নিজাম।

এদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মগোপন করা। লুকিয়ে থেকে যদি কোনমতে সন্ধে পর্যন্ত পার করা যায় তাহলে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এখান থেকে ওদের বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেতেও পারে।

লুকোবার জায়গার অভাব নেই এ পাহাড়ে। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এমন জায়গা বাছাই করতে হবে যেখান থেকে বেরোবার অন্তত দুটো রাস্তা রয়েছে। কারণ এরা শুধু পাহাড়টা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে হয় না, তন্ন তন্ন করে খুঁজবে গোটা পাহাড়। একদিক থেকে এলে যেন অন্যদিকে সটকে পড়া যায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে জায়গাটায়।

মিনিট বিশেক অতি সাবধানে সবার চোখ বাঁচিয়ে খোঁজাখুঁজির পর মনের মত একটা জায়গা পেয়ে গেল নিজাম। হাত দশেক লম্বা গুহার মত জায়গাটা,

মুখের কাছেই এমন ঘন ঝোপ রয়েছে যে সহজে কারও চোখেই পড়বে না। গুহার অপর মুখ বেরিয়েছে পাহাড়ের ঠিক পিছন দিকটায়। সেই ফোকর গলিয়ে মাথাটা বের করেই হাসি ফুটে উঠল নিজামের মুখে। খাড়া ভাবে নেমে গেছে পাহাড়টা কয়েকশো ফুট। কিন্তু গুহার মুখের ঠিক পাশেই কয়েক হাত দূরে একজন মানুষ দাঁড়াবার মত জায়গা রয়েছে। সামনের দিকে কারও সাড়া পেলেই এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে সে চুপচাপ। ফোকর দিয়ে কেউ মাথা বের করলেই গুলি করে ফেলে দেবে তাকে নিচের খাদে। আটানব্বইটা গুলি রয়েছে ওর কাছে—কাজেই চিন্তা কি?

নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এপাশের গুহা মুখের কাছে ঝোপের আড়ালে বসে আর্মির গতিবিধির উপর নজর রাখবার কাজে মন দিল সে। তেষ্টা পেয়েছে—এছাড়া শারীরিক আর কোন কষ্ট নেই। ধৈর্যের সাথে হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইল সে সুযোগের প্রতীক্ষায়।

ঠিক পাঁচটার সময় শুরু হলো সার্চ। চারপাশ থেকে একই সাথে শুরু হলো সোলজারদের অ্যাডভান্স মার্চ। কিছুদূর উঠেই ল্যান্স নায়েক বিরাজের লাশ পেয়ে গেল ওরা। কিছুক্ষণ বিরতি—হাঁক-ডাক হৈ-চৈ হলো, তারপর আবার উঠতে শুরু করল ওরা।

দু'জন সোলজার কাছাকাছি এসে পড়তেই সরে চলে গেল নিজাম গুহার দ্বিতীয় মুখের কাছে। কিন্তু না, দেখতে পেল না ওরা গুহামুখ, পাশ কাটিয়ে চলে গেল আরও উপরে। আবার এগিয়ে এসে চোখ রাখল নিজাম ওদের গতিবিধির উপর।

লাশ দেইখা ডরাইছে হালারা! ভাবল সে ওদের সার্চের ভঙ্গি দেখে। ওর জানা নেই, সার্চ নয়, সার্চের ভান করবার আদেশ দেয়া হয়েছে ওদের উপর। কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব জায়গায় আততায়ী আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে মনে হবে, সেসব জায়গা যেন বাদ দিয়ে যায়।

আবার বেশ কিছুটা হৈ-চৈ উঠল দ্বিতীয় লাশটা পাওয়া যেতেই। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে পড়েছে কয়েকজন। এবার নেমে আসার পালা। লাশ নিয়ে নেমে চলে গেল সোলজাররা। সোয়া ছ'টা নাগাদ জীপ স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্ধে নামতে না নামতেই চলে গেল সবাই। নিঝুম হয়ে গেল পাহাড়টা।

সড় সড় করে নেমে আসছিল নিজাম নিশ্চিন্ত মনে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আঁৎকে উঠে রাইফেলটা কাঁধে তুলেই ট্রিগার টিপল সে ডানদিকের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে। তড়াক করে লাফ দিল মিশমিশে কালো একটা জানোয়ার, কি ওটা বুঝে ওঠার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

'বাঘ নিকি হালায়!' বিড়বিড় করে বলল নিজাম। রাইফেলের বোল্ট পিছনে টানতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটের খালি খোল, সামনে ঠেলতেই ম্যাগাজিন থেকে চেম্বারে চলে এল আরেকটা গুলি। শব্দ হলো খড়াৎ-খট্। তারপরেই কিট্। সাথে সাথেই আড়ষ্ট হয়ে গেল নিজামের সর্বশরীর। এই 'কিট্' শব্দটা ওর রাইফেলের নয়! কিসের আওয়াজ বুঝে নিতে একবিন্দু কষ্ট হলো না ওর। খুব কাছেই কেউ সেফটি-ক্যাচ অফ্ করল। পিস্তলের। রাইফেলের বোল্ট টানার খড়াৎ-খট্ শব্দের আড়ালে সেফটি-ক্যাচ অফ্ করে নিতে চেয়েছিল কেউ, কিন্তু সময়ের সামান্য এদিক ওদিক হয়ে গেছে।

ঝপ্ করে বসে পড়ল নিজাম। সরে গেল সে ঝোপের আড়ালে আড়ালে। বিপদ টের পেয়েছে সে। নোংরা দাঁতের উপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট, হিংস্র জানোয়ারের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। কিন্তু কোথাও আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

দ্রুত ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। আবছা হয়ে আসছে সবকিছু। একবার মনে হলো, হয়তো কানের ভুল—কিন্তু পরমুহূর্তে দূর করে দিল সে চিন্তাটা। অসম্ভব! সেফটি-ক্যাচের শব্দ ওটা···কোন সন্দেহ নেই। বিপদ ওত পেতে রয়েছে কাছেই। লোকটা যে-ই হোক, ভয়ঙ্কর লোক, এ ব্যাপারে নিজাম স্থির নিশ্চিত।

কান পেতে বসে রইল নিজাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর রাইফেলটা সামনে বাগিয়ে ধরে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে নিঃশব্দ পায়ে এগোল আবার রাস্তার দিকে।

গুণার সাহায্যে নিজামের অবস্থানটা জেনে নিয়েছে রানা। কোন্ দিকে যেতে চায় বুঝে নিয়েছে। এইবার ফাঁদ পাততে হবে। ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছে বলে ঠিকমত বাগে পাওয়া যাচ্ছে না লোকটাকে। খুক করে ছোট্ট একটা কাশি দিল সে। প্রায় সাথে সাথেই ঘট্ করে কানের পাশে একটা শাল গাছের গায়ে এসে ঢুকল একটা পয়েন্ট টু-টু বুলেট। আবার শব্দ হলো: খড়াৎ-খট্।

দাঁড়িয়ে পড়েছে নিজাম। নিঃশব্দ পায়ে সরে গেল রানা। কুকুরের হুইসেলে ফুঁ দিল একবার। কিছুই শুনতে পেল না নিজাম, মানুষের কানে ধরা পড়ে না এই হুইসেলের শব্দ তরঙ্গ, কিন্তু কুকুরেরা ঠিকই শুনতে পায়। নিজামের চারপাশে ঘুরছিল গুণা, রানার আদেশ পাওয়া মাত্র [illegible] বসে অপেক্ষা করছে সে, হুইসেল শুনেই নিঃশব্দে চলে এল রানার পাশে। কিন্তু এ কী! মুখে নিয়ে [illegible] কেন [illegible]

সরু একটা সুতো দিয়ে কলার কেসটা বাঁধল রানা, তারপর একটা গাছের ডালে বাঁধল সেটার অপর প্রান্ত। ওকে এখানেই থাকতে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরে যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হলো গুণ্ডা রানার উপর। কি সুন্দর খেলা হচ্ছিল—মাঝখানেই দিল সব নষ্ট করে জানোয়ারটা!

পা টিপে গোল হয়ে ঘুরে নিজামের সামনে চলে এল এবার রানা। কয়েক পা এগিয়েই পাতার ফাঁক দিয়ে নিজামকে আবছাভাবে দেখতে পেল সে একবার। রাইফেলটা পাঁই করে ওর দিকে ঘুরতে দেখেই টের পেল, নিজামও দেখতে পেয়েছে ওকে। লাফ দিয়ে একটা গাছের আড়ালে সরে গিয়েই পরপর তিনবার ফুঁ দিল সে হুইসেলে।

সাথে সাথেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল ব্লাড হাউন্ড। নিস্তব্ধ জঙ্গলে হুঙ্কারটা এতই ভয়ঙ্কর শোনাল যে রানা পর্যন্ত চমকে উঠল। সরু রশিটা ছিঁড়ে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে সশব্দে এগিয়ে আসছে গুণ্ডা। বিপদসঙ্কেত পেয়েছে সে মনিবের কাছ থেকে, এখন আর লুকোচুরি খেলবার সময় নেই, বিপদে পড়েছে মনিব। আরেকটা হাঁক ছাড়ল সে প্রাণ খুলে।

কয়েক হাত পিছনেই কলজে কাঁপানো হুঙ্কার শুনে আঁৎকে উঠল নিজাম। হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল রাইফেলটা, চট্ করে ধরেই পাক খেয়ে ঘুরল সে পিছন দিকে। গাছের আড়ালে দাঁড়ানো লোকটাকে ভুলে এই মুহূর্তে পিছনের এই সমূহ বিপদ সামলানোই বেশি জরুরী বলে মনে হলো ওর কাছে।

ভুলটা করল সে এখানেই। তিন লাফে পৌঁছে গেল রানা গুণ্ডার আগেই। গুণ্ডার অবস্থান আন্দাজ করে নিয়েই গুলি করতে যাচ্ছিল নিজাম, দড়াম করে একটা ঘুসি এসে লাগল ওর বাম কানের ওপর। গুলিটা একটা গাছের ডালে পিছলে বিঙ্ঙ্ শব্দ তুলে চলে গেল বহুদূরে। রাইফেলসহ মাটিতে আছড়ে পড়ল নিজাম। উঠে বসতে যাচ্ছিল, পাঁজরের উপর প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে একটা গাছের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। কিন্তু সাথে সাথেই স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়াল একলাফে। রাইফেলটা মাটি থেকে ওঠাবার চেষ্টা না করে বিদ্যুৎবেগে ছুরিটা বের করেই সাঁই করে চালাল রানার হৃৎপিণ্ড বরাবর। নিজামের উপর্যুপরি সাফল্যের চাবিকাঠি ওর অঙ্গচালনার দ্রুততা। এতই অকস্মাৎ এতই তীব্র গতিতে ওর আক্রমণ আসে যে কিছু বুঝে উঠবার আগেই শেষ হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। এই প্রথম বিফল হলো সে। সাঁৎ করে সরে গেল মাসুদ রানা। নিমেষ ফেলবার সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজাম. আবার চালাল ছুরি।

খপ্ করে কব্জিটা ধরে ফেলল রানা, পরমুহূর্তে বেসামাল অবস্থায় শূন্যে

উঠে গেল নিজামের হালকা-পাতলা শরীরটা জুডোর প্যাঁচে। নেমে আসছে এবার। হাতটা মচকে যাচ্ছে বেকায়দায় পড়ে, চাপ পড়ছে. এখনও ধরে রেখেছে রানা ওর কব্জি···কড়াৎ করে কনুইয়ের কাছে ভেঙে গেল হাড়। তীব্র ব্যথায় কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আঁধার হয়ে গেল নিজামের চোখের সামনে সবকিছু। ঠিক এমনি সময়ে পৌঁছে গেল গুণ্ডা। ঘাঁউ করে আরেকটা হুঙ্কার ছেড়ে কামড়ে ধরল ওর বাম পায়ের গোছা।

নিজামের চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে গিয়ে বোকা হয়ে গেল রানা, ইঞ্চিখানেক লম্বা নিগ্রোদের মত চুল, ধরা যায় না। শেষে ছোট কোঁকড়া কান ধরেই টান দিল। উঠে দাঁড়িয়ে রানার চোখের দিকে চাইল নিজাম। ভয়ের লেশমাত্র নেই ওর দৃষ্টিতে। সাঁই করে পা চালাল রানার দুই উরুর সংযোগ স্থল লক্ষ্য করে।

আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। চট করে সরে গিয়ে নিজামের চলন্ত পায়ের গোড়ালিতে ঝটাং করে মারল লাথি। মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল নিজামের বাম পা, দেড় পাক খেয়ে দড়াম করে পড়ল সে মাটিতে চিৎ হয়ে। আবার কান চেপে ধরে টেনে তুলল ওকে রানা।

'মাইরা ফালান!' ফোঁশ ফোঁশ শ্বাস ছাড়ছে নিজাম। পরাজয় মেনে নিয়েছে, পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে, এই লোকের হাত থেকে নিস্তার নেই ওর। 'মাইরা ফালান আমারে!'

মাথা নাড়ল রানা।

'অত সহজে বাঁচতে পারবে না!'

হেঁচড়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলল রানা ওকে।

তেরো

ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে আছে রানা।

হাবিলদার শামসুদ্দিনের হাতে তুলে দিয়েছে সে নিজামকে। লাশ দুটোও তুলে নেয়া হয়েছে জীপে। রওয়ানা হয়ে গেছে জীপ। সেপাই-শাস্ত্রী, সব আয়োজন নিয়ে চলে গেছে হাবিলদার খান ভিলা ছেড়ে।

রাবেয়া মজুমদারের লাশ নিয়ে চলে গেছে সোহেল সেই সন্ধ্যার আগেই।

একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল খান ভিলাটা। রানা, রাত্রা, আর দুই দারোয়ান জাভা ছাড়া আর কেউ রইল না এতবড় পাঁচিল-ঘেরা এলাকায়। রানা বুঝল, শুধু

ওই রাবেয়া মেয়েটা থাকলেই আর এত ফাঁকা লাগত না ওর কাছে সবকিছু। এক-আধজন মানুষ থাকে এরকম, যতক্ষণ কাছে থাকে বোঝা যায় না কতটা জীবন্ত, সরে গেলেই খালি হয়ে যায় সব—রাবেয়া ছিল ওই রকম ব্যক্তিত্ব—হৈ-হট্টগোল নেই, কিন্তু ভরাট করে রাখত আশপাশের সবকিছু। শুধু রানা কেন, দুই ভাইয়ের চোখ মোছার বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরাও কত গভীর ভাবে টের পাচ্ছে সেটা।

সারাদিন খায়নি ওরা কেউ। প্রতিশোধ না নিয়ে খাবে না স্থির করেছিল রানা। প্রচণ্ড এক সংকল্প নিয়ে গিয়েছিল সে পিছনের ওই পাহাড়ে। কিন্তু নিজামকে দেখে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর। দশটা নিজামকে খুন করলেও একটা রাবেয়ার ক্ষতিপূরণ হবে না। মেরে ফেললে বেঁচে যাবে লোকটা, তাই ধরে এনে তুলে দিয়েছে ওকে হাকিলদারের হাতে। একে দিয়ে কথা বলানো হবে। তারপর জাল ফেলা হবে আরও গভীর জলের মাছের জন্যে।

খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করল ওহিদোরঞ্জন। আধঘণ্টা পর দু'জনেরই খাবার পৌঁছে দিতে বলল রানা বেজরুমে। তারপর উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। দুটো টোকা দিয়ে ঢুকল হাম্নার ঘরে।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। কাৎ হয়ে শুয়েছিল হাম্না একটা ইজি চেয়ারে, চোখ মেলল, সোজা হয়ে বসল রানাকে দেখে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে টুলটা টেনে নিয়ে কাছে এসে বসল রানা, একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

'এখন কেমন বোধ করছ, হাম্না?'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল হাম্না কাওসার, ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল নিজের হাতটা।

'আপনি কে আমি জানি না। তবে এটুকু পরিষ্কার জানি, আপনি আমার স্বামী নন। মিথ্যে স্বামীর অভিনয় করছেন আপনি আমার সঙ্গে।'

হাসল রানা। রানার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল হাম্না, হাসতে দেখে অবাক হলো। হয়তো আশা করেছিল অভিযোগ শুনে অপরাধীর মত কুঁকড়ে যাবে রানা, কালো ছায়া নামবে ওর মুখের উপর। সেসব কিছু না, সহজ হাসিতে রানার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গেল সে।

'স্মৃতি ফিরে আসছে তাহলে? শুভ সংবাদ! মনে পড়েছে সব কথা?'

'পড়েছে। কি হয়েছিল মেয়েটার? খুন করা হলো কেন ওকে?'

'সুন্দর লাগবে মনে করে নিজের লম্বা চুল ছেঁটে বব করেছিল মেয়ে...

কাল। ওকে ব্যালকনিতে যেতে বারণ করতে আর মনে ছিল না আমার। বুঝি মনে করে খুন করেছে ওকে ওরা।'

'কারা?'

'তুমি যাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'আমাকে মারতে গিয়ে ভুল করে ওকে খুন করেছে?' গাল দুটো সামান্য একটু কুঁচকে উঠেই আবার ঠিক হয়ে গেল হাসনার। 'আর আপনি? আপনি কেন মিথ্যে অভিনয় করছেন?'

'খুবই সহজ কারণ। তোমার নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু বলো তো, তুমি কেন মিথ্যে অভিনয় করছ?'

চমকে উঠল মেয়েটা।

'আমি...আমি মিথ্যে অভিনয় করছি!'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।' ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। আশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যে কারণেই এই অভিনয় করে থাকো না কেন, বিরাট সাহসের পরিচয় যে দিয়েছ সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। স্বামী হিসেবে খারিজ হয়ে গিয়েছি আমি তোমার স্মৃতি ফিরে আসার সাথে সাথেই। কিন্তু বন্ধু হিসেবে এখনও আছি আমি তোমার পাশে। সাহসী মেয়েদের আমি শ্রদ্ধা করি।' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ সিগারেট টানল রানা। তারপর আবার বলল, 'যদি তোমার মুখ খোলার ইচ্ছে না থাকে, কোন রকম জোরাজুরি করব না আমি। তুমি মুক্ত।'

'কিন্তু... কিন্তু...আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না... কিভাবে...'

'সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। কয়েকটা শূন্য স্থান পূরণ করে দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সহজেই।' নড়েচড়ে বসল রানা। 'অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তোমাকে ঢাকায় রমনা পার্কে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দেখা গেল অত্যধিক পরিমাণে বারবিচুরেট সেবনের ফলে জ্ঞান হারিয়েছে তোমার। চিকিৎসার ফলে জ্ঞান ফিরল ঠিকই কিন্তু স্মৃতি ফিরল না। তার ওপর তোমার গায়ে পাওয়া গেল একটা হিন্দী সিগনেচারের ট্যাটু। খবরটা পৌঁছল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হাতে। তারা পরীক্ষা করে দেখল, ওটা ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঞ্জীব কুমার বাজপেয়ীর স্বাক্ষর। ধরে নিল, তুমি পাকিস্তানী আমলে নিযুক্ত স্পাই যারা কাওসার। এদিকে একটা কাগজে তোমার ছবিসহ স্মৃতিভ্রংশের সংবাদ বেরোল। হিন্দী স্বাক্ষরের উল্লেখও ছিল তাতে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ— এই তিন তরফের চোখ পড়ল তোমার ওপর। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান জানতে চায় কি তথ্য রয়েছে তোমার কাছে—ভারত সেটা জানতে

দিতে চায় না। এই নিয়ে লাগল কাড়াকাড়ি। পাকিস্তানীরা একবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে। আবার কেড়ে নিলাম আমরা। ভারতীয়রা অ্যাটেম্পট নিল তোমাকে শেষ করে দেয়ার, তাও বিফল হলো। আমাকে তোমার স্বামী বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো নিরাপদ দূরত্বে—কক্সবাজারের এই খান ভিলায়। আমাকে বলা হলো তোমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করার চেষ্টা করতে। কিন্তু...'

'কোন্ দেশের পক্ষে?'

'বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগ এবং পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কৌশলে জেনে নিল কোথায় সরানো হয়েছে তোমাকে। তারাও ছুটে এল কক্সবাজারে। পাকিস্তানীরা চায় তোমাকে দখল করতে, ভারতীয়রা চায় তোমাকে খতম করে দিতে—এই গোলমালে পড়ে প্রাণ দিল নার্স রাবেয়া মজুমদার। আমরা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে তুমিই মারা গিয়েছ। আশা করছি কয়েকটা দিন ওদের চাপ একটু ঢিল হবে। কিন্তু এটাও ঠিক, সঠিক ব্যাপারটা বের করে নিতে ওদের এক হপ্তার বেশি লাগবে না। আবার আসবে ওরা তেড়ে।' আবার কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ সিগারেট টানল রানা। মুচকে হাসল মেয়েটাকে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে দেখে। বলল, 'হ্যাঁ। চিন্তা করো। স্মৃতি যখন ফিরে এসেছে, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এখন নিজেই।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল, নিজের হাতের তালু পরীক্ষা করল মেয়েটা এক মনে, তারপর আমতা-আমতা করে বলল, 'আপনি সত্যিই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক? আপনিই মাসুদ রানা?'

হেসে ফেলল রানা। 'সত্যিই তাই। কিন্তু প্রমাণ করবার উপায় নেই। আমি যদি সারারাত তোমাকে আমার জীবনী শোনাই তবু প্রমাণ করতে পারব না যে আমিই মাসুদ রানা। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এসব দেখিয়েও কোন লাভ নেই। নানান ঘটনা থেকে বুঝে নিতে হবে তোমার ব্যাপারটা।'

'কি রকম?'

'ধরো, আমি যে ভারতীয় নই সেটা বুঝতে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, হলে এতক্ষণ কথা না বলে জায়গামত একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যেতাম নিজের কাজে। পাকিস্তানী যে নই সেটাও বুঝে নেয়া কঠিন কোন কাজ নয়, হলে তুমি নকল হাস্না কাওসার জেনেও তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা বা তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে যেতাম না। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবে দেখো, বুঝতে পারবে, আমি বাংলাদেশী—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক।'

আবার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করল মেয়েটা, তারপর ঝট্ করে মু

তুলে চাইল রানার মুখের দিকে। হাসল। 'আমাকে নকল মনে করছেন কেন?'

দরজায় টোকা দিয়ে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল ওহিদোরঅন।

'এসো, আগে খেয়ে নেয়া যাক। খেয়ে নিয়ে আলাপ করা যাবে।'

বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এল ওরা। ছোট্ট একটা টেবিলের দু'পাশে বসল দুটো চেয়ারে। টেবিল সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওহিদোরঅন। একটু পরেই আরও কয়েকটা আইটেম নিয়ে ফিরে এসে পরিবেশনার দায়িত্ব নিল। জোর করে পাতে তুলে দিল এটা ওটা।

আগের প্রসঙ্গ টানল না কেউ, প্রায় চুপচাপ খেয়ে উঠল দু'জনে। খাবার রুচি দু'জনের কারোই ছিল না তেমন, কিন্তু এতই অপূর্ব রান্না যে সবশেষে পুডিং খেতে গিয়ে দু'জনেই অনুভব করল, কষ্ট করে নামাতে হচ্ছে ওটাকে গলা দিয়ে, জায়গা নেই পেটে। বেসিন থেকে হাত ধুয়ে ফিরবার আগেই টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেছে ওহিদোরঅন, দু'মিনিটের মধ্যে দু'কাপ কফি পৌঁছে দিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। একটা চেয়ারে বসে ভয়ে ভয়ে চাইল মেয়েটা বাইরের দিকে।

'আবার কোন গুলি ছুটে আসবে না তো?'

'এই জানালায় আসবে না। এখানে গুলি আসতে হলে কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকতে হবে কাউকে। আমার অজান্তে কারও পক্ষে দেয়াল ডিঙানো সম্ভব নয়।'

'ঘরে বসে টের পাবে কি করে? গার্ডরা তো সবাই চলে গেল দেখলাম।'

'আমার গার্ড ঠিকই আছে। গোটা এলাকা টহল দিচ্ছে একটা ব্লাড হাউন্ড। ও একাই একশো। অনেক পরিশ্রম করে ট্রেনিং দিয়েছি ওকে।' এই কথায় মেয়েটা তেমন আশ্বাস পাচ্ছে না দেখে হাসল রানা। বলল, 'কেউ আসবে কেন? হান্না কাওসার মারা গেছে। তুমি নার্স রাবেয়া মজুমদার। তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বা হত্যা করার দরকার নেই কারও।'

'তবু···তবু ভয় যাচ্ছে না। কি দরকার জানালার সামনে দাঁড়ানোর? সরে আসুন।' রানা একটা চেয়ার টেনে বসতেই আগের প্রশ্নটা তুলল আবার। 'আমাকে নকল ভাবছেন কেন?'

'অনেক কারণ আছে তার। জীবনে ঢাকায় আসেনি হান্না কাওসার, অথচ তোমার মুখ দিয়ে গড়গড় করে এমন সব কথা বেরিয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে অন্তত গত কয়েকটা বছর তুমি ঢাকায় বাস করেছ। শুধু তাই নয়, ঢাকার সাম্প্রতিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তুমি পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তুমি হান্না হতেই পারো না। তোমার মুখে রোকেয়া হলের নাম শুনে সেখানে খোঁজ

নিয়ে শিরিন কাওসার বলে একটি মেয়ের খবর পাওয়া গিয়েছে। থার্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্রী। সোশোলজির।'

মুচকি হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে।

'আশ্চর্য! অথচ আমরা ভেবেছিলাম···'

'সবাইকে খুব একচোট ঘোল খাওয়ানো যাচ্ছে! তাই না?'

'ঠিক তা অবশ্য নয়। যাইহোক, নকল জেনেও কান ধরে বের করে না দিয়ে আমাকে ভি.আই.পি. ট্রিটমেন্ট দেয়া হচ্ছে কেন?'

'তার কারণ, সত্যিই নয়াদিল্লী থেকে অদৃশ্য হয়েছে আসল হাস্না কাওসার। তোমাকে আসলের মর্যাদা দিয়ে পানিটা ঘোলা রাখবারই সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা, এদিকেই ব্যস্ত রাখতে চাইলাম ভারত ও পাকিস্তানকে···যাতে নির্বিঘ্নে সবার চোখে ধুলো দিয়ে এপারে এসে পৌঁছতে পারে আসল হাস্না কাওসার। এইটাই তো চেয়েছিলে তোমরা, তাই না?'

'আশ্চর্য! অথচ আমরা ভেবেছিলাম···'

'ভেবেছিলে: যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, তুমি খাওয়াইলে আমি খাই?'

'সত্যিই কিন্তু এতখানি ইন্টেলিজেন্স আশা করিনি আমরা আপনাদের কাছ থেকে। রীতিমত গর্ব হচ্ছে আমার এখন দেশের জন্যে! বুক ফুলিয়ে বলতে পারব হাস্নাকে···'

'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে, স্বীকার করছ যে তুমি হাস্না নও?'

'ওর বোন, শিরিন কাওসার।'

হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

'আমরাও তোমার জন্যে গর্বিত, শিরিন। আরেকজনকে রক্ষার জন্যে তুমি যে জেনেশুনে এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ···'

'কিন্তু ও তো আমার আপন বোন! আপন বোনের জন্যে মানুষ এটুকু করে না বুঝি?'

'হোক আপন বোন,' বলল রানা। 'করে না কেউ। তোমার আপন বোন তো আর তুমি না। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার মত সাহস কয়জনের মধ্যে আছে? সেইজন্যেই তোমাকে বলেছিলাম, যদি তোমার মুখ খোলার ইচ্ছে না থাকে, কোন রকম জোরাজুরি করব না আমি। তুমি মুক্ত। এর মাধ্যমে আমি তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতে চেয়েছি।'

হাসল শিরিন।

'ধন্যবাদ।'

'পৌঁছে গেছে হাস্না?' জানতে চাইল রানা।

'কার্টমুক্ত হয়ে এ কয়দিনে পৌঁছে যাবার কথা।'

'নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে?'

'সেটা ঠিক দরকার পড়বে না। যদি পৌঁছে গিয়ে থাকে, নিরাপদেই আছে ও। তবে বি. সি. আই. অফিস পর্যন্ত এসকর্টের ব্যবস্থা করতে পারলে বোধহয় ভাল হয়। অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য রয়েছে ওর কাছে।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'কাল সকালে সব ব্যবস্থা করা যাবে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এখন।'

'আর আপনি?'

'আমি? আমিও ঘুমাব। পাশের ঘরেই আছি আমি।'

রানা দরজার দিকে পা বাড়াতেই দুই হাত দু'পাশে তুলে বাধা দিল শিরিন।

'উঁহুঁ! এই ঘরেই থাকবে তুমি। ভূতের ভয় আছে আমার।' রানাকে ইতস্তত করতে দেখে মুচকি হেসে বলল, 'ক্ষতি কি? কে কি বলবে? আমরা তো স্বামী-স্ত্রী! রীতিমত সার্টিফিকেট আছে!'

'তোমার স্মৃতি ফিরে আসার পরও তো আর স্বামী-স্ত্রী নই?'

'কে বলল আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে?' এগিয়ে এল শিরিন। ঠোঁটের কোণে চাপা শয়তানী হাসি। আজকে তো ফেরেনি··· দেখা যাক কাল ফেরে কিনা। এক হপ্তা পর ফিরলেই বা কি এসে যায়?' সেঁটে এল রানার বুকের কাছে। ফিসফিস করে বলল 'কি গো, মশাই? এত দ্বিধা কিসের? অভিনয়ই তো, আসলে তো আর কিছু নয়!'

'পরে অনুতাপ হবে না তো, শিরিন?'

'কিসের অনুতাপ? জেনেশুনে তো আর করছি না কিছু! স্মৃতিভ্রষ্ট অবস্থায় তোমাকে স্বামী মনে করায় আবার দোষটা কোথায় হলো, শুনি? আমার কি এখন জ্ঞানগম্যি আছে কিছু?'

ভূতে পেয়েছে মেয়েটাকে। মুচকি হেসে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল রানা। বোতাম খুলছে শার্টের।

'কিন্তু স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটা ম্যানেজ করলে কি করে বলো তো?'

'ওষুধ। বারবিচুরেটের সাথে কি একটা ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল আমাকে। সত্যিই স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিল আমার।' আলোটা শেড দিয়ে ঢেকে আবছা আঁধারে কাপড় ছাড়ছে শিরিন।

'কে খাইয়েছিল?'

'আমার এক বান্ধবীর বড় ভাই। ডাক্তার।' হুক খুলে ব্রা-টা ঝুলিয়ে দিল আলনায়। ঘুরে দাঁড়াল। 'পি.জি.তে কাজ করে।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে। পাশাপাশি

এগিয়ে এল কাছে। দু'মিনিটের মধ্যেই খাটে উঠে পড়ল স্বামী-স্ত্রী। হিন্দী স্বাক্ষরের উপর আঙুল বুলাল রানা, 'আর এটা?'

'এটা একটা সীল। নয়াদিল্লীতে বাজপেয়ীর ঘর থেকে চুরি করে এনেছি হাসা।' হাসল শিরিন। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, কনুইয়ে ভর দিয়ে এগিয়ে এল আরও কাছে। 'নকল স্বামীকেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে এজন্য?' রানার আদর উপভোগ করল কিছুক্ষণ নীরবে, তারপর বলল, 'উঠে যাবে। হাসা বলেছে থাকবে না দাগ।'

বেড-সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল শিরিন বাতিটা।

* * * *